ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা

জনক-জননী

শ্রীচরণকমলেষু

বর্তমান লেখকের—

বীরবল ও বাংলা সাহিত্য

বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

(ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগে)

রবীন্দ্র-মনীষা (অচিরপ্রকাশিতব্য)

রবীন্দ্র-সমীক্ষা (ঐ)
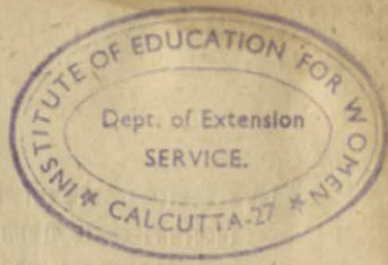
নিবেদন

উনবিংশ শতাব্দী বাঙালির জীবনে নবজাগরণের যুগ বলিয়া চিহ্নিত। নবজাগরণের সকল আনন্দ ও বেদনা, উল্লাস ও হতাশার সার্থক প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে আধুনিক গীতিকবিতার মুকুরে। বস্তুতঃ গত শতাব্দীর বাঙালির নবজন্মের সার্থক পরিচয়স্থল গীতিকবিতা। অবশ্য গত শতাব্দীতে প্রথম শ্রেণীর গীতিকবিতা খুব কমই লেখা হইয়াছে। তবে গত শতাব্দীর গীতিকবিদের ব্যর্থতার ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের মতো মহত্তম গীতিকবিপ্রতিভার আবির্ভাব হইয়াছিল, এই সত্য অবশ্যস্মর্তব্য। বর্তমান গ্রন্থে এই দৃষ্টিতেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্যের সামগ্রিক পরিচয়দানের প্রয়াস করা হইয়াছে।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী গবেষকরূপে এই বৃহৎ কর্মে আত্মনিয়োগ করি। পূজনীয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই গ্রন্থ রচিত হয় ও ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ফিল ডিগ্রীর জন্য পেশ করি। পর বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় ইহা অনুমোদন করেন। আরো তিন বৎসর পরে আজ কাব্যানুরাগী বাঙালি পাঠকসমাজের নিকট ইহা নিবেদন করিতে পারিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি এবং অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। ইতিমধ্যে যেসকল অধ্যাপকবন্ধু ও ছাত্রছাত্রী ইহার আশু প্রকাশের জন্য সানুগ্রহ সন্ধান লইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতা সম্পর্কে গবেষণার সূচনায় প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতাসংকলনের অভাব বোধ করিয়াছিলাম। তাহার ফলে পঁচাত্তর জন গীতিকবির পাঁচশত গীতিকবিতার এক সংকলন সম্পাদনা করি। উহা মদীয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্তমান লেখকের নামে 'উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা বর্তমান গ্রন্থের পরিপূরক সংকলন। বর্তমান গ্রন্থে যেসকল কবি ও কবিতার উল্লেখ আছে তাহা উক্ত সংকলনে পাওয়া যাইবে। উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এম, এ, পাঠক্রমে গৃহীত হইয়াছে। এই সঙ্গে জানাই, বর্তমান গ্রন্থে আরব্ধ কর্মের অনুসরণে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রবীন্দ্রানুসারী কবিদের কাব্যকীর্তির আলোচনা মৎপ্রণীত 'রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ' গ্রন্থে

বিধৃত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠককে এই দুইটি গ্রন্থ দেখিতে অনুরোধ করি।

নির্দেশিকা-রচনায় সাহায্য করিয়াছেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায় ও বন্ধুবর শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন। মুদ্রণ-প্রমাদের জন্য পাঠকের প্রশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। সাহিত্যপ্রাণ প্রকাশক শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ডের প্রযত্নে ইহা পাঠক-সমাজে উপস্থিত করিতে পারিয়া ধন্য বোধ করিতেছি। কাব্যানুরাগী পাঠক-সমাজের ইহা তৃপ্তিবিধান করিলে আমার শ্রম সার্থকজ্ঞান করিব।

২০ নভেম্বর, ১৯৬০
বাংলা সাহিত্য বিভাগ
প্রেসিডেন্সি কলেজ
কলিকাতা-১২

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

বিষয়-সূচী

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য

প্রথম অধ্যায়

প্রাগাধুনিক বাংলা গীতিকবিতা

শাস্ত্র বলিয়াছেন, মানুষ এক জন্মের দেহ ত্যাগ করে, পুনর্বার গ্রহণ করে নূতন জন্মের দেহ। তেমনি মানুষের মন ধরা দেয় নিত্য নবনবায়মান পরিবর্তনশীল সংস্কারে, চিন্তায়, ধ্যানে, দিনচর্যায়, শিল্পকৃতিতে, সাহিত্যসাধনায়। পর্বে পর্বে প্রাণ আপন আবরণ যেমন রচনা করে তেমনি মোচনও করে। সাহিত্যে বিশেষ করিয়া কাব্যে প্রাণের এই নব নব রূপান্তর প্রতিভাত হয়। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করিয়া কাব্যে বাঙালি মানস আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। আর এই প্রকাশ পর্বে পর্বে রূপান্তরিত হইয়াছে, গিয়াছে বাহির হইতে ভিতর-দেহলিতে ; পুনর্বার বহির্বিশ্বে আপনাকে প্রাণাবেগে উৎসারিত করিয়া দিয়াছে। একটিমাত্র ঋতুতে ফুলের ফসল শেষ হয় না ; ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যেও পালা-বদল ঘটে। এই পরিবর্তনের পরিচয় না জানিলে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্যের রাজ্যে আমরা উপনীত হইতে পারিব না। তাই আমাদের ফিরিয়া যাইতে হয় প্রাগাধুনিক বাংলা গীতিকবিতার উৎসে।

উৎস-সন্ধানে যাত্রা করিলে আমরা যেখানে গিয়া থামি, তাহা চর্যাপদ। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ফসল চর্যাপদের গান (দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী)। যুগপ্রভাব ও গোষ্ঠীগত প্রভাব চর্যাপদে এত প্রবল যে সেখানে বৌদ্ধ কবিদের ব্যক্তিক চেতনা প্রকাশ পায় নাই বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য স্ফুরিত হইবার সুযোগ পায় নাই। কবিরা ছিলেন মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধ সংঘের সাধক। তাঁহাদের মানসিক চিন্তাধারার মধ্যে বেশি পরিমাণ সমতা থাকায় ব্যক্তিক চেতনা চর্যাপদে প্রকাশের অবসর পায় নাই। চর্যাপদ মূলতঃ বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের গূঢ় সাধন-নির্দেশিকা। তথাপি এগুলি কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে কয়েকটি কারণে।

ধর্মচেতনা চর্যাপদের কবিদের জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল ; কিন্তু জীবনব্যাপী সাধনার ফলে তাহা সহজ সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। গূঢ় ধর্মসাধনপদ্ধতি এখানে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগের ছন্দে, নিবিড় উপলব্ধির আনন্দময় নিশ্চিতির রূপে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কামজীবনের যে রস, তাহাকে বৌদ্ধ কবিরা অধ্যাত্মজীবনের রসে উন্নীত করিয়াছিলেন। চর্যাপদে তাহাই কবিজীবনের আনন্দ রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। দুরূহ সাধনচর্যাসম্মত

পরিশোধনের ফলে দেহজ কাম সমস্ত স্থূলতা ত্যাগ করিয়া কাব্যানন্দে পরিণত হইয়াছে। এখানেই বৌদ্ধ কবিমানস তাহার অভ্রান্ত পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। রূপকব্যঞ্জনার মাধ্যমে প্রকাশিত বলিয়া একটি অনির্দেশ্য আকৃতির বাহন রূপে ইহা কাব্যের অনির্বচনীয়তায় উন্নীত হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রেমের মোহাবেশের ঈষৎস্পর্শে, আদিরসের সংকেত রমণীয়তায় ইহার গীতিধর্ম সূত্র-সংক্ষিপ্ততার বহিরাবরণ ভেদ করিয়া দৃঢ়ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে।

এই মন্তব্যের সমর্থনে তিনটি উদাহরণ দিতেছি।

(ক) তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
কমলকুলিশ ঘাণ্টি করহ বিআলী॥
জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি॥

মণীন্দ্র বসু-কৃত-অনুবাদ:

ত্রিনাড়ী যোগিনী চাপি দেয় অঙ্কবালী।
কমলকুলিশ যোগ করহ বিকালী॥
তোমা বিনা যোগিনি গো, ক্ষণ নাহি জীব।
তোর মুখ চুম্বি রস কমলের পিব॥

(পদসংখ্যা ৪)

(খ) অধরাতি ভর কমল বিকসিউ।
বতিস জোইণী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ॥.....
বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ।
জো এথু বুঝই সো এথু বুধ॥
ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ।
সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ॥

ঐ অনুবাদ:

অর্ধরাতি ব্যাপি' হয় কমল বিকাশ।
বত্রিশ যোগিনী দেয় অঙ্গেতে উল্লাস॥......
বিরাম আনন্দ হয় বিলক্ষণ শুদ্ধ।
যে জন বুঝে ইহা সেই হয় বুদ্ধ॥
ভুসুকু বলিছে আমি মিলন বুঝেছি।
সহজাত মহাসুখে লীলায় মজেছি॥

(পদসংখ্যা ২৭)

(গ) উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহারি।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥

নানা তরুবর মৌউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী।
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই।
গুরুবাক্ পুঞ্ছিআ বিন্ধ নিঅমণ বাণে।
একে শরসন্ধানে বিন্ধহ বিন্ধহ পরমণিবাণে।
উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে।

ঐ অনুবাদ :

উঁচা পাহাড়েতে বসতি করিছে শবরী নামেতে বালা।
ময়ূরের পাখ করি পরিধান গলেতে গুঞ্জরে মালা।
পাগল শবর না করিও ভুল তোমারে বিনয় করি।
নিজের গৃহিণী সহজসুন্দরী আমি যে তোমার নারী।
একেলা শবরী এ বনে বিহরে কুণ্ডলাদি ধরি কাণে।
কায়াতরু নানাভাবে মুকুলিল ডাল গগনের কোণে।
ত্রিধাতুতে খাট পাড়িলা শবর সুখেতে সেজ বিছায়।
শবর ভুজঙ্গ নৈরাত্মা দারীর পীরিতে রাত পোহায়।
হৃদয় তাম্বুল কর্পূর সহিত মহাসুখে সে যে খায়।
নৈরাত্মা শূন্যেরে কণ্ঠেতে লইয়া সুখেতে রাতি পোহায়।
গুরুবাক্য ধনু নিজ মন বাণ উভয়ের সমাবেশে।
পরম নির্বাণ লভ এক শরে বিন্ধিয়া অবিদ্যাক্লেশে।
উন্মত্ত শবর গুরুতর রোষে জ্ঞানানন্দে থাকি মজি।
গিরিশিখরের সন্ধিতে প্রবেশে তাহারে কিরূপে খুঁজি।

(পদসংখ্যা ২৮)

বজ্রযান সাধননির্দেশ এখানে আদিরসের সংকেত রমণীয়তায় যে মোহাবেশ ও ভাবাবহের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা একান্তই গীতিরসসমৃদ্ধ।

ইতিহাসের পথরেখা অনুসরণ করিলে ইহার পর আমরা দ্বাদশ শতাব্দীর মেঘমেদুরাম্বর শ্যামল কাব্যবনভূমিতে পৌঁছাই; সে বনভূমি রাধাকৃষ্ণের লীলাগানে সতত মুখরিত। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গীতিকাব্যের কলস্রোত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছিল। এই গীতিধারা বাংলার ভূমিতে প্রথমে সংস্কৃত কাব্যে উৎসারিত হইয়াছিল। সে কাব্য জয়দেবের গীতগোবিন্দম্। গীতগোবিন্দ নামে রাধাকৃষ্ণলীলার দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব-প্রকাশিকা সংস্কৃত কাব্য হইলেও চরিত্রে ও ধর্মে সম্পূর্ণরূপে গীতিধর্মী ও

বাঙালি মানসের উপযোগী। "গীতগোবিন্দ কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য মাধুর্যসৃষ্টি, আধ্যাত্মিকতার ব্যঞ্জনা অপেক্ষাকৃত গৌণ। দার্শনিক তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত অশরীরী, অলৌকিক প্রেমের মধ্যে তিনি প্রাকৃত প্রেমের তীব্র হৃদয়াবেগ ও রসানুভূতি সঞ্চার করিয়া ইহাকে কাব্যগুণসমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন।" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের কথা, পৃ ১১)। তাই গীতি-কাব্যোচিত তীব্রতা, গভীরতা ও আবেগোচ্ছ্বাসে এই কাব্য সমৃদ্ধ। আর এই গুণগুলি গীতগোবিন্দকে সকল বৈষ্ণব গীতিকবিতার পথিকৃৎ রূপে স্বীকৃতিলাভের সুযোগ দিয়াছে।

ইহার পর আমরা চতুর্দশ শতাব্দীতে আসিয়া পৌছাই। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। গোড়ার দিকে ইহা ঝুমুর নাটগীতের ঢঙে রচিত, শেষের দিকে বিশুদ্ধ গীতিকবিতার স্তরে উন্নীত হইয়াছে। চর্যাপদ ছিল বাঙালি বৌদ্ধ শ্রমণদের সাধননির্দেশিকা, আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইল পৌরাণিক ধর্মের দেবমহিমায় উন্নীত মানবিক প্রেমের গান। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথমাংশে নাটকীয় সংলাপের বহুলতা ও ঘটনার অতিশয় ব্যস্ততা আছে, কিন্তু শেষাংশে সে ব্যস্ততা অপসৃত হইয়া হৃদয়ের গভীর বেদনা সংগীতে মুক্তি পাইয়াছে। সংগীতপ্রাণ এই কবিতার নামই গীতিকবিতা। এই কাব্যে তাহার সামান্য পরিচয় আছে।

চর্যাপদে ধর্মসাধনা মুখ্য, কাব্যাস্বাদন গৌণ। চর্যাপদ esoteric, ইহার রহস্যানুভূতি বা মিষ্টিক আবেদন পদের অঙ্গীভূত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য erotic, শৃঙ্গাররসের কাব্য। এই কাব্যে ধর্মাবেদন ও পৌরাণিক ব্যাখ্যান কাব্যের অঙ্গীভূত নহে, তাহা আরোপিত। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি মানবিক আবেদন প্রকাশের অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ক্ষেত্র পাইয়াছেন। তাহা ছাড়া চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব ধর্মসাধনার কঠোর অনুশাসন ইহার উপর ছিল না। যে পৌরাণিক অনুশাসন ছিল তাহা 'আহ্মে বনমালী, তোহ্মে চন্দ্রাবলী'-জাতীয় কৃষ্ণের ঐশ্বর্যখ্যাপনে ব্যস্ত ছিল, হৃদয়বেদনাকে তাহা শাসনের দ্বারা বারিত করে নাই। তাই এই ঝুমুর নাটগীতে তীব্র অসংস্কৃত গ্রাম্য প্রেম প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং কাব্যসৃষ্টির একটি সুন্দর অবকাশ রচিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মসাধনা বা অলংকার শাস্ত্রসম্মত কাব্যাদর্শ—এই দুই মানদণ্ডের বিচারে এই কাব্য সসম্মানে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, এ কথা স্বীকার্য। তথাপি ইহার হৃদয়-আবেদনটি গীতি মাধ্যমে একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ফলে ইহা পরবর্তী বৈষ্ণব গীতিকবিতার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। এই কাব্যটি মোটের উপর উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক, সংলাপবহুল ও আখ্যানধর্মী হইলেও ইহার ফাঁকে ফাঁকে যে অসংবরণীয় হৃদয়োচ্ছ্বাস করুণ সুরের মূর্চ্ছনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই ইহাকে গীতিকবিতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ দেখানো যায়, দানখণ্ডে রাধা ও কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া একটি সুন্দর কাব্য পরিমণ্ডল সৃষ্ট হইয়াছে। রাধাস্তুতিতে নিযুক্ত কৃষ্ণের মুখে কাব্যগুণোপেত বর্ণনার সন্ধান পাই :

নীল জলদ সম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা॥
শিশত শোভএ তোর কামাসিন্দূর।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সূর॥
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
কুণ্ডলমণ্ডিত চারু শ্রবণ যুগলা॥

আবার বংশীখণ্ডে কৃষ্ণের সাময়িক অন্তর্ধানে রাধার বিলাপ বাস্তবের কঠিন ভূমি ছাড়িয়া ভাবের আকাশে পাখা মেলিয়াছে :

কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে।
এবেঁ কাল হৈল মোকে নান্দের নন্দনে॥
প্রাণ আকুল ভৈল বাঁশীর নাদে।
এবেঁ আসিআঁ কাহ্নাঞি দরশন না দেঁ॥
আহ্মা উপেখিয়াঁ গেলা নান্দের নন্দন।
তাহাত মজিত চিত না জাএ ধরণ॥……
বড়ার বৌহারী আহ্মে বড়ার ঝী।
কাহ্ন বিণি মোর রূপ যৌবনে কী॥
এ রূপ যৌবন লআঁ কথাঁ মোএঁ জাওঁ।
মেদিনী বিদরে দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
মন্দ পবন বহে কালিনী নই তীরে।
কাহ্নাঞিঁ সোঁঅরী মোর চিত নহে থীরে॥
এবেঁ আকুল কৈলে মোরে নান্দের নন্দনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥

সহৃদয় সামাজিকের নিকট রাধার এই বিরহার্তির স্বরটি অনায়াসেই ধরা পড়ে।

শেষ খণ্ড—বিরহ-খণ্ড বিরহিণী রাধার আর্তনাদে মুখরিত। কৃষ্ণের বৃন্দাবন পরিত্যাগে বিরহব্যাকুলা রাধা আর্তনাদ কহিয়া সখীকে বলিতেছে :

এ ধনযৌবন বড়ায়ি সবই অসার।
ছিণ্ডিয়া পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ সিসের সিন্দূর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচূর॥
দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণদান।
আপনার দৈবদোষে হারায়িলোঁ কাহ্ন॥

মুণ্ডিয়া পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনী রূপ ধরি লইবোঁ দেশান্তর ॥
যবে কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাথে তুলিয়া মো খাইবোঁ গরলে ॥

এই বেদনার্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকে গীতিকবিতার মর্যাদা দিয়াছে। পূর্বের চটুল হাস্যপরিহাস, দাম্ভিক প্রত্যাখ্যান এখন শতগুণ হইয়া রাধার প্রাণকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। এই বেদনার্তি লাম্পট্যের কাহিনীকে সুচিরকালের বিরহ-মর্যাদায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথমাংশে পুরাতন কাব্যরীতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে কবি ইতর কলহ ও পূর্বরাগবর্জিত লোলুপ-তার অবাঞ্ছিত প্রতিবেশে স্থাপন করিয়াছেন।" কিন্তু কাব্যের ফলশ্রুতি লালসার উল্লাস নহে, বিরহের বেদনা। "কাব্যের শেষাংশে কবি কৃষ্ণকে ঔদাসীন্যে অবিচলিত রাখিয়া রাধার প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে বিরহ বেদনা ও ব্যাকুল আত্মনিবেদনের দ্বারা মার্জিত ও বিশুদ্ধ করিয়া আবার সনাতন ভাবমাধুর্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', পৃ ১০)। এই মার্জনা ও পরিশুদ্ধির উপরেই এই কাব্যের গীতিরস নির্ভরশীল। প্রেমের সর্বগ্রাসী একাধিপত্য অন্তরে যে বেদনাক্ষুব্ধ গভীর আলোড়ন জাগায়, বংশীখণ্ডের নিম্নলিখিত পদটি তাহারই সার্থক প্রকাশ। এই পদটি একটি প্রাচীন সমাজের স্থূল দেহসর্বস্ব ভালোবাসার চিত্র নহে, ইহা পূর্ণপরিণত পরিশীলিত সংস্কৃতিবান মনের ভাবগভীরতা ও অনুভূতির বিশুদ্ধির পরিচায়ক। পদটি এই :

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ে চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলো কোন দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারাইলোঁ পরাণী ॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নন্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পাসিআঁ লুকাওঁ ॥

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥

এই পদে যে বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা গ্রাম্য তরুণীর কাতর ক্রন্দন মাত্র নহে, সুচিরকালের বিরহবেদনা এখানে স্পন্দিত হইয়াছে। এই কাব্যের শেষ পদগুলিতে পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর সূত্রপাত হইয়াছে। পদাবলীকার চণ্ডীদাসের রাধা বিবশহৃদয়ে বলিয়াছিলেন :

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

আত্মলীন প্রেমানুভূতির ইহাপেক্ষা স্বাভাবিক ও অধিকতর নিষ্ঠাপূর্ণ অভিব্যক্তি কল্পনা করা কঠিন। মনে রাখা প্রয়োজন, পদাবলী-যুগের এই আন্তরিক অভিব্যক্তির যথার্থ ভূমিকা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপরি-ধৃত পদটি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ক্ষীণ গীতিধারা বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রে আসিয়া অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে।

এই সময়েই জয়দেবের উত্তরাধিকারী হিসাবে বিদ্যাপতি দেখা দিলেন মৈথিলী তথা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং প্রেমগীতিধারায় পূর্ব-ভারতকে প্লাবিত করিয়া দিলেন। প্রাক্-চৈতন্য যুগে বিদ্যাপতিই দেশকালানুযায়ী যতটা সম্ভব ভাবাবেগ গীতিধারায় সঞ্চারিত করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভার কবি। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল এবং ধর্ম সম্বন্ধে উদার অপক্ষপাত মনোভাবও ছিল। সমসাময়িক জীবনের প্রতি অশ্রান্ত কৌতূহল বিদ্যাপতির কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। জন্মভূমি ত্রিহুতে মুসলিম অভিযানের প্রবল তরঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' কাব্যে এই অভিযানের প্রত্যক্ষ বাস্তব বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনায় সমসাময়িক রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থা চিত্রণে কবির দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। পুনশ্চ, রাজপ্রতিবেশ-প্রভাব তাঁহার পদাবলীতে বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। "রাজপ্রতিবেশোচিত মার্জিত রুচি, বিদগ্ধ মনোবৃত্তি, সুনিপুণ বাক্‌ভঙ্গী, শিল্পচাতুর্য, বক্র কটাক্ষ-সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রেম সম্পর্কে বহুদর্শী অভিজ্ঞতা বিদ্যাপতির পদাবলীতে বিশুদ্ধ লিরিক সৃজনে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাপতি প্রতিভাবলে প্রেমের সব ভুলানো দুরবগাহ রহস্যটিকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন।" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের কথা,' পৃ ২০)। বিশুদ্ধ গীতিকাব্যোচিত ভাবাকুলতা ও অনুভূতির তীব্রতা তাঁহার অধিকারে ছিল। ফলে অভিসার ও ভাবসম্মিলনের পদে বিরহ ও প্রেমের ভাবাশ্রয়ী রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন।

বড়ু চণ্ডীদাসে গীতিরস অনেকটা আকস্মিক আগন্তুক—তিনি চটুল প্রেমাভিনয়ের বর্ণনা করিতে গিয়া যেন অজ্ঞাতসারেই প্রেমের গভীর উৎস আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন, গ্রাম্য পঙ্কিল পল্বলে অবগাহন করিতে গিয়া অকস্মাৎ মহাসমুদ্রের অতল অশ্রুগভীরতায় আত্মনিমজ্জন করিয়াছেন। বিদ্যাপতি কিন্তু গোড়া হইতেই প্রেমের সৌন্দর্য ও মহিমা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। যদিও রাজসভার কৃত্রিম সরোবরে তিনি প্রথম প্রেমের প্রমোদ-তরণী ভাসাইয়াছিলেন, তথাপি এই সরোবরের তলায় মহাসমুদ্রের যে টান আছে তাহা তিনি বরাবরই অনুভব করিয়াছিলেন। গীতিকবিতার শিল্পরূপ ও ইহার আভ্যন্তরীণ ভাবাকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার সুনিশ্চিত ধারণা ছিল।

বিদ্যাপতির মাত্র একটি পদ আলোচনা করিলেই পদাবলীর কবিকুলের পুরোধা রূপে তাঁহার দাবী কতটা, বিশুদ্ধ গীতিকবিতা রচনায় তিনি কতদূর সফলকাম বা লিরিকের শিল্পরূপ ও আভ্যন্তরীণ ভাবাবেগ সৃজনে তিনি কতটা সার্থক : এ সকল প্রশ্নেরই সন্তোষজনক মীমাংসা হইবে। পদটি হইতেছে :

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিত অনুরাগ বখানিএ
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সেহো মধুর বোল শ্রবণহি শূনল
শ্রুতিপথ পরশ ন গেল॥
কত মধু যামিনী রভস গমাওল
ন বুঝল কইসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয় জুড়ন ন গেল॥
কত বিদগধ জন রস আমোদই
অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াএত
লাখে ন মিলল এক॥

"এখানে কোনো একটি বিশেষ লৌকিক প্রেমের ব্যর্থতা প্রকাশ পায় নাই, মানবচিত্তের সনাতন রহস্যের সূক্ষ্ম তাৎপর্যটি এখানে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রেমের চিরন্তন অতৃপ্তি, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান, সৌন্দর্যের খণ্ডিত আংশিক প্রকাশ হইতে উহার মূল প্রস্রবণের দিকে দুরূহ অভিযান, রূপে রূপাতীতের ব্যঞ্জনা, অনায়ত্তের

দিকে ব্যাকুল হস্তপ্রসারণ—ইত্যাদি প্রকার প্রেমের দুরবগাহ মহিমা ও আকর্ষণের সুরটি এই কবিতায় যেরূপ আশ্চর্য অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাতে ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতিসমূহের মধ্যে স্থানলাভের উপযুক্ত। কীট্সের সৌন্দর্যোপভোগে অপরিতৃপ্তি ও শেলীর আদর্শ সন্ধানে উর্ধ্বাভিযান-পিয়াসী হৃদয়াবেগ যেন এই মহাগীতিতে নিবিড় একাত্মতায় যুক্ত হইয়াছে।" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', পৃ ২২)।

প্রাক্-চৈতন্যযুগের অন্যান্য কাব্যসৃষ্টিতে এই গীতিপ্রাণতা কতটা আছে, তাহা বিচার্য। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিরূপ ও মঙ্গলকাব্যের প্রাথমিক খসড়াগুলিতে বিশুদ্ধ গীতিকাব্যরস বিশেষ নাই। তবে কৃত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে সীতাহরণে রামের বিলাপ অংশে, মনসামঙ্গলের প্রাথমিক রূপে সনকা ও বেহুলার শোকে গীতিবেদনা কিছুটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ আখ্যায়িকার অন্তর্গত হওয়ায় সেখানে এই গীতোচ্ছ্বাস বিশেষ ধরা পড়ে না, পৃথক ভাবে রচিত হইলে হয়ত বা তাহা প্রাধান্য লাভ করিত। এই সকল কাব্যে তথ্যবিবৃতি, উপাস্য দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনে অতিব্যগ্রতা ও দীর্ঘ বিরক্তিকর একঘেয়ে বিবরণের মধ্যে কোথাও কোমল, ভাবরসসিক্ত, অনুভূতির গভীরতায় অবতরণশীল মনের সাক্ষাৎ মিলে না। এই সকল কাব্যের যে কোনো একটির কিছু অংশ পাঠ করিলেই এই সত্য ধরা পড়িবে। এই সকল আখ্যায়িকাধর্মী মঙ্গলকাব্যসমূহ প্রকৃত প্রস্তাবে গদ্যের উষর ভূমি। এই উষর ভূমিতে জোয়ার আসিল ষোড়শ শতাব্দীতে—শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর ঘটিয়া গেল। একটিমাত্র ব্যক্তিচরিত্র দেশের সাহিত্যের মোড় ঘুরাইতে পারে, এরূপ ঘটনা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব এইরূপ একটি বিরল ঘটনা। তাঁহার সহজ প্রেমধর্ম বাংলা দেশের চিত্তক্ষেত্রের মরা গাঙে এমন এক বান ডাকিয়া আনিল যে, তাহার বেগ বাংলা লিরিককে বহু দূরের পথ আগাইয়া দিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের কবিতায় মহত্তর প্রেমের প্রারম্ভিক সূচনা—প্রাথমিক অনিশ্চয়তার সুর শোনা যায়। চৈতন্যভাবানুপ্রাণিত পদাবলীকার চণ্ডীদাসে তাহা হইয়াছে পরিণত রসসমৃদ্ধ ব্যঞ্জনাপূর্ণ প্রেম। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে গানে; ঘটনাকে ছাড়াইয়া যাওয়া হয় নাই; কাব্যে উপলক্ষ্যের ছাপ রহিয়া গিয়াছে। বস্তুতন্ত্রতার কঠিন ভূমি ছাড়িয়া বড়ু চণ্ডীদাসের গীতি ভাবের আকাশে পাখা মেলে নাই। কিন্তু পদকর্তা চণ্ডীদাসে তাহা তথ্যের সূত্রটানকে অস্বীকার করিয়া ভাবাবেগের নীলাকাশে উধাও হইয়া গিয়াছে। এখানে রসের উদার গগনে গীতিকবিতার পক্ষ-বিধূনন শোনা যায়। বিশুদ্ধ গীতিকবিতার মন্ত্রটি বড়

চণ্ডীদাসের অনায়ত্ত ছিল। পদাবলীকার চণ্ডীদাস তথ্যের বন্ধনে আবদ্ধ নহেন, তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন এবং বিশুদ্ধ ভাবনির্যাস গ্রহণ করিয়া গীতিকবিতার আকাশে পক্ষবিস্তার করিয়াছেন।

তবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে পিছুটান, তাহা বৈষ্ণব পদাবলীরও আছে। ইহা একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি। একটি ধর্মবিশ্বাসে ভাবিত হইয়া বৈষ্ণব কবি, যিনি নিজেকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত দীন সেবক বলিয়া মনে করেন, তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেবের উপাসনায় পুষ্পোপচার হিসাবে এই পদাবলী রচনা ও কীর্তন করেন।

পদাবলীকার চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, লোচনদাস প্রমুখ পদকর্তাগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা গান করিয়াছিলেন এবং ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী—এই তিনশত বৎসর ধরিয়া গৌড়বঙ্গের চিত্তকে রসাভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতায় প্রধান ফসল এই বৈষ্ণব পদাবলী। কোমল, ভাবরসসিক্ত, অনুভূতির গভীরতায় অবতরণশীল মন এবং এই ভাবতন্ময়তা প্রকাশের উপযোগী অমৃতনিঃস্যন্দী, সৌন্দর্য-পরিমণ্ডলরচনা-নিপুণ ভাষা—এই দুইয়ের সংযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়াই উচ্চ কোটির বৈষ্ণব গীতিকবিতা সৃষ্ট হইয়াছিল। শত শত সার্থক বৈষ্ণব পদের কয়েকটি মাত্র উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব গীতিকবিতার উৎকর্ষের পরিচয় দানের প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। তাই সেই প্রয়াসে বিরত হইলাম।

বৈষ্ণব পদাবলীর সার্থকতার মূল কারণসমূহ আলোচনা করিয়াছি। তবু, একথা না বলিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে যে, পদকর্তাগণ কেবল শ্রীচৈতন্যদেবের আলৌকিক চরিত্র দেখিয়াই অমর প্রেমের গান বাঁধেন নাই, তাঁহারা মর্তভূমির প্রেমলীলা হইতেও প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই মানবিক আবেদন অনুস্যূত আছে বলিয়াই তাহা এত মর্মস্পর্শী। সোনার তরী কাব্যের 'বৈষ্ণব কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ ইহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যের মরা গাঙে যে জোয়ার আসিল, তাহা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রকেই সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। চৈতন্যজীবনী, কৃষ্ণমঙ্গল, অন্যান্য সাম্প্রদায়িক মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত—সর্বত্রই জোয়ারের প্রভাব অনুভূত হইল। আর এই সাহিত্য সমস্তটাই ছিল সুরে গেয় কীর্তন বা পাঁচালী। তাই গীতিরস কিছু পরিমাণে সর্বত্রই সঞ্চারিত হইল। কিন্তু এই সকল কাব্য আখ্যায়িকাধর্মী ও দেবমাহাত্ম্য প্রচারে যত্নবান বলিয়া বিবৃতি ও তথ্যই এগুলিতে প্রাধান্য লাভ কয়িয়াছে, গীতিরস গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। ফলে এগুলিতে বিশুদ্ধ লিরিকের পরিচয় মিলে না।

অপরপক্ষে ধর্মশাসনমুক্ত ও দেবমাহাত্ম্যপ্রচারে নিয়োজিত নহে এমন গ্রাম্য লোককবিতায় এই গীতিরসের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। ছেলে-ভুলানো ছড়া, বাউলগান, ভাটিয়ালি, সারি, জারি প্রমুখ নানা লোকসঙ্গীতে এই গীতিরস প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। মৌখিক ও গ্রাম্য বলিয়া তাহা সাহিত্যের পাকা আসরে ঠাঁই পায় নাই। তথাপি ইহাদের গীতিপ্রাণতা অবশ্যস্বীকার্য। এই গীতিপ্রাণতার সর্বাধিক স্ফুরণ হইয়াছে বাউল গানে। এখানে হৃদয়বেদনা প্রকাশের এমন একটা উদার অবকাশ মিলে, যাহা অনাধুনিক বাংলা কাব্যে দুর্লভ। আর বাউল-কবিরা সমাজের সকল শাসনের বাহিরে বলিয়াই প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দবেদনা প্রকাশে কখনো কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। অনাধুনিক বাংলা কাব্যে হৃদয়বেদনা ও অন্তর্মুখিতার একমাত্র সার্থক পরিচয়স্থল বাউল গান। দুয়েকটা উদাহরণেই এই অভিমতের পোষকতা হইবে।

গগন হরকরার—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে॥

ঈশান যুগীর—

আমি মজেছি মনে।
না জানি মন মজল কিসে, আনন্দে কি খোদ্-মরণে।
ওগো, এখন আমায় ডাকা মিছে,
আমার নাই যে হিসাব আগে পিছে,
আনন্দে এই মন নাচিছে
শোন্ তার নূপুর বাজে রাত্রে দিনে॥

গঙ্গারাম বাউলের—

পরাণ আমার সোতের দীয়া।
আমায় ভাসাইলে কোন্ ঘাটে॥

মদন বাউলের—

নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে।
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি, সবুর বিহনে?

পদ্মলোচন বাউলের—

আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে—
কমল যে তার গুটাল জল আঁধারের তীরে।
গভীর কালোয় যমুনাতে চলছে লহরী,

(কালোয় ঢাকা যমুনাতে—রসের লহরী—)
ও তার জলে ভাসে কানে আসে রসের বাঁশরী ॥

বিশা ভূঞিমালীর—

হৃদয়-কমল চলতেছে ফুটে কতযুগ ধরি,
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, উপায় কী করি।
রে বন্ধু, মুক্তি কোথাও নাই ॥

এই গানগুলিতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে কবিহৃদয়ের গভীর আন্তরিক ব্যাকুলতা। এখানে সাধননির্দেশ গৌণ, মুখ্য হৃদয়বেদনার অবারিত প্রকাশ। ধর্মশাসন ও দেবমাহাত্ম্যপ্রচারনির্দেশ এখানে হৃদয়ের পথকে রুদ্ধ করে নাই। তাই এখানে গীতিপ্রাণের মুক্তি ঘটিয়াছে। এইজন্যই বাউলগান রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল।

দীর্ঘ তিন শত বৎসরের জীবন শেষ করিয়া বৈষ্ণব কবিতা অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তভাগে প্রেরণা-নিঃশেষিত হইয়া গেল। এই শতাব্দীর তৃতীয় পাদে ভক্ত রামপ্রসাদের বলিষ্ঠ কণ্ঠে মাতৃবন্দনা ধ্বনিত হইয়া উঠিল ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ঐ গীতিধারা প্রবাহিত হইল।

বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলাকে ঐশী বলা হইলেও তাহার পিছনে সমাজ-সমর্থন ছিল। অন্যথায় দীর্ঘ তিন শত বৎসর ধরিয়া এই ধারা প্রবহমান থাকিতে পারিত না। পুনশ্চ, বৈষ্ণব যুগে সামাজিক শিথিলতা ছিল, তাহা সমাজানুমোদন-বহির্ভূত প্রেমকে স্বীকার করিয়াছিল। সমাজের বিকৃতি, শিথিলতা ও অধ্যাত্মিকতা এই প্রেমকে আংশিক সমর্থন করিয়াছিল। প্রণয়িনী পারিবারিক জীবনে সম্মানের আসন পাইয়াছিল। বৈষ্ণবের স্থান সমাজে উচ্চে ছিল, ফলে বৈষ্ণবী প্রেমও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে সমাজে ও রাষ্ট্রে ভাঙন দেখা দিল।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে (বৈষ্ণব যুগে) মোটামুটি রাজনৈতিক ও সামাজিক শান্তি বজায় ছিল। তখন সামাজিক কাঠামো দৃঢ়মূল থাকায় বৈষ্ণব কাব্য অব্যাহত গতিতে মধুর রসের চর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। সমাজজীবন হইতে কোনো বাধা আসে নাই। বৈষ্ণব কবিদের অন্তর-বিগলিত সমস্ত রসধারা ও তাঁহাদের সৌন্দর্যসৃজনের মুখ্য প্রয়াস প্রাকৃত প্রেমের খাতেই প্রবাহিত হইয়াছিল। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের যে দার্শনিক তত্ত্বসম্ভূত অলৌকিক চরিত্র, তাহাতে প্রাকৃত প্রেমের তীব্র হৃদয়াবেগ ও রসানুভূতি কবিরা সঞ্চার করিয়া তুলিলেন। তবে বৈষ্ণব গীতিকবির মন ছিল অধ্যাত্ম-অনুভূতি-শাসিত মন। ধর্মগোষ্ঠীর পরিচয়েই বৈষ্ণব কবির পরিচয়, অন্য পরিচয় এখানে প্রধান নহে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসিয়া বৈষ্ণব কবিতা প্রথানুগত্য, বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি ও ছক-বাঁধা পথে পদ রচনা করিতে করিতে প্রেরণা-নিঃশেষিত হইয়া

গেল। বিরহের দশ দশা লইয়া অতিসূক্ষ্ম চুলচেরা বিভাগ, পূর্বরাগের সূক্ষ্ম শ্রেণিবিন্যাস, পরম্পরাক্রমে সব কয়টী স্তরের বর্ণনা—এই কৃত্রিম কঠোর বৈষ্ণব অলংকারশাস্ত্রানুগত্যের ফলে বৈষ্ণব কবিতা মানবীয় উত্তাপ হারাইল। 'উজ্জলনীলমণি'র দাসত্ব করিতে গিয়া প্রাকৃত প্রেমের তীব্র হৃদয়াবেগ বিনষ্ট হইয়া গেল।

তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামাজিক ওরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার দিনে প্রথাবদ্ধ আতিশয্যমণ্ডিত প্রেরণা নিঃশেষিত বৈষ্ণবী প্রেম ও বৈষ্ণব কাব্য নিন্দিত হইল। ফলে সমাজের প্রধান ধারা বৈষ্ণবী প্রেমকে অবজ্ঞা করিয়া পূর্বতন রক্ষণশীল খাতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বৈষ্ণবী প্রেমের প্রতি আর সামাজিক সমর্থন রহিল না। অসামাজিক প্রেম প্রবেশের রন্ধ্রপথগুলি সমাজের সতর্ক শাসনে রুদ্ধ হইয়া গেল। বিদেশি রাজপুত্র সুন্দরের সুরঙ্গ-পথে বর্ধমানরাজকন্যা বিদ্যার অন্তঃপুরে গোপন প্রেমাভিসার ও বিহার, এই সমাজশাসনের বিকৃত প্রতিক্রিয়া। সেদিন যে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বহুল প্রচলন হইয়াছিল, তাহা এই রুচিবিকৃতিরই পরিচায়ক। যাহা সমাজে নিষিদ্ধ হইল, তাহাই গোপন ব্যভিচারের পথে আসিয়া সমাজের ভিত্তিমূলে আঘাত করিল। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর অশ্লীলতা এই রুচি-বিকৃতির সাক্ষ্য মাত্র। রক্ষণশীল সমাজ ইহাকে বাধা দিতে বদ্ধ পরিকর হইল। সেদিন অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজ মাতৃকেন্দ্রিক হইয়া উঠিল। পারিবারিক কেন্দ্রস্থল পরিবর্তিত হইল—প্রণয়িনী নহে, এবার জননী; পরকীয়া-সাধনা নহে, এখন মাতৃধ্যান। জননীর কল্যাণকর প্রভাব প্রিয়াপ্রেমের বন্ধন-অস্বীকারী সমাজবিরোধী মনোভাবকে দমন করিল। সমাজ-বন্ধন কঠোরতর হইল। এই মাতৃপ্রাধান্য সামাজিক জীবন হইতে আধ্যাত্মিক জীবনে আপতিত হইল। অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে মাতৃপ্রভাব দৃঢ়বদ্ধ হইল, শক্তিপূজা প্রবর্তিত হইল। বাস্তব জীবনযাত্রা দূরতম অবাস্তব বৃন্দাবনী প্রেমের ক্ষীণায়মান প্রভাবকে অস্বীকার করিল। জীবনের অনিত্যতা, ক্ষুদ্রতা, ভয়াবহতা, অনিশ্চয়তা সামাজিক বিশৃঙ্খলা হইতে জনমানসে সংক্রামিত হইল। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তন সাধারণ মানুষকে জীবন সম্বন্ধে নিরাশা-ও অনিশ্চয়তাগ্রস্ত করিয়া তুলিল। বাঙালি মানস তখন মহাকালীর ভয়ংকরী রহস্যময়ী অভয়প্রতিমাকে আঁকড়িয়া ধরিতে চাহিল। 'ডুব দে রে মন কালী বলে, হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে'—ইহাই তখনকার মনোবৃত্তি। শাক্ত পদাবলীর ইহাই সামাজিক ও মানসিক পটভূমি।

বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্যক্তিগত সাধনার সুরটি গোষ্ঠীসাধনার সুরে প্রায় আচ্ছন্ন। তান্ত্রিক সাধনা-নির্দিষ্ট ধর্মচর্যা ব্যক্তিগত আকূতি ও অসহায় আত্মনিবেদনের ভাবকেই প্রাধান্য দিয়াছে। সেইজন্য লিরিকের প্রধান গুণ ব্যক্তিগত হৃদয়োচ্ছ্বাস ও আত্মপ্রকাশ শাক্ত পদাবলীর মধ্যে বেশি ফুটিয়াছে।

রাধাকৃষ্ণ বিশেষ অধ্যাত্মসাধনাসৃষ্ট প্রেমিক-প্রেমিকা, কালী শুদ্ধ মা, কিন্তু সর্বশক্তিময়ী। সাধারণ মাতৃভক্তি ও সন্তানস্নেহের মধ্যে কালী-আরাধনাকে বিধৃত করা সম্ভব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শাক্ত পদাবলীর বিজয়-বৈজয়ন্তী। প্রায় দেড়শত ভক্ত কবি সাড়ে তিন হাজারের কিছু বেশি শাক্ত পদ রচনা করিয়াছেন। এই শাক্ত সঙ্গীততরঙ্গমালার শীর্ষে আছেন রামপ্রসাদ সেন (১৭১৮—১৭৭৫)। তিনিই শ্রেষ্ঠ শাক্ত কবি। তাঁহার গানে যে অনায়াস সারল্য, আন্তরিকতা ও ব্যক্তিগত হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহা সহজেই আমাদের মনকে স্পর্শ করে। জগন্মাতার স্নেহলাভে ব্যগ্র সন্তানের আন্তরিক দুঃসাহসিক স্পর্ধা রামপ্রসাদের গানে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ইহার সারল্য, আবেদনের মর্মস্পর্শিতা ও ব্যাকুল বেদনার দুয়েকটি উদাহরণ উপস্থিত করিতেছি :

(ক) কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো॥
মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো।
ওমা, মিঠার লোভে, তিতমুখে সারাদিনটা গেলো॥
মা খেলবি বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলো।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিলো॥
রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো॥

(খ) মা মা বলে আর ডাকব না—
ও মা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥

(গ) জগৎ জননী তুমি গো তারা।
জগৎকে তরালে আমাকে ডুবালে।
আমি কি গো মা জগৎছাড়া॥

(ঘ) আমি কি দুখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত চাই॥

অনুভূতির গভীরতায়, প্রকাশের অনায়াস সারল্যে, হৃদয়াকূতির তীব্রতায় এখানে গীতিরসের স্বতোৎসার ঘটিয়াছে। ভক্তিমূলক গীতিকবিতায় সার্থক উদাহরণ রূপে রামপ্রসাদের পদাবলী এক স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে।

শাক্ত পদাবলীর ধারায়ও একদিন ভাঁটা পড়িল। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নব পীঠস্থান কলিকাতা ইংরেজ বণিক ও শাসকের রাজধানী রূপে দেখা দিল। সমাজে নৈতিক মানের আরো অধোগতি হইল। ইহার বর্ণনা আছে 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (১৮৬২)

গ্রন্থে। সেই শিথিল-রুচি কলিকাতার হঠাৎ-বাবু নিম্নরুচি নাগরিককুল শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্টপোষক রূপে দেখা দিল। "সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া তাহারা দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, সাহিত্যরস চাহিত না।" (রবীন্দ্রনাথ, 'লোকসাহিত্য', পৃ ৭৯)। এই পরিবেশে একদল 'কবিওয়ালা'র অভ্যুদয় হইল। তাঁহারা জীবিকা নির্বাহের তাগিদে ও হঠাৎ-বাবু কলিকাতার চাহিদা মিটাইবার জন্য চপল, চটুল, নিন্দা-কটাক্ষ-সমন্বিত, ইতর রুচিপূর্ণ এক ধরণের গান রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তখন ভক্তির একমুখীন গভীরতার স্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছে ও কলুষিত রুচি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কবিগান এই দুষ্ট রুচির ফল। এই কবিগানে ভক্তি আছে কিন্তু গৌণভাবে। আসর-বন্দনায় কবির লড়াইয়ে জয়ের আকাঙ্ক্ষায় মাতার প্রতি স্তবস্তুতি আছে, কিন্তু ইহা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, নিছক ভক্তিরসাত্মক নহে। ইহাতে রামপ্রসাদের আন্তরিক গভীর ব্যাকুল সুরটি নাই।

এই কবিগান বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর গীতিপ্রাণতা বজায় রাখিল। যুগসন্ধিকালে পুরাতন গীতিকাব্যের অযোগ্য উত্তরাধিকারী রূপে কবিগান দেখা দিল। এখানে একটি প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন। এই কবিগান কি গীতিকবিতার প্রসারের লক্ষণ প্রকাশ করে, না, গীতিকবিতার ক্ষুণ্ণ শিল্পবোধ, খর্ব মহিমা ও শিল্পের নিম্নীকরণের পরিচায়ক ? বৈষ্ণব কবিতায় যখন এক-ঘেয়েমি, গতানুগতিকতা ও অনুকরণপ্রিয়তা প্রাধান্য লাভ করিল, তখনই ইহার বিশুদ্ধ গীতিসুরটি নষ্ট হইয়া গেল। তখন প্রাণস্পন্দন ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছিল। কবিগানে বৈষ্ণব প্রেম কাব্যের বাঁধন ওধর্মবেষ্টনীর গণ্ডীমুক্ত হইয়া বাস্তবজীবনে সাধারণ মানুষের অন্তরে স্থান লাভ করিল। কবিগানের প্রেম একান্তই লৌকিক প্রেম। রাধাকৃষ্ণের বেনামীতে প্রেম আবরিত না স্বমহিমায় স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্যের সহিত দেখা দিল। বৈষ্ণব কবিতার ইতর প্রকাশ এই কবিগান। কিন্তু মানবিক প্রেমের যে ধর্মভাবমুক্ত প্রকাশ: তাহাই ইহাকে মূল্য দিয়াছে। এই কবিগানের স্বর্ণযুগ হইল ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়েই রাসু, নৃসিংহ, ভোলা ময়রা, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রমুখ খ্যাতনামা কবিয়ালের আবির্ভাব ঘটে।

কবিওয়ালাদের উদ্ভব বৈষ্ণব কবিতার বহুল প্রচার ও জনপ্রিয়তার পটভূমিকায়। বৈষ্ণব কবিতার উঁচু সুরে বাঁধা প্রণয়কাহিনী লোকায়ত স্তরে রুচিবিকৃত হইয়া নামিয়া আসিয়াছে কবিগানে। ভারাক্রান্ত উপমাপ্রয়োগ, অনুপ্রাস যমকের বাহুল্য, ছন্দোশৈথিল্য, চরণের অনিয়মিত দৈর্ঘ্য কবিও-য়ালাদের শিল্পদৃষ্টির অভাব সূচিত করে।

তথাপি কবিগান একটি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মর্যাদা দাবী করে। অধ্যাত্ম-প্রভাব-মুক্ত লৌকিক প্রেমের গীতি রচনার সূচনা ও প্রেমের অকুণ্ঠ জয়ঘোষণা কবি-গানকে মর্যাদা দিয়াছে। প্রেমাবেদনের এই নিরাবরণ দৃপ্ত আত্মপ্রকাশ একটি

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যে রেস্টোরেশন্ যুগের কবি Lovelace, Suckling প্রভৃতির সহিত কবিওয়ালাদের তুলনা করা চলে।

লৌকিক প্রেমের এই অকুণ্ঠ দৃপ্ত আত্মঘোষণার মূলে সামাজিক কারণ বর্তমান। আমরা দেখিয়াছি, প্রাণশক্তি-নিঃশেষিত বৈষ্ণব ধর্মের উপর শাক্ত ধর্ম অষ্টাদশ শতাব্দীতে জয়লাভ করিয়াছে। এই সময় হইতে সমাজে ও সাহিত্যে বৈষ্ণব অনুশাসন অপসৃত হইল। সমাজ ও সাহিত্য মাতৃকেন্দ্রিক হইয়া উঠিল; 'মা' 'মা' ধ্বনিতে সেই অনিশ্চিত রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে বাংলা দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। শাক্ত পদাবলী ইহার পরিচয়স্থল। কবিগানে সেই নির্বাসিত, নিষিদ্ধ, স্বাধীন প্রেমকাহিনী পুনর্বার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কৌলীন্য-অনুশাসন-পিষ্ট বহুবিবাহ-প্রথাবদ্ধ সমাজে যে অসন্তোষ ক্ষোভ ও বেদনা সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহা এই কবিগানে ও অনতিকাল পরে টপ্পায় প্রকাশের পথ পাইল। পরিবারের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ অতৃপ্ত প্রেম-পিপাসা ও নিরুদ্ধ হৃদয়াবেগ এই কবিগানে মুক্তি পাইয়াছে। সমাজবৈধ প্রেম—কুলীন ঘরে আপন স্বামীর জন্য প্রেম—এই স্বকীয়া প্রেম পরকীয়া প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া দুর্দমনীয় তীব্রতা লাভ করিয়াছে। সমাজ-অনুশাসন-পিষ্ট অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সমাজের ভিতরে থাকিয়াই কবিগানে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে। এ প্রেম আসলে সমাজবৈধ প্রেম। 'ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে, আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানি নে'—শ্রীধর কথকের এই প্রসিদ্ধ গানে লৌকিক প্রেম কোনো ছদ্মাবরণে নহে, আপন মহিমাতেই প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

আধুনিক প্রেমকবিতা বাংলায় রচিত হইবার পূর্বে কবিগান ও টপ্পাই একমাত্র প্রেমকবিতা। তবে গীতিকবিতা হিসাবে এগুলি সম্পূর্ণ সার্থক নহে। বৈষ্ণব কবিদের পদরচনায় পিছনে একটি সুবিপুল ঐতিহ্য, একটি সুনিয়ন্ত্রিত রসাদর্শ ও একটি সূক্ষ্ম শিল্পাদর্শ বর্তমান ছিল; কবিওয়ালারা যে এক্ষেত্রে দীন, তাহা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। অকৃত্রিম অনুভূতি, মর্মস্পর্শী সারল্য ও সাধারণ মানুষের সহিত সহজজ্ঞানলব্ধ পরিচয়—ইহারই জোরে কবিওয়ালারা গান রচনা করিয়াছিলেন। সার্থক গীতিকবিতায় কোনো দুর্বল বা তুচ্ছ অংশ থাকে না, তাহা একটি অখণ্ড শিল্পবস্তু। একটি রসনিটোল নীরন্ধ্র ক্ষুদ্রাবয়ব গীতিকবিতায় লিরিক্-কবি তাঁহার হৃদয়বেদনাকে রসমূর্তি দান করেন। কবিগান গীতিকবিতার এই বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত হইয়া একটি সমগ্র শিল্পবস্তুরূপে দানা বাঁধিতে পারে নাই। এই শিল্পত্রুটি মানিয়া লইবার পরই আমরা কবিগান ও টপ্পার রস উপভোগ করিতে পারি।

একটি গানেরই স্থানে স্থানে চমৎকার কবিত্ব আছে, প্রকাশভঙ্গীও অভিনব, কিন্তু সমগ্র গানটি পড়িলে অখণ্ড ভাবরূপ ধরা পড়ে না। এই ত্রুটি কবিগান ও টপ্পায় অবিরল।

একটি গানেরই স্থানে স্থানে চমৎকার কবিত্ব আছে, প্রকাশভঙ্গীও অভিনব, কিন্তু সমগ্র গানটি পড়িলে অখণ্ড ভাবরূপ ধরা পড়ে না। এই ত্রুটি কবিগান ও টপ্পায় অবিরল। যেমন, রাম বসুর—

মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলা হোল না।
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না॥

ইহার পরবর্তী চরণগুলিতে এই উৎকর্ষ বজায় নাই—

যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে।
নির্লজ্জা রমণী বোলে হাসিতো লোকে॥
সখি, ধিক্ ধিক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে।
নারী জনম যেন করে না॥

রাম বসুর অপর একটি গানে বিরহিণীর তীব্র অসংস্কৃত হৃদয়বেদনা অনাবৃত রূপে প্রকাশিত হইয়াছে :

প্রাণ, তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি।
মনে মনে মনাগুনে, আমি জ্বোল্‌বো বই আর বল্‌ব কি।
অনেক দিনের আলাপ বলে আদরে ডাকি।
কেমন আছ তুমি প্রাণ, নিজ দুখ তোমায় বলিনে।
ফলহীন বৃক্ষের কাছে সাধ্‌লে কাঁদ্‌লে ফোল্‌বে কি॥

গোঁজলা গুঁই একটি গানে বলিয়াছেন :

এসো এসো চাঁদবদনি।
এ রসো নীরসো কোরো না ধনি।
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ প্রাণ, তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী, তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি॥

প্রেমিক-প্রেমিকার নৈকট্যের সুন্দর পরিচয়স্থল এই কবিগানটি।

'ছলনা ও কলঙ্ক' কবিগানের উপজীব্য বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থূল ভোগবাসনা উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা ও প্রয়াসও কবিগানে লক্ষ্য করা যায়। রাসু-নৃসিংহের একটি বিরহসঙ্গীতে ইহার পরিচয় পাই :

কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমার মনের ব্যথা॥
করিলে শ্রবণো হয় দিব্যজ্ঞানো,
হেন প্রেমধনো উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে,
প্রীতি-প্রয়াগে মুড়াব মাথা॥……
হায়, কোন্ প্রেম লাগি, প্রহ্লাদো বৈরাগী,
মহাদেব যোগী কেমন্ প্রেমে।
কি প্রেম কারণে, ভগীরথ জলে,
ভাগীরথী আনে, ভারতভূমে॥……
কোন্ প্রেমফলে, কালিন্দীর কূলে,
কৃষ্ণপদ পেলে মাধবীলতা॥

মান-অভিমানের পালায় কৃষ্ণানুরাগিণী রাধারই পরিচয় পাই, তবে তীব্রতা ও আন্তরিকতা বৈষ্ণব গীতিকাব্যোচিত পর্যায়ে উন্নীত হয় নাই। রাম বসুর পদে রাধা বলিতেছেন :

আমি যেদিকে ফিরে চাই,
সেদিকেই দেখতে পাই
সজল আঁখি জলদ বরণে॥
শ্যামকে হেরব না সখি
বোলে চক্ষু মুদে থাকি।
সেরূপ অন্তরে দেখি॥

পুনশ্চ,

জীবনে মরণে, হরি তোমা বিনে
আর নাহি কো সখা।

পুনশ্চ,

হায়, পিরীতের কিবা সৌরভ আছে,
সে সৌরভ মম অঙ্গে রয়।
কলঙ্ক পবনে লইয়ে সে বাস ব্যাপিলো ভুবনময়॥

কবিগানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার নামে সাধারণ লৌকিক প্রেমব্যাকুলতাকেই রূপ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু টপ্পায় লৌকিক প্রেমের নিরাভরণ ছদ্মাবরণমুক্ত নির্ভীক জয় ঘোষণা। রামনিধি গুপ্ত, শ্রীধর কথক ও কালী মির্জার টপ্পা আধুনিক বাংলা প্রেমকবিতার যথার্থ ভূমিকা।

কালী মির্জা গাহিয়াছেন :

সই যে যার মরমে লাগে সে কি তারে ত্যজিতে পারে,
না ঘুচে আঁখির আশা ও মুখ হেরে।

যার সাথে মজে মন, সে তার পরম ধন,
সতত সে প্রাণপণ করে তাহারে ॥

পুনশ্চ,

কব কারে কত ভেবেছিলাম অন্তরে।
সকলি ভুলিয়ে গেলাম দেখিয়ে তোমারে।
মুখে না সরে বচন, নয়নে পলকহীন।
আমি যে আমার নই ॥

পুনশ্চ,

এতে কি সাজে এত মান।
ভালবাস বলে করেছিলাম অভিমান।
হলে অনুগত, দোষ করে যত।
তারে অনুচিত অপমান ॥

শ্রীধর কথকের টপ্পা :

ভালবাসিব বলে৷ ভাল বাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।
বিধু মুখে মধুর হাসি
দেখিলে সুখেতে ভাসি,
সে জন্যে দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে ॥

পুনশ্চ,

যারে তারে মন দিতে বলে গো (নয়ন আমার)
নিবারণ করি যদি, অগ্নি ভাসে জলে গো।
মন নয় মনেরি মত
নয়নেরি অনুগত,
বুঝায়ে রাখিব কত নানা পথে চলে গো ॥

এই গানগুলি যেমন ছন্দে ও আঙ্গিকে শিথিল, তেমনি উহাদের ভাবানুভূতির মধ্যে অসংযত বিস্তার, যথেচ্ছ বিসর্পণ-প্রবণতা ও প্রকাশের মধ্যে গাঢ় সংহতির অভাব অনুভূত হয়। সরলতা আছে, কিন্তু সর্বত্র শিল্পোন্নয়ন ঘটে নাই।

রামনিধি গুপ্তের (নিধুবাবুর) অসংখ্য টপ্পা হইতে মাত্র তিনটি ত্রুটিহীন টপ্পা এখানে উদ্ধার করিতেছি।

(ক) মনেরে না বুঝাইয়ে নয়নেরে দুষ কেন,
আঁখি কি মজাতে পারে, না হলে মনমিলন।
আঁখিতে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
যেই যাকে মনে করে, সেই তার মনোরঞ্জন ॥

(খ) বিচ্ছেদে যে ক্ষতি, তার অধিক মিলনে।
আঁখির কি আশা পূরে ক্ষণ দরশনে।
প্রবল অনল দেখ কিঞ্চিৎ জীবনে।
নির্বাণ হইতে কেহ দেখেছ কখনে॥

(গ) আমি ত তাহার সই, সে জানে আমার মন।
অযতনে কে কোথায়, কারে সঁপে প্রাণ।
মন রাখিবারে মন, করে এক মন,
মনেতে মনেতে কবে, হয় লো মিলন॥

এই ক্ষুদ্রায়তন গানগুলিতে লৌকিক প্রেমের যে অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, তাহাতে প্রেমিকার হৃদয়াবেগ সরাসরি প্রকাশ পাইয়াছে। প্রেমের বৈচিত্র্য, বিরহ-মিলনের নানা রূপ ও বিরহিণীর অসহ্য হৃদয়বেদনা এগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে। অনুভূতির তীব্রতা ও গভীরতা এগুলিকে লিরিকের মর্যাদা দান করিয়াছে। আধুনিক লিরিকের ভূমিকা এখানেই রচিত হইয়াছে।

ত্রুটিহীন কবিগানের উদাহরণ হিসাবে দাখিল করিতে পারি হরু ঠাকুরের এই গানটি :

পিরীতি নাহি গোপনে থাকে
শুন লো সজনি বলি তোমাকে।
শুনেছো কখনো জ্বলন্ত আগুনো
বসনে বন্ধনে রাখে।
প্রতিপদের চাঁদ হরিষে বিষাদ
নয়ন না দেখে উদয় লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদ কিঞ্চিৎ প্রকাশ
তৃতীয়ের চাঁদ জগতে দেখে॥

এই কবিতাটি প্রকাশের গাঢ়তায় ও ব্যঞ্জনাধর্মিতায় শ্রেষ্ঠ কবিগানের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোনো শিল্পবিরোধী শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায় না।

কবিওয়ালারা কেবল প্রেমের গানই রচনা করেন নাই, ভক্তিমূলক আগমনী গানও রচনা করিয়াছিলেন। বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া আগমনী গানের অন্যতম প্রধান রচয়িতা রাম বসুর কয়েকটি প্রসিদ্ধ গানের উল্লেখ করিতেছি :

(ক) গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী।
(খ) গৌরী কোলে করে নগেন্দ্ররাণী করুণ বচনে কয়।
(গ) গত নিশিযোগে আমি হে দেখেছি সুস্বপন।

"শরৎ সপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারী-বধূ মাতৃগৃহে আগমন করে, এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারী ঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায়,

তখন সমস্ত বাংলাদেশের চোখে জল ভরিয়া আসে।" (রবীন্দ্রনাথ, 'লোক সাহিত্য' : পৃ ১০১)। সেই ব্যথাতুর মাতৃহৃদয়ের আন্তরিক আর্তি রাম বসু ও রামপ্রসাদ সেনের আগমনী গানগুলিতে প্রকাশ লাভ করিয়াছে এবং তাহা গীতিকবিতার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। গানগুলির শিল্পমূল্য যাহাই হোক, আমাদের অন্তরে অতি সহজে উদ্রিক্ত করুণ রস, বাস্তব জীবনে বহু অনুভূত বেদনার্তি এই শাক্ত-বাৎসল্যের পদকে আগ বাড়াইয়া প্রত্যুদ্‌গমন করে, আমাদের চিত্ত পাগলিনী মেনকার ন্যায় এই কবিতা-নন্দিনীকে অশ্রুপ্লুত নয়নে বক্ষে চাপিয়া ধরে। ভাবোদ্দীপন যদি গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হয়, তবে এগুলি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যতীত আর দুইজন মাত্র কবির কথা আলোচনা করা চলে, অবশিষ্ট জনেরা ছিলেন কবিওয়ালা। প্রথম জন হইতেছেন রঘুনন্দন গোস্বামী, দ্বিতীয় জন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। রঘুনন্দনের বাংলা রচনাবলী হইতেছে : 'রামরসায়ন' কাব্য (১৮৩১), 'রাধামাধবোদয়' কাব্য ও 'গীতমালা'। রঘুনন্দন গত যুগের ধর্মভিত্তিক পাঁচালীর ধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি জীবিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার মন ছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে। আর মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৫-১৮৫৭) এ যুগের লোক, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তিনি 'রসতরঙ্গিণী' (১৮৩৩) ও 'বাসবদত্তা' (১৮৩৬) দুইটি বাংলা কাব্য প্রণয়ন করেন। প্রথমটি কয়েকটী আদিরসাত্মক সংস্কৃত শ্লোকের পদ্যানুবাদ মাত্র।

'বাসবদত্তা' কাব্যটী অনেক দিক দিয়াই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একটী উল্লেখযোগ্য কাব্য। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হইয়াও তিনি সে যুগের রুচি-পরিবর্ত্তনের দ্বারা প্রভাবিত হইতে রাজী হন নাই। সুবন্ধু-রচিত বিখ্যাত সংস্কৃত গদ্যকাব্য অবলম্বনে তিনি 'বাসবদত্তা' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের গঠনরূপ, পদবিভাগ, পদশীর্ষে ও গানশীর্ষে রাগতালের উল্লেখ শেষে ভণিতা ও সূচনায় বন্দনা নিঃসন্দেহে প্রাচীন কাব্যাদর্শের প্রতি আনুগত্যের সাক্ষ্য দেয়। বর্ণনা গতানুগতিক, শব্দ-প্রয়োগ নৈপুণ্য ও ছন্দোচাতুর্য ভাবের সরল প্রকাশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। ফলে কাব্যটি সার্থক হইতে পারে নাই। মূল সংস্কৃত গদ্যকাব্যের গাম্ভীর্য ও ধ্বনিমাধুর্য এখানে নাই। এই কাব্যের বাহ্য লিরিক্-রূপ আছে, কিন্তু কবির লিরিক্ মনোবৃত্তি ছিল না। গীতিকবিতার রসে অভিষিক্ত মন মদনমোহনের ছিল না, রঘুনন্দন ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেরও ছিল না। ফলে বিরুদ্ধচিন্তা, শ্লেষ ব্যঙ্গ 'বাসবদত্তা' কাব্যে প্রাধান্য পাইয়াছে, যমক অনুপ্রাসের বাহুল্যে, ছন্দোচাতুর্য প্রদর্শনের ব্যগ্রতায় একটী সম্ভাবনা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাবের ঘনীভূত আবর্তন কবিমনে ধরা দেয় নাই, তাই এই কাব্য ব্যর্থ।

রামপ্রসাদের ভক্তিমূলক শাক্ত পদাবলী ও কবিওয়ালাদের কবিগান ও টপ্পায়

বৈষ্ণব পদাবলীর গীতিধর্মিতার তরল রূপ ও শিথিল অনুস্মৃতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রঘুনন্দন ও মদনমোহন বাংলা কাব্যের এই মূল গীতিধারার বিরোধী। ভারতচন্দ্রের একশত বৎসর পরে এই দুই কবি ভারতচন্দ্রের প্রতিধ্বনি করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাই গীতিকবিতার ইতিহাসে ইহাদের কোনো স্থান নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের পীঠস্থান কলিকাতা নগরীতে বসিয়া গত শতাব্দীর ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রতিধ্বনি করিয়া কাব্যসাধনা সমাপ্ত করিলেন। আধুনিক যুগের প্রথম প্রহরে দাঁড়াইয়া তিনি অতীতের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন এবং প্রাচীন গীতিকাব্যের ধারাকেও অস্বীকার করিলেন। ফলে বিশুদ্ধ আত্মলীন গীতি-কবিতার জন্য আমাদের আরো বিশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইল। ইতি-মধ্যে কবিওলায়ারা হঠাৎ-বাবু রাজধানীর সান্ধ্য বৈঠকে গান গাহিয়া আসর জমাইতেছিলেন ও ঈশ্বর গুপ্ত রঙ্গব্যঙ্গ করিয়া দৈনন্দিন জীবনের পদ্য লিখিয়া কালক্ষেপ করিতেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আধুনিক যুগের কবি নহেন। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ইহার আগমনবার্তা সর্ব্বপ্রথম তিনিই ঘোষণা করেন। ভারতচন্দ্রে প্রাচীন সাহিত্যের যে অবক্ষয় শুরু হইয়াছিল. তাহা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সন্ধিস্থল ঈশ্বর গুপ্তের যুগ (১৮৩০ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)। ইহা যুগান্তরের লগ্ন। সেই লগ্নের পুরোহিত ঈশ্বর গুপ্ত। গোঁড়ামি ও রক্ষণ-শীলতার ধারক, কবিগান ও টপ্পার অনুরাগী ঈশ্বর গুপ্তের পদ্যে উদার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, রঙ্গরস, কাব্যের বিষয়ব্যাপ্তি—দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ সাময়িকের প্রতি আকর্ষণ, সদ্যোমুক্ত আত্মসচেতনতা, আন্তরিক দেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ লক্ষ্য করা যায়।

ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন বা আধুনিক ভাবধারা কোনটিই পুরাপুরি গ্রহণ করেন নাই। রক্ষণশীল সংস্কারবিরোধী প্রাচীন মনোভাব ও ব্যঙ্গপ্রবণ আধুনিক মনোভাব : এই দুই বিন্দুর মধ্যে গুপ্ত কবির মন আন্দোলিত হইয়াছে। তাঁহার ঋতুবর্ণনামূলক কবিতা বলিষ্ঠ বাস্তববোধ ও পরিহাসপ্রবণতাই প্রধান। প্রকৃতি সম্পর্কিত যথার্থ কাব্যদৃষ্টি তাহার ছিল না। নৈতিক ও পরমার্থিক কবিতাগুলিও সার্থকতা লাভ করে নাই। সেগুলি উপদেশপ্রধান ও তত্ত্ব-প্রতিপাদনমূলক কবিতা হইয়াছে। যে আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গি গীতিকবিতার মূল উপাদান, তাহা ঈশ্বর গুপ্তের ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে তীব্র, অসংস্কৃত, বস্তুরসপ্রধান দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে, তাহা আন্তরিক বা আত্মলীন হইয়া উঠে নাই প্রত্যক্ষ বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বর্ণনাই ঈশ্বর গুপ্তের আদর্শ। কাব্যের বিষয়ব্যাপ্তি, মরসংসারানুরাগ ও বস্তুপ্রীতি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যের সার কথা।

আধুনিক গীতিকাব্যের আবির্ভাব যে আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ইঙ্গিত পাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়।

এই আসন্ন আবির্ভাবের ইঙ্গিত হিসাবেই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কিছু মূল্য আছে। মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ' কবিতার সহিত ঈশ্বর গুপ্তের 'আত্মবিলাপ' কবিতাটির তুলনা করিলেই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ধরা পড়িবে। প্রথমোক্ত কবিতাটি আত্মনিষ্ঠ, তাহা কবির অন্তর্দ্বন্দ্বের বেদনার আন্তরিক প্রকাশ। দ্বিতীয়টি উপদেশমূলক, ইহার পেছনে কোনো বিশুদ্ধ গীতিকাব্যোচিত প্রেরণা নাই।

ঈশ্বর গুপ্ত আত্মবিলাপ করিয়াছেন এইভাবে :

না বুঝিলে সার মর্ম হায় হায় হায় রে।
কে আমার আমি কার, আমার কে আছে আর।
যত দেখ আপনার, ভ্রম মাত্র তায় রে।
আমার আত্মীয় কই, আমার আত্মীয় কই,
আত্মার আত্মীয় নই, আত্মা কই কায় রে।......
আমার বচন লও, আমার নিকটে রও,
নিরুপায় কেন হও থাকিতে উপায় রে।
যত্ন করি প্রাণপণে, সুখ ফল অন্বেষণে
বিষয়-বাসনা বলে ভ্রমিছ বৃথায় রে।
ভয়ানক এই বন, সঙ্গে নাই লোকজন,
ফিরে যাই ওরে মন আয় আয় আয় রে।

অপর পক্ষে মধুসূদন তাঁহার 'আত্মবিলাপ' কবিতায় (১৮৬১) খেদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আধুনিক গীতিকবিতার জন্মলগ্নকে বিষাদে পূর্ণ করিয়াছে। এই বিষাদেই গীতিকবিতার যাত্রা শুরু হইয়াছে। এই কবিতার সূচনাতেই এমন একটি মর্মান্তিক গভীর আন্তরিক পরিচয় পাওয়া যায় যাহা নিঃসন্দেহে আত্মলীন গীতিকবিতার পর্যায়ে উত্তীর্ণ হইয়াছে।
আশামুগ্ধ কবিচিত্তের বেদনার এই গীতধ্বনি পাঠকমনকে অভিভূত করে :

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে।
জীবন প্রবাহ বহি' কালসিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন
তবু এ আশার নেশা, ছুটিল না, একি দায়!......

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়
কব তা কাহারে?

স্বগন্ধ কুস্থম গন্ধে অন্ধকীট যথা ধায়
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ!
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে অনিদ্রায়?

মুকুতাফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর;
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলতলে
ফেলিস পামর।
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহকছলে?

কবির অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতার জন্যই তাঁহার মনোবেদনা বিশুদ্ধ আত্মলীন গীতিকবিতার রূপ ধারণ করিয়াছে, উপরিধৃত কবিতা পাঠের পর সে সম্পর্কে আর সন্দেহ থাকে না। এখানেই ঈশ্বর গুপ্তের ঐতিহ্য মধুসূদন অস্বীকার করিলেন ও আধুনিক গীতিকবিতার বিপুল সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

গীতিকবিতার স্বগভীর প্রেরণা 'আত্মবিলাপে' বিধৃত হইয়াছে। একটি আবেগোচ্ছ্বসিত কবিচিত্তের বিষাদপূর্ণ আত্মাবলোকন এই কবিতাটি। আশাভঙ্গের বেদনা ইহাতে সর্বত্র সঞ্চারিত এবং একটি রোমান্টিক কবি-চিত্তের হাহাকার—সংসার, জীবন ও কালের নশ্বরতা সম্পর্কে গীতিবিলাপ—ইহাকে করুণ মাধুর্য দান করিয়াছে। কবিতার গঠনশিল্পেই এই বিলাপ অনুস্যূত হইয়া আছে। প্রধান চরণগুলি দ্বিপর্বিক ও অতি দীর্ঘ (৮+৮ মাত্রা): সংসার ও জীবন সম্পর্কে নিরাসক্ত দার্শনিক মনোভাবের প্রতীক। প্রতি স্তবকে প্রথম ও তৃতীয় চরণটি দীর্ঘ, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণটি হ্রস্ব। ধীর লয়ের দীর্ঘ চরণের পরেই দ্রুত লয়ের হ্রস্ব চরণ তীব্র ব্যক্তিগত দুঃখের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার স্তবকের শেষ দুইটি চরণ—পঞ্চম ও ষষ্ঠ—পূর্বতন দৈর্ঘ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, যেন কবি ব্যক্তিচেতনাকে উত্তীর্ণ হইয়া নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সকল দুঃখ ও জগৎকে দেখিতেছেন। স্তবকের প্রথম ও শেষ চরণের অন্ত্যমিল সর্বজগদ্‌গত সত্য ও ঐক্যদৃষ্টির প্রতীক, আবার পঞ্চম চরণের অপ্রত্যাশিত অন্তর্মিল ছন্দে দ্রুতগতি আনিয়াছে এবং কবিমনকে একটি আকস্মিক প্রেরণাবলে বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হইতে সাহায্য করিয়াছে—যেখান হইতে কবি সংসার ও বাস্তব-জগতের একটি ব্যাপক গভীর দর্শন লাভ করিয়াছেন। চরণ ও স্তবকের গঠনকৌশল এইভাবে আলোচনা করিলে দেখি, রোমান্টিক কবিচিত্তের অশান্তি ও হাহাকার, অধীরতা ও বাস্তব-অতিক্রমের ব্যাকুলতা তীব্র

গভীর গীতিমূর্ছনায় এখানে নিঃসংশয় প্রকাশ লাভ করিয়াছে। আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার জন্মলগ্নের এই রোমান্টিক ব্যাকুলতা ইহার ভবিষ্যৎ যাত্রাপথকে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে আর সে পথের প্রথম কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রেনেসাঁস ও গীতিকবিতার বিলম্বিত আবির্ভাব

উনবিংশ শতাব্দী বাংলা দেশের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শতাব্দী। ইহা যেমন একটি বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের যুগ, তেমনই জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। বিদেশী শিক্ষার প্রভাবও যেমন প্রবল, তেমনই প্রাচীন দেশীয় আদর্শের প্রতি মমতা ও তাহা রক্ষা করিবার আগ্রহও প্রবল।

এই শতাব্দীতে বাঙালি বহু গুরুতর পরিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্য দিয়া গিয়াছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, ধর্মীয়—প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই বিপ্লবের পদচিহ্ন রহিয়াছে। এই শতাব্দীর বাঙালীর ভাবজগতের ভারসাম্য নানা অপরিচিত ও অভাবিত তরঙ্গে বিচলিত হইয়াছে, তাই কোনো সুস্পষ্ট আদর্শে সে অবিচল থাকিতে পারে নাই। এই দোলাচলচিত্তবৃত্তির মধ্য হইতেই তৎকালীন মানসজীবনের প্রকৃতি রূপটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এই রূপকে এককথায় বলা যায় রেনেসাঁস্ (Renaissance) বা সার্বিক নবজাগরণ।

'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "মানুষ হিসেবে ইংরেজ রইল মুসলমানের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে, কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে, আর কোনো বিদেশী আর কোনো দিন এমন করে আসতে পারে নি!" এই আগমনের সঙ্গেই বাংলার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যুগান্তরের সূচনা হইল, রেনেসাঁস্ বা নবজাগরণ ঘটিল। বিগত পাঁচ শত বৎসরের আলস্য, জড়তা, নির্জীবতা ও কূপমণ্ডুকতার নির্মোক ছিন্ন করিয়া বাঙালি পৃথিবীর রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। উনবিংশ শতাব্দীর এই রেনেসাঁ বাংলাদেশের যে পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, তাহা বিগত পাঁচশত বৎসরেও ঘটে নাই। শ্রীচৈতন্য-দেবের আমল হইতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য একঘেয়ে বিরক্তিকর মৃদুতালে প্রবাহিত হইয়াছে। এই রেনেসাঁসের ফলে কূলপ্লাবী জোয়ার আসিল—দেখা দিল বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ।

এই আধুনিক সাহিত্যে চরিত্রে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অশ্রান্ত কৌতূহল, মানবমুখিতা ও অন্তর্মুখিতা প্রাচীন সাহিত্য হইতে ইহাকে অনেক দূরে সরাইয়া আনিয়াছে। অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় ভরা আনন্দে বাংলা সাহিত্য রসসমুদ্রের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

প্রস্তুতি-পর্ব

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রসসাহিত্য দেখা দিল। প্রথমার্ধে তাহারই প্রস্তুতি। তখন কেবল জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই দীর্ঘ কাল কেবল বাংলা গদ্যের উৎকর্ষসাধনে, সাময়িক পত্রিকা প্রকাশে, ধর্ম ও সমাজসংস্কার-মূলক যুক্তিধর্মী প্রবন্ধরচনায় ও সংস্কৃত হইতে অনুবাদে ব্যয়িত হইয়াছিল। এই পর্বে কেবল ঈশ্বর গুপ্ত কিঞ্চিৎ রঙ্গব্যঙ্গের উৎসমুখ অনাবৃত করিয়াছিলেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পদ্যেরই একাধিপত্য ছিল। নবজাত বাংলা গদ্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহেব সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতদের হাত হইতে ছাড়া পাইয়া জ্যেষ্ঠ পদ্যের খাস তালুকে অভিযান চালাইয়া তাহাকে প্রায় কোণঠাসা করিল। পদ্য তখন কবিগান, টপ্পা, খেউড়ের আধারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাই গদ্যের রাজত্ব।

তারপর বহুদিন পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় কাব্যধারার উদ্বোধন করিলেন্—জাতীয়তাবোধ উদ্দীপনের বাহন হিসাবে কাব্যধারা দেখা দিল। ইহার পুর্বে ঈশ্বর গুপ্তে স্বাজাত্যবোধের প্রথম প্রকাশ ঘটে; রঙ্গলালের কাব্যে দেশপ্রেমের পুর্ণ প্রকাশ দেখা গেল। রঙ্গলালের প্রকৃত কৃতিত্ব এই যে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের 'বীর যুগের' সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। বাংলা কাব্যের ভূগোলে সমগ্র ভারতবর্ষ আসিয়া ধরা দিল। মঙ্গলকাব্যে ও বৈষ্ণব কাব্যে ঘরের আঙিনা ও তুলসীতলাই একমাত্র সত্য ছিল; আর ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় কলিকাতার নূতন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দেখা দিয়াছিল। কিন্তু রঙ্গলাল সংকীর্ণ বাঙালিয়ানা ত্যাগ করিয়া ভারত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। রাজস্থানের শৌর্যবীর্য-মণ্ডিত ইতিহাস-কাহিনীর প্রতি রঙ্গলাল গতানুগতিকতাক্লিষ্ট ভক্তিরোমন্থনস্তিমিত বাঙালির দৃষ্টি আর্কষণ করিলেন। বঙ্গসরস্বতীর বীণায় তিনি নূতন তার সংযোজন করিয়াই সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন অধিকার করিলেন। রঙ্গলালই রোমান্সরস ও স্বদেশপ্রেমের প্রথম বড় কবি। 'পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্য' বাংলার দেশ-প্রেমমূলক কাব্যের প্রথম পথিকরূপে তাই আজো আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আর্কষণ করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির নবজাগরণের এই যুগটি অত্যন্ত জটিল ও বিক্ষুব্ধ। নানা বিরোধী ভাবেব তরঙ্গ নানা পথে আসিয়া এই যুগটিকে আবর্তসংকুল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই বিক্ষুব্ধ ও জটিল যুগটির প্রতি-ফলন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গদ্যসাহিত্যে যতটা হইয়াছে, কাব্যসাহিত্যে ততটা হয় নাই। ইহার কারণ আমরা জানি। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে

বাঙালির সাহিত্যপ্রয়াস বিধৃত হইয়াছে মূলত গদ্যের আধারে। ১৮০০ হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদ্যরচনা হইতেছে : কবিগান, টপ্পা; রঘুনন্দন গোস্বামী, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বর গুপ্তের রচনাবলী। ইহার মধ্যে সেদিনের বাঙালির আসল পরিচয় ধরা পড়ে নাই।

১৮০১ হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকগোষ্ঠী পনেরটি গদ্যপুস্তক ও একটি বাংলা ভাষার অভিধান (কেরী-কৃত) রচনা করিয়াছেন। ১৮৫৪-র মধ্যেই রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন ও প্যারীচাঁদ মিত্রের গদ্যগ্রন্থের প্রকাশ ঘটিয়াছে। অন্তত দশখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরাট এন্‌সাইক্লোপিডিয়া 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' তের খণ্ডে বাহির হইয়াছে। নিম্নধৃত তালিকাটি লক্ষ্য করা যাক।

১৮৩৮—সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা
১৮৩৯—তত্ত্ববোধিনী সভা
১৮৪৩—'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা
১৮৪৬—কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাকল্পদ্রুম'
১৮৪৭—বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি'
১৮৫১—'বিবিধার্থসংগ্রহ' পত্রিকা
১৮৫১-৫৩—অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'
১৮৫৩—তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী'
১৮৫৪—বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'
১৮৫৪—'মাসিক পত্রিকা' প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশ।

এখানে দেখি, ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত গদ্যপ্রধান সাময়িক সাহিত্যরচনাতেই লেখকদের শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল। তারপর কাব্য উপন্যাসের নবজন্ম হইল ও জোয়ার আসিল। বস্তুতঃ ১৮০০ হইতে ১৮৫৮—এই পর্ব পরবর্তী পর্বের রসসম্ভোগের প্রস্তুতি-পর্ব, শুষ্ক গদ্যের ক্ষেত্রে আগামী রসবন্যার জন্য আয়োজন।

রেনেসাঁসের চরিত্র বিচার

বাংলাদেশের রেনেসাঁসের চরিত্র বিচারের পূর্বে রেনেসাঁস আন্দোলনের মূল লক্ষণগুলি জানা প্রয়োজন। সেগুলি হইতেছে : স্বতঃস্ফূর্ততা, জগৎ ও জীবনকে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা, অফুরন্ত উৎসাহ ও চঞ্চল্য, নিত্য নব নব ক্ষেত্রে পদক্ষেপ, প্রচলিত কোনো ধারায় উৎকর্ষ লাভের অপেক্ষা নব নব পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রবণতা, সংস্কার ও মোহমুক্তি, এবং সর্ব্বোপরি জাতির, দেশের ও সাহিত্যের সম্প্রসারণের মনোভাব, অভিলাষ ও সে সম্ভাবনায় বিশ্বাস।

য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের অকুণ্ঠ বাধাবন্ধহীন স্বতঃস্ফূর্ততা বাংলাদেশে গত শতাব্দীতে দেখা যায় নাই। য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের একদিকে যেমন রোমান্টিক ভাবনার উদ্বোধন ও মানবীয় বৃত্তিসমূহের নিরঙ্কুশ বিকাশ, তেমনি অপরদিকে প্রাচীনের পুনরুজ্জীবন ও গ্রীক রোমক সংস্কৃতির নব মূল্যায়ন। বাংলা দেশে জীবনের এই সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ রাজনৈতিক পরাধীনতার প্রভাবে বাধাগ্রস্ত হইয়াছিল। মানসিক হীনম্মন্যতা ও মোহগ্রস্ত অনুকরণের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপ্রবণ বাস্তববাদী সমালোচনা দেখা গিয়াছে এবং তাহা রোমান্টিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার উপরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রবন্ধে তাহার প্রমাণ ভূদেব ও রাজনারায়ণ, উপন্যাসে বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্র। আর কাব্যে জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ, মানবীয় গুণের চর্চা ও দেবত্বের বিরুদ্ধে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেন মধুসূদন; রঙ্গলাল ইতিহাস-রোমান্সের পথেই আত্মপ্রকাশের পথ সন্ধান করিলেন। রেনেসাঁস আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য—বাধাবন্ধহীন রোমান্টিকতার পূর্ণ বিকাশ। তা সেদিনের বাংলা দেশে ব্যাহত হইয়াছে ঐ সময়ের লেখকদের অতিনৈতিক প্রবণতা,আত্মরক্ষাপ্রবণতা ও বাস্তব সতর্কতা বুদ্ধির দ্বারা। এই অসফলতার ও অসম্পূর্ণতার ফসল উনবিংশ শতাব্দীর খণ্ডিত রোমান্টিক সাহিত্য। তবু এই জাগরণ অভিনন্দনযোগ্য এই কারণে যে, তাহা গত শতাব্দীর সাহিত্যমানস যে আধারে বিবৃত, সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

গত শতাব্দীতে বাংলা দেশের যে সার্বিক নবজাগরণ ঘটিয়াছিল,তাহার ধারক ও বাহক ছিলেন ইংরাজিশিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। তাঁহারা ইংরেজি শিক্ষাকে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন, ইংরেজ সংস্কৃতিবারি আকণ্ঠ পান করিলেন এবং ইংরেজির মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করিলেন। এই উত্তেজিত চঞ্চল নবজাগ্রত বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সমাজের বহু সংস্কার ও আচারকে অস্বীকার ও বর্জন করিলেন। 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের মাত্রাতিরিক্ত অস্বীকৃতি ও তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সনাতনী মনোভাবের গোঁড়ামি: এ দুইয়ের দ্বন্দ্বে সেদিনের বাঙালিমানস চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। একদিকে প্রবল অস্বীকৃতি, অপরদিকে দৃঢ়ভিত্তিক স্থিতধী প্রতিষ্ঠা—এই দুইয়ের আকর্ষণ বিকর্ষণে বাঙালিমানস অস্থির ও দিশাহারা। দুর্বার প্রাণাবেগ, দুর্মর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রবল মর্ত্যপ্রীতি, বলিষ্ঠ মানবিক চেতনার মধ্য দিয়াই তরুণ বাঙালি সেদিন আত্মবিকাশের পথ অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছে। এই অনুসন্ধানের পথে সব কিছুকেই ধ্বংস করিতে সে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই নেতিধর্মী জীবনাচরণের ফলে ব্যক্তিজীবনে দেখা গিয়াছে নিদারুণ বিপর্যয়, দেখা গিয়াছে নিঃশেষে ক্ষয় হইবার উদ্দাম আত্মঘাতী বিলাস, আর সর্বাপেক্ষা গুরুতর সামাজিক প্রতিক্রিয়া হইয়াছে এই যে, দেশের জনসাধারণের সহিত নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর

কোনো সংযোগ স্থাপিত হয় নাই, উভয়ে পরস্পর হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে, ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা এই ব্যবধানকে প্রসারিত ও দৃঢ়তর করিল। দেশের সংস্কৃতিভূমি ও জনচিত্তভূমির সহিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কোন যোগ রহিল না।

সেইজন্য এই নূতন জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ সুখের হয় নাই। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্বাসে ও আচরণে এই বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্ব-বিরোধী রূপ প্রকাশ পাইল। এক গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে মধ্যবিত্ত বাঙালি বিচলিত হইল। রামমোহন রায়ের বুদ্ধিগত বিদ্রোহই হউক. আর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুঃসাহসিক অস্বীকৃতিই হউক, বা বিদ্যাসাগর আমলের নবশিক্ষাপ্রিয়তাই হউক—সর্ব্বত্রই অন্তঃশীলা ফল্গুর ন্যায় এই অন্তর্দ্বন্দ্বের স্রোত প্রবাহিত ছিল। তাহারই ফলে সুখের সহিত বেদনা, উল্লাসের সহিত নিরাশা এই লগ্নে বর্তমান ছিল। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি এই অন্তর্দ্বন্দ্বের বেদনায় আন্দোলিত হইয়াছিল।

সাহিত্যে এই নবজন্মের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা-কাব্যপরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য :

'যাঁরা বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহ একটী কথা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এই সাহিত্য দুই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত। আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় তাতে সন্দেহ নেই। এই নিয়ে অপবাদ দেওয়া হয় যে, এ সব জিনিষ ন্যাশান্যাল নয়। তার মানে যদি এই হয় যে, এ সব কাব্য স্বভাবতই বাঙালি জাতির রুচিবিরুদ্ধ, তাহলে তো এ জমিতে স্বতই উঠত না, এর অঙ্কুর উঠলেও শিকড়শুদ্ধ দুদিনে যেত শুকিয়ে, বলা বাহুল্য তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।...আধুনিক কাব্য আপন বেগেই দেশের চিত্তে আপনার পথ গভীর ও প্রশস্ত করে দিয়েছে।...বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবর্তনা যে এত দ্রুতগতিতে নানা পথে নানা রূপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে তার কারণ সেই সাহিত্যের আদর্শ হঠাৎ বাঙালির মনকে বাঁধা গণ্ডি থেকে মুক্তি দিয়েছে। তার মধ্যে একটা কৌতূহলী প্রাণশক্তি আছে যা নব নব পরীক্ষার পথে আপনাকে নূতন করে আবিষ্কার করতে উদ্যত। সে চিরাগত প্রথার বাধার উপর দিয়ে বারে বারে উদ্বেল হয়ে চলেছে। এই প্রাণশক্তির জিয়নকাঠি একদিন সমুদ্র পার হয়ে বাংলাভাষাকে স্পর্শ করল। বন্দিনী যেমন দ্রুত সাড়া দিয়ে জেগে উঠল, ভারতবর্ষের অন্য কোনো প্রদেশে এমন ঘটেনি। তারপর থেকে বাঙালির ভাবপ্রবণ মনের পরিপ্রেক্ষণিকা সাহিত্যসৃষ্টিতে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল।"

এই জাগরণের সার্থক পরিচয় মূল উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য।

অন্তর্মুখী গীতিকবিতার সূচনা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি-মানসের বিদ্রোহ ও স্বীকৃতি, প্রতিবাদ ও সমর্থন, আনন্দ ও বেদনার মূর্ত প্রকাশ। তাঁহার মধ্য দিয়াই সেদিনের বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত বাঙালির গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব চমৎকার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সমসাময়িক দ্বন্দ্বজটিল, স্ববিরোধে মথিত সমাজমানসিকতার শিল্পায়নে ভাস্বর মধুসূদন। আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার উন্মেষের জন্য এই অন্তর্বেদনার প্রয়োজন ছিল। মধুসূদনে এই অন্তর্বেদনার প্রথম প্রকাশ ঘটে, তাই মধুসূদনে আধুনিক লিরিকের সূত্রপাত হইয়াছে।

মধুসূদন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যবিত্ত বাঙালির সার্থক প্রতিনিধি। মধুসূদনের অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতার জন্যই তাঁহার মনোবেদনা গীতিকবিতার রূপ ধারণ করিয়াছিল।

মধুসূদন মূলতঃ মহাকাব্যের কবি। কিন্তু তাঁহার মহাকাব্যেও বাংলা কাব্যের চিরন্তন ঐতিহ্যের ছাপ রহিয়া গিয়াছে। তিনি অভ্রান্ত কাব্যসংস্কার-বলে লিরিকের সুরটি তাঁহার মহাকাব্যে ধরিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যে বিলাপের মধ্যে কবির জীবনবেদনা, বঞ্চিত ব্যর্থ আশার রুদ্ধ রোদনাবেগ, বিশ্ববিধানের প্রতি সার্ব্বভৌম ক্ষোভ ও বিদ্রোহের সুরটি স্পষ্ট শোনা যায়। যে কবি 'আত্মবিলাপে' আশার ছলনায় নিদারুণ আঘাতের কথা লিখিয়াছেন, তাঁহারই প্রচ্ছন্ন অশ্রু, শোক-কম্পিত কণ্ঠস্বর, তাঁহারই ভাগ্যহত জীবনের বিষণ্ণ বিড়ম্বনাবোধ চিত্রাঙ্গদা-রাবণের খেদোক্তির ভিতর দিয়া নিজ ছদ্ম-প্রকাশের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। ইহা তো লিরিক্ কবিরই কাজ—আত্ম-ভাবের প্রকাশ। মধুসূদন যে আধুনিক কালের আহ্বানে ও বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত গীতিধারার কলোচ্ছ্বাসে সাড়া দিয়াছেন, তাহাতেই প্রমাণ হয় তিনি এই মূল ধারারই কবি, বিপথের পথিক নহেন।

আরো লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সমসাময়িক কবিগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁহারই মন ছিল সর্ব্বাপেক্ষা আবেগধর্মী ও আত্মপ্রকাশপ্রবণ। তাই তাঁহার রচনায় মহাকাব্যের নৈর্ব্যক্তিকতা বিশেষ করিয়া ব্যক্তিমানসের রঙে অনুরঞ্জিত হইয়াছে ও আত্মপ্রকাশের আবেগে দোলায়িত হইয়াছে। মেঘনাদবধকাব্য (১৮৬১), আত্মবিলাপ (১৮৬১) 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা (১৮৬২)—এই গুলিতে গীতিপ্রাণতা ও আত্মভাবসাধনার যে প্রকাশ, তাহা প্রত্যক্ষ কবি কর্মরূপে দেখা দিয়াছে 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে (১৮৬১)।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন বাংলা গীতিকবিতার গঙ্গোত্রী বৈষ্ণব পদাবলীর উপজীব্য রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া আধুনিক প্রেমকবিতা লিখিয়াছেন। দেশবিদেশের সাহিত্যসংসারে স্বচ্ছন্দবিহারী মধুসূদন যে প্রেমকবিতা লিখিবেন, তাহাতে আশ্চর্যের কি আছে? লক্ষণীয় এই যে, তিনি বাংলায় প্রেম ও বিরহের আর্তি প্রকাশ করিতে গিয়া যুগলপ্রেমের দম্পতি নিত্য-

প্রেমলীলামত্ত বৈষ্ণবভূষিত রাধাকৃষ্ণেরই শরণাপন্ন হইয়াছেন। মধুসূদনের জীবনচরিত পাঠে জানা যায় যে, ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রচনাকালে রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিধুবাবু প্রভৃতির টপ্পা গান ও বিরহের কবিতা-পাঠে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের আখ্যাপত্রে মধুসূদন কৃষ্ণচন্দ্র শর্মার বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্য 'পদাংকদূতম্'-এর প্রথম শ্লোকের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদাংকদূতের রাধিকা কৃষ্ণবিরহে ক্লিষ্টা—তিনি উন্মাদিনী—"উন্মত্তেব খলিত-কবরী নিঃশ্বসন্তী বিশালম্।" রসশাস্ত্রে নায়িকার দশ দশার উল্লেখ আছে। পদাংকদূতের রাধিকা অষ্টম দশাপ্রাপ্তা। এই কাব্যে বর্ণিত রাধিকার দিব্যোন্মাদের আদর্শে মধুসূদন তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনা করিলেন। সুতরাং একথা নির্ভয়ে বলা চলে, মধুসূদন বাংলা কাব্যঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন, বিরোধী ছিলেন না। ব্রজাঙ্গনা রাধিকার বেদনার মূল উৎস পদাবলীর রাধিকার হৃদয়-আর্তি।

'ব্রজাঙ্গনা' রাধার সখীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন :

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা ; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ?
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ?

এই ব্যাকুলতার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহ সুরের প্রতি কবির আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়। এই সুরের প্রতি, ভঙ্গির প্রতি আনুগত্য কবির ছিল, কিন্তু তাহা অপেক্ষা বেশি কিছু নহে। বৈষ্ণব ভাবসাধনা কবি গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু রাধিকার বিরহ আর্তিটুকু গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আধুনিক রোমান্টিক গীতিকবিতা বাংলা সাহিত্যে দেখা দিল—'সারদামঙ্গলে' (১৮৭৯) তাহার প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু ইহা পূর্ব্বোক্ত গীতিকাব্যধারার সহিত যুক্ত। বিহারীলালের কাব্যেই আধুনিক গীতিকবিতার মৌলিক সুরটী সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কবিচিত্তের আত্মউদ্বোধন হইল—বর্হিজগৎকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া কবি মানসজগতে আত্মবিসর্জন করিলেন। এই অন্তর্মুখীন গীতিরসে বিহারীলাল পাঠকচিত্তকে সিক্ত করিয়া তুলিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় "বিহারীলাল তখনকার ইংরেজি ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন

না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।" ('আধুনিক সাহিত্য')। ব্যক্তি-পরিচয়ে কবির পরিচয় এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

বসন্তের আগমনে হঠাৎ একদিন রিক্ত বনভূমি রঙিন ফুলে ছাইয়া যায়, নবসৌন্দর্যে বনভূমি বিকশিত হইয়া উঠে। ঠিক এইভাবেই বাংলা সাহিত্যে আকস্মিক প্রাচুর্যের মধ্যে নবযুগ আত্মপ্রকাশ করিল। নীচের তালিকা হইতেই এই আকস্মিকতা ও অজস্রতার পরিচয় মিলিবে।

১৮৫৮

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্য
বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী—স্বপ্নদর্শন কাব্য
হরচন্দ্র ঘোষ—'কৌরব-বিয়োগ' (পৌরাণিক নাটক)
রামনারায়ণ তর্করত্ন—'রত্নাবলী' (সংস্কৃতানুবাদ)
তারকচন্দ্র চূড়ামণি—'সপত্নী' নাটক (বহুবিবাহ বিষয়ক)
কালীপ্রসন্ন সিংহ—'সাবিত্রী সত্যবান' নাটক (মৌলিক রচনা)

১৮৫৯

মধুসূদন দত্ত—শর্মিষ্ঠা নাটক
রামদাস সেন—তত্ত্বসংগীত লহরী (কাব্য)
কালীপ্রসন্ন সিংহ—'মালতী মাধব' নাটক (সংস্কৃতানুবাদ)
—'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক (")

১৮৬০

মধুসূদন দত্ত—তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য
—একেই কি বলে সভ্যতা? (প্রহসন)
—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (")
—পদ্মাবতী নাটক
দীনবন্ধু মিত্র—নীলদর্পণ নাটক
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—মেঘদূত কাব্য (অনুবাদ)
রামনারায়ণ তর্করত্ন—অভিজ্ঞান শকুন্তল (সংস্কৃতানুবাদ)

১৮৬১

মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদবধ কাব্য
—ব্রজাঙ্গনা কাব্য
—কৃষ্ণকুমারী নাটক
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—চিন্তাতরঙ্গিণী (কাব্য)
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—সদ্ভাবশতক (কাব্য)
রামদাস সেন—কুসুমমালা (কাব্য)

১৮৬২

মধুসূদন দত্ত—বীরাঙ্গনা কাব্য
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—কর্মদেবী কাব্য
বিহারীলাল চক্রবর্তী—সংগীতশতক (কাব্য)
কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা

১৮৬৩

দীনবন্ধু মিত্র—নবীন তপস্বিনী (নাটক)
গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—চিত্তসন্তোষিণী (কাব্য)

১৮৬৪

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বীরবাহু কাব্য
গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ঋতুদর্পণ, কৃষ্ণবিলাস (কাব্য)
রামদাস সেন—বিলাপতরঙ্গ (কাব্য)
হরচন্দ্র ঘোষ—চারুমুখচিত্তহরা নাটক (ইংরাজীর অনুবাদ)

১৮৬৫

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—দুর্গেশনন্দিনী (উপন্যাস)
বনোয়ারীলাল রায়—জয়াবতী (ঐতিহাসিক কাব্য)
প্যারীচাঁদ মিত্র—যৎকিঞ্চিৎ (নক্‌শা)

১৮৬৬

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কপালকুণ্ডলা (উপন্যাস)
মধুসূদন দত্ত—চতুর্দশপদী কবিতাবলী
জগদ্বন্ধু ভদ্র—ভারতের হীনাবস্থা (কাব্য)
দীনবন্ধু মিত্র—বিয়েপাগলা বুড়ো (প্রহসন)
—সধবার একাদশী (নাটক)

১৮৬৭

দীনবন্ধু মিত্র—লীলাবতী (নাটক)
রামদাস সেন—কবিতালহরী
—চতুর্দশপদী কবিতামালা

রেনেসাঁসের আঘাতে বাংলা কাব্যজগতে প্রথম প্রতিক্রিয়া হইল প্রাচীনের নব প্রতিষ্ঠা। ইংরাজী রোমান্টিক আন্দোলনে যাহা ঘটিয়াছিল, এখানে তাহাই ঘটিল—রোমান্সের পথে এই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইল। আমাদের ইতিহাস-চেতনা রোমান্সের স্বপ্নলোকে জাগরিত হইল—অবহেলিত অবজ্ঞাত প্রাচীন ইতিহাস নবরূপে দেখা দিল। নবজাগ্রত রোমান্স-উত্তেজিত বাঙালি রাজস্থানের গৌরবময় শৌর্যবীর্যকথা (রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ও 'কর্মদেবী'), পুরাণকাহিনী (মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব' ও হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' ও 'দশমহাবিদ্যা'), রামায়ণকথা (মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ') এবং

মহাভারতকথার (নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস') প্রতি প্রবল অনুরাগ দেখাইল।

নবজাগ্রত কাব্যরসপিপাসু বাঙালি চিত্তের প্রবণতা ক্লাসিকধর্মী মহাকাব্য ও আখ্যায়িকা কাব্যের দিকেই ঝুঁকিয়াছিল এবং আলোচ্য পর্বে (উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে) এই ক্ষেত্রেই কবিদের শক্তি যে বেশির ভাগ নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহা এই পর্বে প্রকাশিত কাব্যতালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ধরা পড়িবে। নবজাগরণের প্রথম দশ বৎসরের যে তালিকা উদ্ধার করিয়াছি তাহাতে মহাকাব্য, আখ্যায়িকাকাব্য, তত্ত্ব ও যুক্তিপ্রধান কাব্য, নাটক, প্রহসন, উপন্যাস, নক্শা, গান, সনেট—সব কিছুরই দেখা মিলিতেছে—লিরিক বা গীতিকবিতা বাদে।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক লিরিকের আবির্ভাব বিলম্বে ঘটিয়াছে। ইহার জন্ম দায়ী কে? কবিদের দায়ী করা হয়ত সমীচীন হইবে। আলোচ্যমান কবিরা সকলেই ইংরাজিশিক্ষিত। ইংরাজি কাব্যের ক্লাসিক পর্ব ও রোমান্টিক পর্বের কাব্যরাজি ইঁহারা সকলেই উত্তমরূপে সম্ভোগ করিয়াছিলেন, অথচ লেখার সময় তাঁহারা ক্লাসিক সৃষ্টিকর্মের প্রতি ঝোঁক দিয়াছিলেন। ১৮৭০-এর পূর্বে বাংলা কাব্যে সচেতনভাবে গীতিকবিতা রচনার কোনো প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। বিহারীলালের নিজস্ব সুর প্রথম ধরা পড়িয়াছে 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে (১৮৭০)। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা কাব্যে'র প্রকাশকাল ১৮৮০; আর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৭৩-৭৪-এ।

গীতিকবিতার এই বিলম্বিত আবির্ভাবের ও ক্লাসিকধর্মী কাব্যের সহিত তুলনায় জনপ্রিয়তা ও প্রসারের ক্ষেত্রে অবনত থাকার কারণ কি?

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রোমান্টিক গীতিকবিতার প্রচুর সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ক্লাসিকধর্মী মহাকাব্যের ধারাই এই পর্বে প্রবল। এই পর্বে কাব্যধারার লক্ষ্য অনির্দেশ্য সৌন্দর্যলোক নহে; জাতীয় আদর্শ প্রচারের গুরু দায়িত্ব ক্লাসিকধর্মী কাব্যধারা বহন করিয়াছিল। এই শতাব্দীতে বাঙালির জাতীয় জীবনের সর্বব্যাপী সংগঠনযজ্ঞ শুরু হইয়াছিল। হিন্দুমেলা (বা চৈত্রমেলা ১৮৬৭), 'নেশানাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা (১৮৭১), নীলচাষী বিদ্রোহ, উড়িষ্যায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (১৮৬৬), শিশির ঘোষের 'ইণ্ডিয়ান লীগ' (১৮৭৫) প্রতিষ্ঠা, 'ভারতসভা' ও 'ভারতীয় বিজ্ঞান সভা (১৮৭৬) প্রতিষ্ঠা, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫) প্রভৃতি আন্দোলনের মধ্য দিয়া দেশাত্মবোধ বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছিল; বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে যুগব্যাপী জড়তা ও কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করা হইয়াছিল; তাহারই ফলে দেশের আকাশে-বাতাসে একটি সুতীব্র আবেগ ও উন্মাদনা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই আবেগ ও উন্মাদনা প্রকাশের উপযুক্ত বাহন খুব স্বাভাবিক

কারণেই গীতিকবিতা হইতে পারে না ; গুরুবস্তভার-বহনক্ষম আখ্যায়িকা-কাব্যই সে আবেগ ও উন্মাদনার যথার্থ ও যোগ্য আধার হইতে পারে। গীতিকবিতা রচনার জন্য যে ধ্যানাবিষ্ট অনুভূতি, 'emotions recollected in tranquillity' প্রয়োজন, তাহা সেই দায়িত্বভারাবনত পরিবেশে লাভ করা সম্ভব ছিল না। তাই বোধ হয় উনবিংশ শতাব্দীর জনচিত্ত যেন গীতিকবিতার রস-সম্ভোগ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। জাতীয় জীবনে শান্তি ও স্থিতি না আসিলে গীতিকবিতা সর্বহৃদয়সংবাদী হইয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই এই পর্বে গীতিকবিতার আবির্ভাব বিলম্বিত হইয়াছিল ও তাহার পদক্ষেপে কুণ্ঠা ও দ্বিধা লক্ষ্য করা গিয়াছিল। গীতিকবিতার রস-আত্মা সে যুগের রসিকের নিকট পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় নাই। সে যুগের কাব্য-পিপাসা রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের জাতীয় ভাবোদ্দীপক মহা-কাব্যের মধ্যেই চরিতার্থ হইয়াছে। যে সৈনিক যুদ্ধে যাইতেছে রোমান্টিক কবির সূক্ষ্ম ভাবকল্পনা তাহার চিত্তকে উদ্দীপ্ত করিতে পারে না ; ক্লাসিক কাব্যের বীর গাথা, অস্ত্রের ঝনৎকার, যুদ্ধ যাত্রার উন্মাদনা ও যুদ্ধজয়ের উল্লাস তাহাকে অনুপ্রাণিত করে। সেই কারণে উঁচু সুরে-বাঁধা আখ্যায়িকা-কাব্য ও মহাকাব্যই এই পর্বের মুখ্য কাব্যধারা ; গীতিকবিতার ধারা শুরু হইয়াছে, তবে তাহা তখনও যুগচিত্তের স্বীকৃতি লাভ করে নাই।

কিন্তু ১৮৭০ সাল হইতে গীতিকবিতা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলা কাব্যজগতে এক বিরাট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে : ক্লাসিক কাব্যধারাই বজায় থাকিবে, না, রোমান্টিক কাব্যধারার জয় হইবে ? শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক গীতিকবিতার জয় হইয়াছে এবং বিহারীলালের ব্যতিক্রমই সর্বসম্মত-নিয়মে পরিণত হইয়াছে। রবীন্দ্র-নাথের মধ্যে এই গীতিকাব্যধারার জয় ঘোষিত হইয়াছে। মধুসূদনের মহাকাব্যের বিপুল ধারা দুর্বল অক্ষম অনুকারকদের হাতে পড়িয়া ব্যর্থতার মরুবালুতে শুষ্ক হইয়াছে ; বিহারীলালের সংকীর্ণ রোমান্টিক ধারা রবীন্দ্রগীতি-সমুদ্রে পতিত হইয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে। বাংলা কাব্য মহাকাব্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া গীতিকবিতার ধারাকেই আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে আখ্যা-য়িকাকাব্য ও গীতিকাব্য—এ দুই ধারাই পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়াছে ; শেষ পর্যন্ত আখ্যায়িকাকাব্য পরাজয় স্বীকার করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলা কাব্যের এই ক্লাসিক পর্বটিতে বিশুদ্ধির অভাব আছে ; ইহা সংহত হইতে না হইতেই রোমান্টিক গীতিধারা ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ইহাকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে।

আসলে এই পর্বে দীর্ঘ কাহিনীকাব্য, আখ্যায়িকাকাব্য বা মেঘনাদবধ কাব্যের ন্যায় এপিক-কাব্য রচনা সাহিত্যের প্রথা ছিল। সকল কবিই এই

চলিত প্রথার অনুসরণ করিতেন। তাই এই পর্বে আখ্যায়িকাকাব্যের বহুল প্রচলন দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ আখ্যায়িকাকাব্য দিয়াই কাব্যজীবন শুরু করিয়াছেন, কিন্তু অত্যল্পকালের অভিজ্ঞতাতেই তাঁহার কবিমানস বুঝিতে পারিয়াছিল—এই পথ তাঁহার পথ নহে; তাঁহার প্রকৃত পথ গীতিকবিতা বা লিরিক। নাটক ও গীতিকবিতার সীমান্ত প্রদেশের রচনা 'ভগ্নহৃদয়'। এখানে দুই শ্রেণীর রচনাই মনকে টানিতেছে। আবার আখ্যায়িকা কাব্যেরও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কোন্ পথে তিনি যাইবেন তাহা এখানেই নির্ধারিত হইয়াছে।

তাই একথা নির্ভয়ে বলা চলে উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে যে গীতি-কবিতার উদ্বোধন ও বিকাশ হইল তাহা নূতন আশাবাদে ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় গৌরবান্বিত হইয়াছে। আত্মভাবের উদ্বোধন হইয়াছে—স্বদেশপ্রীতির সুরকে অবলম্বন করিয়া সে এখন তৃপ্ত নহে, গরুড়পক্ষীসম ক্ষুধায় নব নব ভাব-মহা-দেশের পথে তাহার অনির্দেশ্য প্রয়াণ শুরু হইতে চলিয়াছে।

প্রাচীনের নব প্রতিষ্ঠা হইয়াছে একথা সত্য। রোমান্সের স্বপ্নলোকে ইতিহাস-চেতনাকে জাগ্রত করা হইয়াছে। কিন্তু গীতিকবিতা তাহাতেই তৃপ্ত নহে। অন্তর্মুখীন গীতিপ্রাণতা এখন নব নব ভাবের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।

রোমান্স ও আদর্শবাদের স্বপ্নজগতে গীতিকবিতা নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াছে; আত্মভাবের দ্বারা সে জগৎকে আয়ত্ত করিতে চাহিতেছে। ফলে তাহার আশাবাদ ও আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন সুর সংযোজিত হইল; তাহা নিরাশা ও বেদনার সুর।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে এই নিরাশার সুর। সরস্বতীর কমলবনে বিচরণশীল কবিকণ্ঠে হাহাকার-ধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারই মধ্যে বাংলার গীতিকবি নূতন আনন্দ লাভ করিলেন। বাস্তবের রূঢ় সংঘাতে যখন আদর্শ ও রোমান্সের স্বপ্নলোক ভাঙিয়া গেল, তখনই এই নিরাশা ও বিষাদের বেদনার্ত সুর উত্থিত হইল।

এই নিরাশার সুর সেই যুগেরই সুর। তখন জগতের সকল দেশের কাব্যেই এই সুর ধ্বনিত হইতেছিল। প্রখ্যাত সমালোচক Alfred Austin ১৮৯৩ সালে বলিয়াছিলেন: "During the last few years, a wave of doubt, disillusion and despondency has passed over the world. One by one, all the fondly cherished theories of life, society and empire had been abandoned. We no longer seemed to know whither we were marching, and many appeared to think that we were marching to Perdition."

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'despondency', মিল্‌-এর 'dejection,' তুফেলস্‌ড্রক্‌-এর 'Eternal Nay' এই সর্বব্যাপী নিরাশা ও বিষাদের কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। ইংলাণ্ডে বায়রন্, শেলী ও ভিক্টোরীয় যুগের কবিবৃন্দ, জার্মানীতে কবি হাইনে, ইতালীতে লিওপার্দি এই নিরাশার সুরে কাব্যবীণাকে বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। এই সর্বগ্রাসী হতাশা ও বেদনার উৎস ফরাসী বিদ্রোহ (১৭৮৯)। জীবন সম্পর্কে আকর্ষণের বিলুপ্তি, নিয়তির হস্তে মানব ভাগ্যের অসহায়তা এই চিন্তার মূলে বর্তমান।

বাংলা গীতিকবিতার ক্ষেত্রেও এইরূপে নিরাশার সুর ও বিষাদের আত্মরতি লক্ষ্য করা গেল। জীবন সম্পর্কে চরম হতাশা, ব্যর্থতার বোঝা বহিয়া বেড়ানোর ক্লান্তি, অদৃশ্য নিয়ামক নিয়তির হাতে মানুষের অসহায়তা প্রভৃতি বিষয় বাংলা গীতিকাব্যেও বহু-আলোচিত হইল। এই মনোভাব মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপে' (১৮৬১) ও 'মেঘনাদবধ কাব্যে' (১৮৬১); হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, অক্ষয় বড়াল, কামিনী রায়, সরলাবালা দাসী, প্রিয়ম্বদা দেবী, এবং রবীন্দ্রনাথের প্রাক্-'মানসী' পর্বের কাব্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই মনোভাবকে এককথায় বলা চলে রোমান্টিক বিষাদ (Romantic melancholy)।

এই রোমান্টিক বিষাদের পূর্ণ পরিচয় লক্ষ্য করা করা যায় রবীন্দ্রনাথের প্রাক্-'মানসী' পর্বের কাব্যে। তখন তিনি ঘন অন্ধকার, অস্ফুট ছায়াময় কল্পনারাশির ও এক প্রকার অস্বাস্থ্যকর ভাবোচ্ছ্বাসমূলক বিষাদের পর্যাপ্ত দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে প্রকৃত পথের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। এই সময়ে রচিত কবিতাগুলির নামেই তাহাদের বিষয়বস্তু ও কবির মানসিক ভাবের পরিচয় প্রকটিত হইয়াছে। 'তারকার আত্মহত্যা' (সন্ধ্যা-সংগীত : ১৮৮২), 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়', 'মহাস্বপ্ন' (প্রভাতসংগীত : ১৮৮৩), 'নিশীথ-চেতনা' (ছবি ও গান : ১৮৮৪), 'বন্দী', 'কেন', 'মোহ', 'অক্ষমতা' (কড়ি ও কোমল : ১৮৮৬) 'প্রকাশ-বেদনা', 'মায়া', 'মেঘের খেলা', 'উচ্ছৃঙ্খল', 'আগন্তুক' (মানসী : ১৮৯০)—এই নামগুলিই কবির তদানীন্তন মানসিক নৈরাশ্য ও বিকারের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। ইহার পর অবশ্য কবির 'হৃদয় অরণ্য হইতে নিষ্ক্রমণ' ঘটিয়াছে

এই বিষাদের মূল আরো গভীরে। অনির্দেশ্য সৌন্দর্যলোকের উদ্দেশে কবিমনের অভিসার রোমান্টিক কবি-ভাবনার অন্যতম লক্ষণ। বাস্তব-বিড়ম্বিত ব্যর্থ জীবনের করুণ অসহায়তা, আদর্শলোকের প্রতি পক্ষবিস্তারের ক্লান্ত, ক্ষণস্থায়ী প্রচেষ্টা, এবং বর্তমানের কুশ্রী দীনতা ও প্রত্যক্ষ রূঢ়তা হইতে মুক্তি লাভ ও মানস জগতে আত্মনিমজ্জন : এই সমস্ত লক্ষণই নির্ভুলভাবে সেদিনের বাংলা গীতিকবিতায় ধরা পড়িয়াছে। রোমান্টিক গীতিকবিতা যে মানব হৃদয়ের সনাতন সৌন্দর্যবোধ, রহস্যানুভূতি ও বিস্ময়-প্রবণতার উপর প্রতিষ্ঠিত,

তাহার প্রমাণ সেদিনের বাংলা গীতিকবিতায় পাওয়া যায়। বিহারীলালেই এই রোমান্টিক চরিত্র সর্বপ্রথম নিঃসংশয়িত পদক্ষেপে আপন আবির্ভাব ঘোষণা করিল। যে আদর্শ সৌন্দর্যের (Ideal Beauty) জন্য বিহারীলালের হাহাকার, তাহাই পরে রবীন্দ্রনাথে আসিয়া শতসহস্র গীতিধারায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। বিহারীলাল ও তাঁহার অনুবর্তীরা—অক্ষয় বড়াল, নিত্যকৃষ্ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—এই সৌন্দর্যসাধনার ক্ষেত্রে ইংরাজ রোমান্টিক কবিদের প্রতিস্পর্ধী হইয়া উঠিয়াছেন।

এখানেই এই পর্বের কাব্যসাধনার ক্ষান্তি ঘটে নাই। রোমান্টিক কবি-ভাবনা শেষ পর্যন্ত মিস্টিক কবি-ভাবনায় পরিণত হইয়াছে। বিহারীলাল, অক্ষয়কুমার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্য জগতের বার্তা বহন করিয়া আনিলেন। অনির্দেশ্য সৌন্দর্যলোকের প্রতি স্বপ্নাভিসার শেষ পর্যন্ত সমগ্র জীবন ও নিখিল বিশ্বের মর্মকোষে অবস্থিত ভাবসৌন্দর্য-উৎস-সন্ধানের যাত্রায় পরিণত হইয়াছে। 'সারদামঙ্গলে'র অশান্ত রোমান্টিক কবি 'সাধের আসনের' মিস্টিক তন্ময়তায় বিভোর হইয়াছেন।

হেমচন্দ্রের কবিতায় যুক্তিপ্রধান কবি-ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। কল্যাণ ও মঙ্গলের আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া সমগ্র বিশ্বের ক্রম-বিবর্তনঘটিবে এবং অকল্যাণের পরাজয় ঘটিবে—এই ধরণের একটি কল্পনাজাত বিশ্বাস কবির ছিল—এই বিশ্বাস হইতেই উপরোক্ত কবি-ভাবনার জন্ম। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে এই দার্শনিক কবিদৃষ্টিরই পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার স্বপ্নাভিসার আসলে দর্শন-মিশ্রিত কল্পনা-জগতে কবি-মানসের স্বচ্ছন্দ বিহার। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার আর এক জন দার্শনিক কবি। বিশ্বের নারীজাতিকে তিনি প্রেমের কল্যাণী মূর্তিতে দেখিয়াছেন এবং জাগতিক সকল বস্তুর নিয়ামক রূপে এক অদৃশ্য শক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন ('মহিলা কাব্য')। নবীনচন্দ্র তাঁহার নব মহাভারতের স্বপ্নে বিভোর হইয়া ধর্মীয় কবি-ভাবনার পরিচয় দিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রকৃতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন। কীটস্-এর মতো দেবেন্দ্রনাথ এই ধরণী-মৃত্তিকার রস সম্ভোগ করিতে চাহিয়াছেন এবং মর্ত্য-সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ উপভোগ কামনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথে আসিয়া এই রোমান্টিক ও দার্শনিক কবি-ভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তিনি শেলী-র ন্যায় বিশ্বের অনুপরমাণুতে ঐশী লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আবার কীটস্-এর ন্যায় সৌন্দর্য-উপাসনার আদর্শে আপন কবিমনের সুর বাঁধিয়া লইয়াছেন।

. বাংলা গীতিকবিতার প্রথম যুগে রোমান্টিক বিষাদ ও মিস্টিক দর্শন-প্রবণতাই শেষ কথা নহে। ভাবাতিরেকের উন্মত্ততাও লক্ষ্য করা যায়। বাংলা রোমান্টিসিজমের আদি কবি বিহারীলাল ও তাঁহার অনুবর্তীদের কাব্যে এই অতিরেক ও উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়।

আত্মতন্ময়তা ও ভাব-নিমগ্নতাই বিহারীলালের কবিপ্রকৃতির প্রধান লক্ষণ। কিন্তু ভাবাবেগের সংযম নহে, ভাবাতিরেক 'সারদামঙ্গলে' লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যে প্রথম সর্গটিতে সারদার ব্যক্তিক-নৈর্ব্যক্তিক রূপ চমৎকার সংযম ও সাংকেতিকতার সহিত অংকিত হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তী সর্গগুলিতে সারদার সহিত কবির বিরহ মিলনের উচ্ছ্বাসবহুল অতিপল্লবিত বর্ণনাই প্রধান। একথা অনস্বীকার্য যে, সারদার চিত্রণে প্রথম সর্গই যথেষ্ট এবং প্রকৃত কাব্যবিচারে প্রথম সর্গেই কাব্যের সমাপ্তি। পরবর্তী সর্গগুলিতে ভাবের অতিবিস্তার ঘটিয়াছে।

বিহারীলালের মন্ত্রশিষ্য অক্ষয় বড়ালের কাব্যেও এই লক্ষণ দেখা যায়। অক্ষয়কুমারের 'প্রদীপ' (১৮৮৪), 'কনকাঞ্জলি' (১৮৮৫), 'ভুল' (১৮৮৭) কাব্যে বাস্তবাতিরিক্ত কল্পনার উল্লাসই বেশী। পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথের প্রাক্-'মানসী' পর্বের কাব্যগুলিতেও এই ভাবপ্লাবন লক্ষ্য করা যায়। আসল কথা বাংলা কাব্যে রোমান্টিসিজমের উন্মেষকালে এই কল্পনার উচ্ছ্বাস, ভাবাতিরেক ও প্লাবন প্রথম বন্যার ফল মাত্র। স্বভাবতই কল্পনাপ্রবণ বাঙালি কবির রচনায় এই অতিরেক ও উচ্ছ্বাস সে যুগে উচ্ছৃঙ্খল ভাব-বিপ্লবে পর্যবসিত হয় নাই বলিয়াই ইহা ক্ষমার্হ।

আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার প্রথম পর্বেই রোমান্টিক কবি-ভাবনার এই উঁচু স্বর শোনা যায়। আদর্শ সৌন্দর্যের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর গীতি-কবিদের বেদনা ও আকুলতা তাঁহাদের কবিক্ষমতার নিঃসংশয়িত পরিচয় ঘোষণা করে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, ইংরেজি রোমান্টিক পর্বের (১৭৯৮-১৮৩২) কাব্যসাধনার যে একটি সুনিশ্চিত প্রস্তুতি-অধ্যায় পূর্ববর্তী ক্লাসিক পর্বে (১৭০০-১৭৯৮) লক্ষ্য করা যায়, সেরূপ কোন প্রস্তুতি বাংলা গীতিকবিতার ক্ষেত্রে ছিল না। আকস্মিক ভাবেই বাংলা কাব্যে জোয়ার আসিয়াছিল এবং এই জোয়ারে সকল প্রাক্তন কাব্যসংস্কার ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছিল। বিহারীলালের পূর্বে এমন কোনো স্বল্পখ্যাত কবি পাই না, যিনি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্রের ক্লাসিক কাব্যের রুদ্ধ কক্ষ হইতে মুক্তি পাইয়া বিহারীলালের কবিতায় একটি পূর্ণ তৃপ্তির উল্লাস, একটি বন্ধনহীন মুক্তির অবকাশ বাঙ্গালি পাঠকসমাজ স্বতন্ত্রভাবে লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্রের কাব্য এবং বিহারীলালের কাব্য প্রায় যুগপৎ প্রকাশিত হইয়াছে। আসল কথা, ক্লাসিক পর্বের আড়ম্বর বাঙালি পাঠকের শ্বাসরোধ করিয়া ফেলে নাই। কারণ এই ক্লাসিক পর্বটির মধ্যে বিশুদ্ধির অভাব আছে। ক্লাসিক কাব্যধারার মধ্যেও রোমান্সধর্মের গভীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে—মধুসূদনের কাব্যে বীররসকে ছাপাইয়া করুণরসের জোয়ার ছুটিয়াছে। ক্লাসিক রীতির নিরাভরণ ওজস্বিতার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার উচ্ছ্বাস,

সৌন্দর্যপ্রীতি ও ধ্বনিবহুলতা রোমান্স প্রবণতার নিদর্শন রূপে আবির্ভূত হইয়াছে। এই মিশ্র শিল্পবোধই ক্লাসিক রীতির ক্ষণস্থায়িত্বের কারণ নির্দেশ করিয়াছে। তাহাছাড়া সে যুগে দীর্ঘ আখ্যায়িকা-কাব্য রচনা প্রচলিত সাহিত্য-প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই যুগে যে কবি মহাকাব্য বা আখ্যায়িকাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তিনিও রোমান্টিক কবিকল্পনাকে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা একাধারে ক্লাসিক কাব্যাদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন, আবার ক্ষুদ্র খণ্ড গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন এবং এই গীতিপ্রাণতা ইঁহাদের ক্লাসিক কাব্যরচনার উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়া ইহার নীরক্তার মধ্যে বহিঃপ্রকৃতির মুক্ত বাতাসের প্রবেশ সুগম করিয়া দিয়াছে। আরো স্পষ্ট করিয়া বলা যায় যে, এ যুগের কবিরা সজ্ঞানে সচেতনভাবে ক্লাসিক কাব্যের মধ্যে গীতিকবিতার দক্ষিণ পবনকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র একাধারে ক্লাসিক ও রোমান্টিক কবি। ইঁহাদের অসংখ্য গীতিকবিতা আছে। উপরন্তু ইঁহাদের ক্লাসিক কাব্যের অভ্যন্তরে গীতিকবিতা দেখা দিয়াছে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে বিহারীলাল তাঁহার নিজস্ব সুরটিকে ধরিতে পারিয়াছেন। বস্তুতঃ তৎপূর্বেই গীতিকবিতা দেখা গিয়াছে মুখ্যতঃ যাঁহারা ক্লাসিক কবি, তাঁহাদের কাব্যাবলীতে।

গীতিকবিতার বিলম্বিত আবির্ভাব

প্রাচীন কাব্যধারার শেষ কবি ও আধুনিক কাব্যধারার নকীব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্য' প্রকাশিত হয় ১৮৫৮তে—এই কাব্যে রোমান্সরসের উদ্বোধন হয়। মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ' (১৮৬১) ও'বঙ্গভূমির প্রতি' (১৮৬১) কবিতাদ্বয়ে ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে (১৮৬৬) প্রথমে অন্তর্মুখীন সুর শোনা গেল। রোমান্টিক বিষাদের সূত্রপাতও এইখানে। বিহারীলালের 'সঙ্গীতশতকে' (১৮৬২) তাঁহার নিজস্ব সুরের আভাস পাওয়া গেল; 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যেই (১৮৭০) তিনি নিজস্ব সুরটি ধরিতে পারিলেন। কবির আত্মভাবের উদ্বোধন হইল। এই 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্য প্রকাশের পূর্বেই বলদেব পালিত, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের কবিতা গীতিকবিতার মানদণ্ডে সাফল্য লাভ করে নাই। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই বৎসরে প্রকাশিত কাব্যতালিকা হইতেছে:

বিহারীলাল চক্রবর্তী—বন্ধুবিয়োগ, প্রেমপ্রবাহিণী, নিসর্গসন্দর্শন ও বঙ্গসুন্দরী

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কবিতাবলী (প্রথম খণ্ড)

গোবিন্দচন্দ্র দাস—প্রসূন
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—কাব্যকলাপ
বলদেব পালিত—কাব্যমালা, ললিত কবিতাবলী।

সুতরাং একথা বলিতে পারি, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রোমান্সরস উদ্বোধনের মধ্য দিয়া যাহার সূচনা হইয়াছিল, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার একান্ত অন্তর্মুখী ভাবনামূলক প্রকাশের মধ্য দিয়া রোমান্টিক গীতিকবিতা বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলা সাহিত্যের রাজদণ্ড নবীনচন্দ্রের হাত হইতে তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের হাতে আসিয়াছে। 'নৈবেদ্য' কাব্যে (১৯০১) সেদিনের মুক্তিপিয়াসী নির্ভীক তরুণ বাঙালির পরিচয় লিখিত আছে। কিন্তু তাহার আগেই রবীন্দ্রনাথের নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ১৮৯০ সালে 'মানসী' কাব্যের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব সুরটিকে খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। এখানেই তাঁহার নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল—এই নেতৃত্ব পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দীকাল অবিচল ছিল। সুতরাং এই পর্বে আসিয়া বাংলা কাব্য আবার মোড় ফিরিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু (১৮৯৪) ও 'মানসী' কাব্যের প্রকাশ (১৮৯০)—এইখানে আসিয়া একটি পর্বের সমাপ্তি ধরা যাইতে পারে। কাব্য-জগৎ ও উপন্যাস-জগতের দুই নায়ক নবীনচন্দ্র সেন ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদায় গ্রহণ করিলেন। সূর্যের ন্যায় প্রতাপ ও ইন্দ্রের ন্যায় বৈভব লইয়া কাব্য ও উপন্যাস উভয় জগতের নায়কত্ব আপন প্রতিভাবলে অধিকার করিয়া এবং সহস্র রশ্মি বিকিরণ করিয়া বাংলা সাহিত্যসংসারে রবীন্দ্রনাথ দেখা দিলেন: সাহিত্যে 'রবীন্দ্রযুগ' সুরু হইল। বর্তমান গ্রন্থে আমরা রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার নিজস্ব কবিপ্রতিভার ক্রমানুসরণের পথে দেখাইতে চাহি না। উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ও তৎকালীন কাব্যপরিমণ্ডলের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করার ইচ্ছা আমাদের আছে। বর্তমান গ্রন্থে ১৮৬১ হইতে ১৯১০—এই পঞ্চাশ বৎসরের বাংলা গীতিকাব্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছি।

বর্তমান গ্রন্থে আমরা সতর্কভাবে দুই শ্রেণীর কাব্য পরিহার করিয়াছি: মহাকাব্য (epic-poetry) ও দীর্ঘ আখ্যায়িকা-কাব্য (verse-tales)। রঙ্গলাল-মধু-হেম-নবীনের ও তদনুসারী কবিদের প্রধান কীর্তিগুলি বাদ দিয়াছি, অবশ্য তাঁহাদের মহাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত লিরিকাংশ ও স্বতন্ত্র গীতিকবিতা গ্রহণ করিয়াছি। আর দীর্ঘ আখ্যায়িকা-কাব্য (যাহা সেকালের প্রচলিত সাহিত্যিক প্রথা বা 'ফ্যাশন্' ছিল) বর্জনের ফলে অক্ষয় চৌধুরী, স্বর্ণকুমারী দেবী, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামদাস সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, অধরলাল সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,

আনন্দচন্দ্র মিত্র, নবীনচন্দ্র দাস, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির প্রধান কীর্তিগুলি বাদ গিয়াছে।

আলোচনার সুবিধার্থ আমরা রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পঁচাত্তর জন গীতিকবির পাঁচশত গীতিকবিতার একটি তালিকা প্রণয়ণ করিয়াছি। নীচে কবিদের নাম দেওয়া গেল:

(১) অক্ষয় চৌধুরী (১৮৫০—১৮৯৮)
(২) অক্ষয় বড়াল (১৮৬৫—১৯১৮)
(৩) (রাজকুমারী) অনঙ্গমোহিনীদেবী
(৪) অন্নদাসুন্দরী ঘোষ
(৫) অন্নদাসুন্দরী দাসী
(৬) অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)
(৭) আনন্দচন্দ্র মিত্র (১৮৫৪-১৯০৩)
(৮) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)
(৯) ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোঃ (১৮৫৬-১৮৯৭)
(১০) (মুন্সী) কায়কোবাদ (১৮৬৩-)
(১১) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১—১৯০৭)
(১২) কামিনীকুমার ভট্টাচার্য
(১৩) কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)
(১৪) কুঞ্জলাল রায়
(১৫) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৭-১৯০৬)
(১৬) কুসুমকুমারী দাশ (১৮৮২-১৯৪৮)
(১৭) গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)
(১৮) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪)
(১৯) গোপালকৃষ্ণ ঘোষ
(২০) গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮)
(২১) গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৮-১৯১৭)
(২২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)
(২৩) দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৯৮)
(২৪) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)
(২৫) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬০-১৯১৩)
(২৬) দীনেশচরণ বসু (১৮৫১-১৮৯৮)
(২৭) দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০)
(২৮) নবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর (১৮৫৩-১৯১৪)
(২৯) নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯২২)
(৩০) নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)
(৩১) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী (১৮৭৮-১৯০৬)
(৩২) নিত্যকৃষ্ণ বসু (১৮৬৫-১৯০০)
(৩৩) নিস্তারিণী দেবী
(৩৪) পঙ্কজিনী বসু (১৮৮৩-১৯০০)
(৩৫) প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯)
(৩৬) প্রমীলানাগ (বসু) (১৮৭১-১৮৯৬)
(৩৭) প্রভাবতী রায়
(৩৮) প্রিয়নাথ মিত্র
(৩৯) প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫)
(৪০) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোঃ (১৮৩৮-১৮৯৪)
(৪১) বরদাচরণ মিত্র
(৪২) বলদেব পালিত (১৮৩৫-১৯০০)
(৪৩) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯)
(৪৪) বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২)
(৪৫) বিরাজমোহিনী দাসী
(৪৬) বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)
(৪৭) বিনয়কুমারী ধর (১৮৭২-)
(৪৮) মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)
(৪৯) মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২)
(৫০) মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩)
(৫১) মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়
(৫২) মৃণালিনী সেন (১৮৭৯-)
(৫৩) যোগেন্দ্রনাথ সেন

(৫৪) যোগীন্দ্রনাথ বসু
(৫৫) রঙ্গলাল বন্দ্যো: (১৮২৭-১৮৮৭)
(৫৬) রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)
(৫৭) রমণীমোহন ঘোষ
(৫৮) রাজকৃষ্ণ মুখো: (১৮৪৫-১৮৮৬)
(৫৯) রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪)
(৬০) লজ্জাবতী বসু (১৮৭৪-১৯৪২)
(৬১) (কাঙাল) হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬)
(৬২) হরিশ্চন্দ্র মিত্র (-১৮৭২)
(৬৩) হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী (১৮৫৪-১৯৩০)
(৬৪) হেমচন্দ্র বন্দ্যো: (১৮৩৮-১৯০৩)
(৬৫) হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৭০-১৯২৫)
(৬৬) শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)
(৬৭) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩)
(৬৮) সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬)
(৬৯) স্বর্ণলতা বসু
(৭০) স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭-১৯৩২)
(৭১) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯২৯)
(৭২) সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮)
(৭৩) সুরমাসুন্দরী ঘোষ (১৮৭৪-১৯৪৩)
(৭৪) সরলাবালা সরকার (১৮৭৫-)
(৭৫) সরলাদেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫)

আমরা যে পাঁচশত কবিতা চয়ন করিয়াছি, তাহার সবই প্রথম শ্রেণীর কবিতা নহে। এই তালিকায় দ্বিতীয় শ্রেণীর গীতিকবিতারই সংখ্যাধিক্য হইয়াছে। ইহা দুঃখের হইলেও সত্য যে, প্রথম শ্রেণীর গীতি-কবিতা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে খুব কমই লেখা হইয়াছে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। আলোচ্য তালিকায় আমরা গান ও গীতিকবিতার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, তাহা সর্বত্র রক্ষা করি নাই; কারণ বাংলা গান যেরূপ কথার উপর নির্ভরশীল, তাহাতে গানকে বাদ দিলে গীতিকবিতা আলোচনায় অঙ্গহানি ঘটিবার গুরুতর আশংকা আছে। বিশেষতঃ দেশপ্রেমের কবিতায় এই আশংকা সর্বাধিক। গান ও গীতিকবিতার মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে, গানে কবি তাঁহার ভাবকে যথাসম্ভব লঘু তুলির টানে, কল্পনাপ্রয়োগকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া ও সুরের অন্তরঙ্গ সহযোগিতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রকাশ করেন। গীতিকবিতায় কল্পনার ঐশ্বর্য, বহুচারিতা ও অনুভূতির নিবিড়তা ধ্বনিসমৃদ্ধ ছন্দোপ্রবাহের মাধ্যমে রূপলাভ করে। অবশ্য কোন্ কবিতাটি লিরিকপর্যায়ে আসে এবং কোন্টি আসে না, সে সম্পর্কে মতভেদ চিরকালই থাকিয়া যাইবে। এই আশংকাতে প্যালগ্রেভ্ তাঁহার 'The Golden Treasury' সংকলনে যে মধ্যপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই অনুসরণ করিয়াছি।

আলোচ্যমান গীতিকবিতার বিষয়ানুক্রমিক ছয়টি ভাগ করিয়াছি এবং পরবর্তী ছয়টি অধ্যায়ে এইভাবে কবিতার বিস্তারিত আলোচনা করিব। ছয়টি শ্রেণী বিভাগ হইতেছে:

(১) প্রেম-কবিতা
(২) দেশপ্রেমের কবিতা

(৩) গার্হস্থ্য জীবনের কবিতা
(৪) প্রকৃতি-কবিতা
(৫) বিষাদ-কবিতা
(৬) তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা

নবম অধ্যায়ে উনবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিব। রবীন্দ্র-প্রতিভা যে অমূল তরু নহে, তাহা যে সেদিনের সাহিত্যিক আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই এই অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

আধুনিক গীতিকবিতার প্রকৃতি

আধুনিক গীতিকবিতার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এই অধ্যায়ের ছেদ টানিব।

আধুনিক গীতিকবিতার সংজ্ঞা কি? ড্রিংক্‌ওয়াটার বলিয়াছেন: 'The characteristic of the lyric is that it is the product of the pure poetic energy unassociated with other energies'. ("The Lyric", pp. 86)। লিরিকের এই বিশুদ্ধ রূপটি একান্তভাবে আধুনিক কালের সৃষ্টি। প্রাচীন কবিরা কেবল কবি নহেন, তাঁহারা কোনো বিশেষ ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন; আজিকার গীতিকবি কোনো মতেরই দাস নহেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত তুলনায় আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার স্বরূপটি ঠিক বুঝা যাইতে পারে।

একটি ধর্মবিশ্বাসে ভাবিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত অনুরাগী দীন সেবক পদকর্তা শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও মহাপ্রভুর উপাসনায় পুষ্পোপচার হিসাবে পদাবলী রচনা ও কীর্তন করেন। তাই তিনি 'মহাজন'। সেখানে কবিমন হইতেছে অধ্যাত্ম-অনুভূতি-শাসিত মন। বহির্বিশ্বের সমস্ত বিক্ষোভ হইতে মনকে সরাইয়া নিয়া ও সকল সন্দেহ ও অবিশ্বাসের নিরসন ঘটাইয়া বৈষ্ণব তদ্গতচিত্তে উপাসনা করেন; পদাবলী সেই উপাসনারই উপচার। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ: যাঁহাদের দর্শনে ও কাব্যরসে প্রকৃতই অধিকার ছিল, তাঁহারা পর্যন্ত এক প্রবল ধর্মাভিভবের নিকট নিজেদের সকল পরুষ পাণ্ডিত্যাভিমানের অবসান ঘটাইয়া কাব্যরচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। বৈষ্ণবপদাবলীর সর্বত্রই একটি অতন্দ্র অধ্যাত্ম-শাসিত কবিমনের পরিচয় পাই। তাহার নিজের ব্যক্তিমনের আকৃতি এই ধর্মভাবনার সহিত এরূপভাবে এক হইয়া গিয়াছে যে উহার আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। লিরিক সেখানে মুক্তি লাভ করে নাই। বহির্বিশ্ব সেখানে গৌণভাবে উপস্থিত, আন্তররাজ্য (যাহা মূলতঃ ধর্মশাসিত) সেখানে প্রায় একক স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু আধুনিক গীতিকবিতার এখানেই মুক্তি। কোনরূপ বিধিনিষেধের জোরে সে বাঁধা পড়ে না। আধুনিক কবির মন মুক্ত মন। কোনো ধর্মানুশাসন বা সংস্কার কবিমনকে নিয়ন্ত্রিত করে না। বহির্বিশ্বের সকল আঘাত-অভিঘাত কবির মনোসমুদ্রের তটে আছড়াইয়া পড়িতেছে। সেই তরঙ্গাভিঘাতকে আজ আর কোনো অধ্যাত্ম-শাসন নিষেধ করে না, বরং কবিমন সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করে। আধুনিক গীতিকবিতায় বহির্জগৎ ও কবির অন্তরলোকের মধ্যে একটি সুন্দর সংযোগ ও সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে। একটি মাত্র ভাবের অসপত্ন আধিপত্য শিথিল হইয়া উহার স্বাধীন সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটিয়াছে। উহা চারিদিকে নিজেকে ছড়াইয়া বহির্জগৎকে নিজ ভাবকেন্দ্রে আকর্ষণ করিয়াছে। ফলে বাহিরের প্রকৃতি, মানুষ, যুগ, ঘটনা—সকলেই তাহাদের বাণী কবি মনে পাঠাইতেছে। এই আন্তর-অভিঘাতের প্রতিক্রিয়ায়, ভাবের ঘনীভূত আবর্তনে ও গীতিরস-নির্যাসের অজস্রতায় আধুনিক গীতিকবিতা সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। এখানে আর শাসন চাপাইয়া দেওয়া হয় না। তাই আধুনিক লিরিক সম্পূর্ণ নব সৃষ্টি। প্রাচীন গীতিকবিতায় এই বন্ধন-মুক্তি ও উদারতা ছিল না। প্রাচীন গীতিকবিতা বিষয় বা ভাবকেন্দ্রিক, আধুনিক গীতিকবিতা কবিকেন্দ্রিক। আত্মনিরীক্ষণ ও আত্মপ্রকাশই আধুনিক গীতিকবিতার মর্মকথা।

গীতিকবিতাকে কোন মানদণ্ডে বিচার করিব? ভাবাবেগের অনুশীলন ও প্রকাশের অনবদ্যতা বিধান, এই উভয়ই উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কোমল, ভাবরসসিক্ত, অনুভূতির গভীরতায় অবতরণশীল মন এবং এই ভাবতন্ময়তা প্রকাশের উপযোগী অমৃতনিঃস্যন্দী, সৌন্দর্য-পরিমণ্ডল-রচনানিপুণ ভাষা—এই উভয়ের সংযোগ না ঘটিলে শ্রেষ্ঠ-গীতিকবিতার উদ্ভব হয় না। গীতিকবিতা চরম সার্থকতা লাভ করে কখন? যখন কবিকল্পনা উত্তেজিত, তখন কার্যকারণ শৃঙ্খলাকে অতিক্রম করিয়া একটি নিগূঢ়তর ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়, উদ্বেলিত কবিকল্পনা পাঠকমনকে এক নূতন অপ্রত্যাশিত স্তরে পৌছাইয়া দেয়। ইহাকেই বলে: 'লোকোত্তর-চমৎকারিত্ব'। গীতিকবিতা ভাষার উপরও নির্ভরশীল। ভাষার নমনীয়তা, পরিপাটিত্ব, সংযম, স্নিগ্ধতা ও ব্যঞ্জনায় ধরা পড়ে কবির ভাবোচ্ছ্বাস কতটা আন্তরিক। গীতিকবিতার ভাষা ইহার আন্তরিকতার মানদণ্ড। তাই আধুনিক লিরিকে ভাবের আবেগ ও ভাষার প্রসাধন এবং এতদুভয়ের সুপরিণয় একান্ত আবশ্যকীয়। এখানে কবির ব্যক্তিচিত্তের পূর্ণতম প্রকাশ ঘটে। আত্মভাবনা ও আপন মনোবেদনা-উল্লাস প্রকাশই কবির একমাত্র লক্ষ্য। আধুনিক গীতিকবিতা তাই অপর কাহারো বা অন্য বিষয়ের কথা নহে, কবির একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির বহিপ্রর্কাশ মাত্র।

আধুনিক লিরিক বা গীতিকবিতা দুই প্রকারের: আত্মগত ও বিষয়গত।

কবির বিশুদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাস হইতে আত্মগত গীতিকবিতার জন্ম হয়। বাহিরের বিষয় কবিচিত্তে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হইলে বিষয়গত গীতিকবিতার জন্ম হয়।

সার্থক গীতিকবিতার কয়েকটি উদাহরণ লইয়া আলোচনা করিলে বিষয়টি স্পষ্টতর হইবে।

নদী ও ঝড় লইয়া যে কবিতা রচিত হয়, তাহাতে একটি উত্তাল বিক্ষুব্ধ প্রকৃতি-চিত্র থাকে। যিনি সার্থক গীতিকবি, তিনি এখানেই থামেন না। তিনি একটি অপরিচিত নূতন ভাবাবেগের স্তরে আমাদের উত্তীর্ণ করিয়া দেন; আমরা সেই স্তরে উত্তীর্ণ হইয়া বিষয়বস্তুর ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ রূপটি দেখিতে পাই। ইহার সার্থক উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতা ও শেলীর 'Ode to the West Wind' কবিতা। 'বর্ষশেষ' কবিতায় শেষ চৈত্রের ভয়াল ঝটিকার তাণ্ডব রূপটি কবি চমৎকার ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই ঝটিকা যে কেবল পুরাতন বৎসরের জীর্ণ গ্লানি ও আবর্জনা দূর করিয়া দিতেছে তাহা নয়, ইহা সংকীর্ণতা হইতে বৃহত্তর পথে আমাদের উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে।

আবার কীট্‌সের 'Ode to a Nightingale' কবিতায়

'Magic casements opening on the foam,
Of perilous seas in fairy lands forlorn'

প্রভৃতি ছত্রে সমুদ্রের অপরিমেয় রহস্য ও অপার বিস্ময় প্রকাশ পাইয়াছে। সাধারণ সমুদ্র-বর্ণনামূলক কবিতায় এই রহস্য ও জাদু ধরা পড়ে না। কবি কালিদাসের 'রঘুবংশম্' কাব্যে সমুদ্রের যে বর্ণনা আছে—

'দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী
তমালতালী বনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্ধারানিবদ্ধেব কলংকরেখা॥'

ইহাতে কীটস্-বর্ণিত ঐ রহস্য ও বিস্ময় নাই। তাই কালিদাসের এই বর্ণনা আধুনিক শ্রেষ্ঠ লিরিকের পর্যায়ভুক্ত হইয়া উঠে নাই। বিহারীলালের সমুদ্র বর্ণনাও তাহাই।

মিল্টনের 'On His Blindness' কবিতাটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিভু, কি দশা হবে আমার?' কবিতাটির সহিত তুলনীয়। হেমচন্দ্র শেষ-জীবনে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, মিলটনও তাহাই। কিন্তু এই অন্ধত্বের তথ্যসঞ্চয়ন ও দৃষ্টিশক্তির লোপের জন্য দুঃখ প্রকাশেই সার্থক গীতিকবিতা সৃষ্ট হয় না। হেমচন্দ্রের কবিতায় তত্ত্বগত আলোচনা ছাড়াইয়া সার্বভৌম ব্যঞ্জনা দেখা দেয় নাই। ব্যক্তিগত দুঃখ ও আন্তরিকতার অভাব এখানে নাই। কিন্তু সে অনুভূতির সাধারণীকরণ ও কল্পনাসমৃদ্ধি ঘটে নাই, ফলে আবেদন সর্বজনীন হয় নাই; এখানে মর্মভেদী তীক্ষ্ণতা ও আবেগের

তীব্রতা নাই; আছে মৃদু আক্ষেপ। কিন্তু মিল্‌টনের কবিতায় তথ্য প্রধান হইয়া উঠে নাই। তথ্যের সারনির্যাস করা হইয়াছে। আপন দুর্ভাগ্যকে মঙ্গলময় ঈশ্বরের অমোঘ বিধান বলিয়া অন্ধ কবি স্বীকার করিয়াছেন এবং সকল বিক্ষোভের শান্তি ঘটাইয়া ঈশ্বরের চরণে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছেন। ফলে একটি নির্বেদ ও প্রশান্তি, গাম্ভীর্য ও একান্ত নির্ভরতার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। এই সুর ব্যক্তিগত ক্ষোভকে অতিক্রম করিয়া সহৃদয় পাঠকমনে স্থায়ী রসসঞ্চার করিয়াছে।

ওয়ার্ডস্‌ওয়র্থ বিষয়গত গীতিকবিতাই বেশি লিখিয়াছেন। বাহিরের বিষয়বস্তুকে কবিচিত্তে আত্মসাৎ করিয়া 'আপন মনের মাধুরী' মিশ্রিত করিয়া কবি সর্বজনীন আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন: সূর্যকরোজ্জ্বল অরণ্য ও বসন্ত-প্রভাত হইতে আমরা ঢের বেশি শিক্ষালাভ করিতে পারি, যাহা সহস্র নীতিপুস্তক দিতে পারেনা:

> 'One impulse from a vernal wood
> May teach you more of man,
> Of moral evil and of good
> Than all the sages can.'

এই 'Tables Turned' কবিতার পিছনে একটি প্রচণ্ড আবেগ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। তথ্য ও আবিষ্কৃত অধ্যাত্ম-সত্য—এই উভয়ের মধ্যবর্তী ব্যবধানের উপর সেতু যোজনা করিয়াছে কবির গভীর আত্মসংবৃত আবেগ।

আরেক শ্রেণীর লিরিক আছে—তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা। বায়রনের বহু কবিতা, রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য', রজনীকান্ত সেন, মানকুমারী বসু, নবীনচন্দ্র সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ কবিদের অনেক কবিতাই এই শ্রেণীতে পড়ে। প্রক্ষেপণ (reflection) কবিমনের স্বধর্ম, ইহাকে বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু এই তত্ত্বচিন্তাশ্রয়ী কবিতা বিভিন্ন কবির কাছে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। তত্ত্বযুক্তি তথ্য থাকুক, তাহাতে আপত্তি নাই; বিচার্য এই: উপাদানসমূহ হইতে নবতর সৌন্দর্য উদ্ভূত হইল কিনা। কবির কাছে সুশৃঙ্খল যুক্তিধারা আশা করা বেশি হইতে পারে। কিন্তু বিশ্ববিধানের অন্তর্গত সূক্ষ্ম ঐক্য কবিচিত্তে ধরা পড়িবেই ও সে সূত্র কবি আমাদের নিকট উপস্থিত করেন। কিন্তু সর্বোপরি এই তত্ত্বচিন্তার মধ্যে এমন একটি মনোজ্ঞ সৌকুমার্য, এমন একটি সৌন্দর্যানুভব থাকে, যাহাতে ইহা কেবল দার্শনিক যুক্তিশৃঙ্খলাকে অতিক্রম করিয়া কাব্যানুভূতির নিগূঢ়তা লাভ করে।

সার্থক গীতিকবিতার এই মানদণ্ডে আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতার বিচার করিব।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রেমকবিতা

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বোধ করি প্রেমকবিতাই বেশী স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভগবৎ-প্রেম ও প্রকৃতি-প্রেমকে নরনারীর জাগতিক প্রেম ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই জাগতিক প্রেমের গানেই শতেক যুগের কবিদল আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন। সুবিপুল প্রেমকাব্যই ইহার প্রমাণ।

নরনারীর চিরন্তন আকর্ষণ-বিকর্ষণ প্রতি-আকর্ষণকে কেন্দ্র করিয়া রচিত প্রেমকবিতা যুগে যুগে নব নব রূপে দেখা দিয়াছে। আধুনিক যুগে প্রেমকবিতা নিত্য নূতন রূপে আপন মহিমায় প্রকাশ লাভ করিতেছে। বাংলা কাব্যেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রাচীন বাংলা কাব্যের প্রেম-কবিতা ও আধুনিক প্রেমকবিতা : এতদুভয়ের আবেদন ও রূপকর্মের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক কালে প্রেমকবিতা কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছে? প্রেমের অগ্রগতি আজ ভাব নিবিড়তা হইতে পরিধি বিস্তারের পথ ধরিয়া চলিয়াছে। আজ আর 'যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল' এই বলিয়াই কবিরা সন্তুষ্ট হইতেছেন না। আধুনিক মন আর প্রেমের সহজ, সরল, মর্মস্পর্শী অনাড়ম্বর আবেদনে সাড়া দিতে চাহে না। ইহার রহস্যময় অনুভূতিকে নানা জটিল ভাবগ্রন্থির মধ্য দিয়া, নানা দুষ্প্রবেশ্য বনবীথির স্বপ্নালোকিত অবসর পথে, জীবনের দুশ্ছেদ্য প্রশ্নসংকুলতার আবরণজালের অন্তরালে অনুসরণ করাতেই ইহা তৃপ্তি লাভ করে। প্রেমের এই ভাবপ্রবাহ যুগ-পরিবর্তনের চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া মহাসমুদ্রসঙ্গমে চলিয়াছে। ইহার বাঁকে বাঁকে কত নবীন সৃষ্টির সৌন্দর্য, কত নব প্রস্ফুটিত ফুলের সুরভিত বিকাশ, হৃদয়-চাঞ্চল্যের কত নূতন স্পন্দন, আত্মানুভূতির কত অনাস্বাদিত-পুর্ব গভীরতা। প্রেম কবিতার ক্ষুদ্র শিশির-বিন্দুতে মানব-হৃদয়ের অপরিমেয় রহস্য প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রেম-কবিতা রচনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। এই দুই কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমের প্রতিটি স্তর নিপুণ তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন ও প্রেমের আর্তি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের রাধার ব্যাকুলতায় উদ্ভিন্নযৌবনা নবানুরাগবতী তরুণী

চিত্তের সমস্ত অনুরাগ ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে,
আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে!

কিন্তু তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া সখীদের ডাকিয়া কহিলেন,

সই কি আর বলিব তোরে,
বহু পুণ্য ফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে!

সুখ-দুঃখের ধূপছায়া-জালে প্রেমিকার চিত্ত এখানে ধরা দিয়াছে। অন্যত্র, প্রেমিকের অন্যাসক্তি ও একনিষ্ঠতার অভাবে রাধা খেদ করিয়া বলিতেছেন,

সই, কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া!
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে?
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমতি হউক সে!

রাধার অসহ্য হৃদয়-বেদনা প্রেমিকের প্রতি এই অভিশাপে চরম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

গভীরতম মিলনের মধ্যেও যে বিচ্ছেদের, অতৃপ্তির অভিশাপ আছে, তাহাও রাধার জানা আছে, কেননা, রাধা ও শ্যামের মিলনলগ্নেও

'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।'

কিছুতেই যেন তৃপ্তি নাই—

'নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি!'

যখন কোনো ভাবনা নাই, যখন প্রেমিক আয়ত্তাধীন, তখনো রাধার ভয় যায় না,—

এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে,
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে।

রাধার আর স্বস্তি নাই, তাই কৃষ্ণকে বলিতেছেন,

বঁধু, যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও,
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।

রাধার এই ভয়সংকুল, অনুরাগ-সর্বস্ব, আত্মসমর্পণ-উন্মুখ প্রেমিকা

চিত্তটি চণ্ডীদাস অসাধারণ নৈপুণ্য ও দরদের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন এবং প্রেমের মহিমা সম্পর্কে প্রাচীন বাঙালি পাঠককে সচেতন করিয়া তুলিয়াছেন। চণ্ডীদাস জগৎ অপেক্ষা প্রেমকে বড় বলিয়া মানিয়াছেন। তাই তিনি বলেন,—

পরাণ সমান পিরীতি রতন
জুকিনু হৃদয়-তুলে,
পিরীতি রতন অধিক হইল,
পরাণ উঠিল দুলে।............
নিতই নূতন পিরীতি দু'জন
তিলে তিলে বাড়ি যায়;
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাড়ায়,
পরিণামে নাহি থায়।

বিদ্যাপতিও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনাচ্ছলে প্রেমের মহনীয়তা ও গভীরতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। সে কথা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি।

বৈষ্ণব-পদাবলীধৃত প্রেমকবিতা আধুনিক প্রেমকবিতার সহিত একাসনে বসিতে পারে না, ইহা সত্য। কিন্তু আধুনিক বাংলা প্রেমকবিতা (উনবিংশ শতাব্দীর প্রেমকবিতা) যে বৈষ্ণব প্রেমকবিতা হইতে জীবনীরস কিছু পরিমাণে আহরণ করিয়াছে, ইহা অবশ্যস্বীকার্য। পদাবলী-রচয়িতৃবৃন্দ ধর্মসাধনার সাংকেতিকতার অজুহাতে আমাদের দূরে সরাইয়া রাখেন নাই। আমাদের তথ্য-বিষয়ক কৌতূহল, সৌন্দর্যরসবোধ ও মানবিক তৃষ্ণা সেখানে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী আজো আমাদের মনে সাড় জাগায় এই মানবিক আবেদনের জোরেই। বৃন্দাবনের চিরকিশোর কিশোরীর অনুপম প্রেম, ধর্মের বিশেষ অধিকারের সুযোগ প্রত্যাহার করিয়া অনুশাসনের ঔদ্ধত্য বিসর্জন দিয়া, মানবহৃদয়ের সনাতন রসজ্ঞতা ও সৌন্দর্যানুভূতির প্রতি নিজ আবেদন জানাইয়াছে ও এই প্রীতিস্নিগ্ধ, সরস পথ বাহিয়াই আমাদের অন্তরলোকে চিরন্তন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদকর্তারা ধর্মাবেশের ক্ষণস্থায়ী আনুকূল্যের চোরাবালির উপর তাঁহাদের কাব্যের ভিত্তিভূমি রচনা করেন নাই, ইহাতে তাঁহাদের শাশ্বত রসজ্ঞানের ও রসপিপাসু চিত্তের রহস্যজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

"বৈষ্ণব প্রেমকবিতার সার্থকতা ও সর্বজনীনতার মূলে কি কারণ আছে? রাধাকৃষ্ণের প্রেম প্রথম উন্মেষ হইতে চরম সার্থকতা ও চির-বিরহের মাধুর্য-বেদনা-মণ্ডিত পরিণতি পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তর আমাদের নিকট রেখায়, বর্ণে, পটভূমিকার অবকাশে, ক্রমপর্যায়বিন্যস্ত, রসঘন নাটকের ন্যায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিদিনের কত খুঁটিনাটি কাহিনী, কত মান-অভিমান-অনুরাগ-বিরাগের পালা, প্রণয়-লীলাভিনয়ের কত বৈদগ্ধ্য

চাতুর্য, কত হাস্য-পরিহাসে সরস, প্রচ্ছন্ন-শ্লেষ মার্জিতউত্তর প্রত্যুত্তর, হৃদয়াবেগের কত অনিবার্য উচ্ছ্বাস, ঘটনা সংস্থানের কত অভিনব বৈচিত্র্য এই প্রেম-কাহিনীকে সমৃদ্ধ, রস-নিবিড় ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগের উদাহরণস্থল করিয়াছে। বাহিরের প্রতিবেশ-প্রভাব ইহাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতা হইতে অপসারিত করিয়া সমাজ-জীবনের জটিল সংস্থিতি ও দুশ্ছেদ্য সম্পর্কজালের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। সখা-সখীর দৌত্য, সমবেদনা, সস্নেহ অনুযোগ ও তিরস্কার, গুরুজনের বিরাগ-ভীতি, সমাজ-বিধি উল্লংঘনের সংকোচ আশংকা মিশ্রিত দুঃসাহসিকতা, পিতামাতার স্নেহ-বাৎসল্য, গোপ-সমাজের আচার ব্যবহার ও সাধারণ জীবন যাত্রার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এই অনুপম প্রেমের পটভূমিকা রচনা করিয়া ইহাকে রসধারা ও জীবনী শক্তিতে পূর্ণ করিয়াছে। তাহার উপর বহিঃপ্রকৃতির পুঞ্জীভূত সৌন্দর্য-সমাবেশ এই প্রেমকে কল্পলোকের আদর্শ-সুষমা-মণ্ডিত করিয়াছে। যমুনা তীরের শ্যামল বনানী-শোভা, ঋতুচক্রাবর্তনের পরিবর্তনশীল সৌন্দর্যসম্ভার, শরৎ-পূর্ণিমার কৌমুদীপ্লাবন, বসন্ত-রজনীর বিহ্বল মদিরতা, বর্ষার মেঘান্ধকার, বর্ষণমুখর নিশীথের ঘনীভূত বিরহবেদনা ও ব্যাকুল অভিসার-যাত্রা, পুষ্পসৌরভ ও বাঁশীর আকুল আহ্বান, নৃত্যগীত বন-ভোজনের আনন্দ-হিল্লোল, রাস-দোল-ঝুলনের পুলকাবেশ এই ঐশী প্রেমের দেবমন্দিরে রূপমুগ্ধ কবিকল্পনার পরিপূর্ণ সৌন্দর্যাভিষেকের অর্ঘ্য সাজাইয়াছে। আবার, এই সৌন্দর্যো-পভোগের কবিতার ভাবমণ্ডল বেষ্টন করিয়া আছে অধ্যাত্ম-সাধনার সার্থক ইঙ্গিত। বৈষ্ণব কবিরা পরিচিত জীবনের প্রতিবেশে, পার্থিব প্রেমের রসানুভূতির মধ্য দিয়া, ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া প্রাকৃত সম্ভোগকে শেষ পর্যন্ত অধ্যাত্ম সাধনায় রূপান্তরিত করিয়াছেন।" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের কথা,' পৃঃ ৫৬-৫৭)।

বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার উৎকর্ষের মূল এইখানে। পুনশ্চ, অবনতির কারণও এইখানে। বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতারা রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল-নীলমণি'র নির্দেশানুসারে পদ রচনা করিতেন। নায়ক-নায়িকার প্রেম-উন্মেষ হইতে পরিণতি পর্যন্ত ইতিহাস সুনির্দিষ্ট ছকে বাঁধা পড়িয়াছে, ফলে কাব্যের অন্তরশায়ী আত্মা আত্মগোপন করিয়াছে। স্থূল, বাহ্য উপাদানের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার কুফল বৈষ্ণবপদাবলীর অবনতি-যুগে লক্ষ্য করা গিয়াছে। প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-আকূতি উৎকণ্ঠা, জাগৃতি প্রভৃতি দশবিধ বিকারে নিজ অসীম সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করিয়াছে; হৃদয়গত আকর্ষণের অসংখ্য সূত্র মুরলীদৌত্য, সখীদৌত্য ও স্বয়ংদৌত্য এই তিনটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে বিন্যস্ত হইয়া তাহাদের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও আবেদনগূঢ়তা হারাইয়াছে, নায়ক-নায়িকার চৌষট্টি প্রকার

অবস্থার ছকে বাঁধা পড়িয়া চিত্তচাঞ্চল্য ও ব্যাকুলতা নিষ্প্রাণ হইয়া পড়িয়াছে। মহাসমুদ্রের প্লাবন, হৃদয়-যমুনার অগণিত ঢেউ, কৃত্রিম অববাহিকার পথে পরিচালিত হইয়া মন্দীভূত স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। এইভাবে বৈষ্ণব প্রেমকবিতা মানবিক আবেদন বর্জিত হইয়া নিষ্প্রাণ, স্থূল বস্তুপিণ্ডে পরিণত হইয়া অগৌরবের মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছে।

দীর্ঘ তিনশত বৎসরের গৌরবময় জীবন অতিবাহিত করিয়া বৈষ্ণব-কবিতা অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রেরণা-নিঃশেষিত হইয়া গেল। বৈষ্ণব প্রেম কাব্যবন্ধন বা ধর্মাবেষ্টনের গণ্ডীমুক্ত হইয়া বাস্তব জীবনে সাধারণ মানব-হৃদয়ে স্থান লাভ করিল। রাধাকৃষ্ণের বেনামীতে হৃদয়াবেগ প্রকাশের রীতি পরিত্যক্ত হইল। সাধারণ মানুষের লৌকিক প্রেম আপন মহিমায় ছদ্মাবরণ ত্যাগ করিয়া দেখা দিল। এই ভাবেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-বিন্দুতে কবিগানের জন্ম হইল। কবিগান সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

কবিগান ও টপ্পায়, প্রেমকবিতার যে ভূমিকা রচিত হইয়াছিল, তাহার পরিণতি বিহারীলালে। বিহারীলাল সৌন্দর্য ও প্রেমের মিষ্টিক কবি। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যে 'পথ-পারানি'র তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহাই বিহারীলালের কাব্যে ধৃত হইয়াছে। জীবনকে এড়াইয়া যাওয়া নয়, পার হওয়াই বড়: 'পথ-পারানি'র এই তত্ত্বই বিহারীলালের মিষ্টিক জীবনদর্শনের মূলে আছে। তিনি বঙ্গভারতীর আসরে নামিয়াই মুহূর্ত মধ্যে কাব্যবীণার তার চড়াইয়া দিলেন। তিনি যে প্রেমের গান গাহিলেন, তাহা বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতি সব-ভুলানো প্রেমের গান।

ইহার পূর্বে আমরা মহাকাব্যের আধারে মৃদু প্রেমগুঞ্জরণ শুনিয়াছি। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে (১৮৬১) প্রমীলা-মেঘনাদের প্রেমালাপ ও সীতার পঞ্চবটী-সুখস্মৃতি-চারণ, 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের রাধার বিলাপ ও বীরাঙ্গনা কাব্যের ক্ষাত্র প্রেমের দৃপ্ত আত্মঘোষণা; 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী' ও 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্যে দীর্ঘ আখ্যায়িকা কাব্যের যুদ্ধাদি বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ; 'বীরবাহু' কাব্যে হেমলতার পূর্বসুখস্মৃতিচারণ: ইহাই একমাত্র সম্বল ছিল। এগুলির মধ্যে আর যাহাই থাকুক, বিহারী-লালের প্রেমগীতির সম্ভাবনা ছিল না, ইহা স্বীকার করাই ভালো।

ইহার মধ্যে বিশেষ মনোযোগ দাবি করিতে পারে দুইটি কাব্য—ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও বীরাঙ্গনা কাব্য।

আধুনিক অর্থে (পাশ্চাত্ত্য সংজ্ঞানুযায়ী) বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রেম-গীতিকা হিসাবে ব্রজাঙ্গনা কাব্যের উল্লেখ কেহ কেহ করিয়াছেন। এই অভিমতটি বিশেষ বিচার্য। ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনার পূর্বে মধুসূদন রাজ-

নারায়ণ বসুকে, লিখিয়াছিলেন,—"I suppose I must bid adieu to Heroic poetry after Meghnad. A fresh attempt would be something like a repetition. But there is the wide field of Romantic and lyric poetry before me, and I think I have a tendency in the lyrical way."

এই উক্তি হইতে ইহা অন্ততঃ প্রমাণিত হয় যে, ব্রজাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন মুখ বদ্‌লাইতে চাহিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া বৈষ্ণব কাব্য ও বৈষ্ণব মহাজনদের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না, ইহাও সুবিদিত। তিনি ব্রজের শ্রীমতী রাধার ("Mrs. Radha, poor lady of Braja") প্রতি একটু সহানুভূতি দেখাইয়া কবিতা রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। "চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির রাধা হইতে মধুসূদনের রাধা অনেকখানি পৃথক। মধুসূদনের রাধা প্রথমাবধিই বিরহিণী এবং দিব্যোন্মাদিনী, এই রাধা বিরহেও বড় সুচতুরা, ভাবের আবেগ অপেক্ষা কথার ছাঁদনিই বেশী, হৃদয়াবেগ অপেক্ষা পরিপাটি বাক্যের বাঁধুনিই বড়ো হইয়া উঠি য়াছে; অন্তরের গভীর বেদনা অপেক্ষা ঝাঁজটাই যেন প্রকাশ পাইয়াছে বেশী।" (—ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত, 'বাংলা সাহিত্যের নবযুগ', পৃ ৭৫)।
রাধার উক্তিতে এই অগভীরতা ও ঝাঁজ ধরা পড়িয়াছে :

যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তার পাশে
মদন-রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে সম্বর-অরি,
কে সংবরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে?

কেবল যুক্তিই নহে, ঈর্ষান্বিত খোঁচাও আছে—

ফুটিছে কুসুম দল, মঞ্জুকুঞ্জ-বনে রে,
যথা গুণমণি!
হেরি মোর শ্যামচাঁদ পীরিতের ফুলফাঁদ
পাতে লো ধরণী।
কি লজ্জা! হা ধিক্ তারে ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী?

আসল কথা, মধুসূদন ব্রজের রাসলীলাকে কামকেলির ছলনা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'শৃঙ্গার-রস' নামক কবিতায় মধুসূদন বলিয়াছেন—

হাত ধরা-ধরি করি নাচে কুতূহলে
চৌদিকে রমণীচয়, কামাগ্নি নয়নে,—
উজলি কানন-রাজি বরাঙ্গ ভূষণে
ব্রজে যথা ব্রজাঙ্গনা রাস-রঙ্গছলে।

এই রাসরঙ্গলীলার কথাই 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে মধুসূদন বর্ণনা করিয়াছেন।

বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির নিবিড় সংযোগ-চিত্রণ ক্ষেত্রে মধুসূদন বিরল সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেম ও বিরহ-বেদনার চিত্রণ এই কাব্যে সার্থকতামণ্ডিত হইয়াছে।

নিম্নধৃত চরণগুলি এই দুইরূপ কৃতিত্বের পরিচয়স্থল।

কে ও বাজাইছে বাঁশী, সজনি, মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জ বনে?
নিবার উহারে; শুনি ও ধ্বনি দ্বিগুণ আগুন জলে গো মনে!
এ আগুনে কেন আহুতি দান? অমনি নারে কি জালাতে প্রাণ?

পুনশ্চ, হে শিশির! নিশার আসার!
তিতিও না ফুলদলে ব্রজে আসি তব জলে
বৃথা ব্যয় উচিত গো হয় না তোমার;
রাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরল
ভিজাইবে আজি ব্রজে—যত ফুলদল।

পুনশ্চ, কি কহিলি কহ সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা; জুড়া এ প্রাণের জালা;
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন?
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি',
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ?

এখানে প্রেমিকা-চিত্তের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা তীব্রতার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু 'বসন্তে' শীর্ষক কবিতা দুইটিতে মধুসূদনের রাধা আর ইন্দ্রিয়জ রূপ-মোহে আবদ্ধা নহেন। বিরহের বেদনায় এখন গভীরতা আসিয়াছে; সমস্ত হৃদয় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে; সখীর একটি আশ্বাস-বাক্য আজ পরম নির্ভর-স্থল। আবেগসৃষ্টিতে মধুসূদন এখানে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন। রাধার বেদনাভরা আশ্বাসোক্তি:

মুছিয়া নয়ন জল, চল লো সকলে চল,
শুনিব তমালতলে বেণুর সুরব—
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব।

এই বিশ্বাস প্রেমের বিশ্বাস, হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি-উৎসারিত বিশ্বাস। তাই আজ রাধা যৌবনকলাবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইতেছে না; আজ তাহার পুজোপচার,

পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে।
দুই কর-কোকনদে, পুজিব রাজীব পদে,
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে, ভাবিয়া মনে।
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে।

এ যৌবন-ধন, দিব উপহার রমণে।
ভালে যে সিন্দুর বিন্দু হইবে চন্দন বিন্দু ;
দেখিব লো দশ ইন্দু সুনখ-গগনে
চিরপ্রেমবর মাগি লব, ওগো ললনে !

এই পরম আশ্বাসের সুরেই ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সমাপ্তি। ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের গীতিকবিতা হিসাবে ব্রজাঙ্গনা কাব্যের একটি স্থায়ী মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু ভাবের ক্ষেত্রে যে সমুন্নতি 'বসন্তে' কবিতায় ঘটিয়াছে, তাহা রূপকর্মে অনুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই। প্রকাশভঙ্গীর নিটোল নিবিড়তা ব্রজাঙ্গনা কাব্যের নাই। তাই প্রকাশের দিক দিয়া ব্রজাঙ্গনার নিকৃষ্টতা প্রমাণিত। গীতিকাব্যোচিত লাবণ্য-বিভা ব্রজাঙ্গনায় দেখি না।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের (১৮৬১) অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সে কাব্য ঐতিহাসিক কৌতূহলের উপাদান মাত্র, তাহার কোনো সাহিত্য-মূল্য নাই। 'কবিতাপুস্তক'-এ (১৮৭৮) বঙ্কিমচন্দ্র 'আকাঙ্ক্ষা' শীর্ষক কবিতায় কৃষ্ণ ও রাধার সংলাপ রচনায় ব্রজাঙ্গনার অনুসরণ করিয়াছিলেন। সুন্দরীর (রাধা) উক্তি :

কেন না হইলি তুই, যমুনার জল,
রে প্রাণবল্লভ।
কিবা দিবা কিবা রাতি, কূলেতে আঁচল পাতি,
শুইতাম শুনিবারে, তোর মৃদু রব ॥
রে প্রাণবল্লভ।

সুন্দরের (কৃষ্ণ) উক্তি :

কেন না হইনু আমি, কপালের দোষে
যমুনারজল।
লইয়া কম কলসী, সে জল মাঝারে পশি,
হাসিয়া ফুটিত হাসি, রাধিকা কমল—
যৌবনেতে ঢল ঢল ॥

বীরাঙ্গনা কাব্যে (১৮৬১) মধুসূদন প্রকৃতই Heroine বা বীরাঙ্গনা নারীচরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে ইহা নূতন। প্রেমের স্পর্ধা, শৌর্য ও দৃপ্ত ভঙ্গিমাটি এখানে প্রকাশিত হইয়াছে। অকুণ্ঠ চিত্তে প্রেমের দাবি ঘোষণায়, আপন প্রেমমহিমার জয়কীর্তনে, বৈধ বা অবৈধ বা তদ্বিচারে-পরাঙ্মুখ এ্যাড্‌ভেঞ্চার স্পৃহাযুক্তা প্রেমদর্পিতা নারীর আত্মপ্রকাশে বীরাঙ্গনা কাব্য একটি স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। 'Heroic Epistles'-এর অনুসরণে কবি এগারটী প্রণয়পত্রিকা রচনা করিয়াছেন। আখ্যায়িকার বিবৃতি-প্রধান ত্বরান্বিত গতিযুক্ত, ঋজু প্রত্যক্ষ সংলাপমণ্ডিত, ঘাত প্রতিঘাতে উত্তেজিত এই কাব্য নাট্যধর্মবিশিষ্ট। পত্রাকারে রচিত বলিয়াই ইহাতে গোপন হৃদয়-

রসের বেদনরোমাঞ্চ বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। এই নাট্যধর্মী প্রণয়-পত্রিকাগুলি অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলেই ইহার দ্রুত গতির অন্তরালে গীতিমূর্ছনা আবিষ্কার করা কঠিন নহে। পৌরাণিক নায়িকার প্রেমবেদনার গীতিঅভিব্যক্তিতে যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য আছে তাহা মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। 'সোমের প্রতি তারা', 'পুরূরবার প্রতি উর্বশী', 'দুষ্মন্তের শকুন্তলা' এই তিনটী প্রণয়পত্রিকা পাঠেই উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন মিলে। একটীমাত্র পত্রিকার ('সোমের প্রতি তারা') প্রারম্ভিক কয়েকটি চরণ এখানে উদ্ধার করিতেছি:

> কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
> তোমারে অভাগী তারা ? গুরুপত্নী আমি
> তোমার, পুরুষরত্ন ; কিন্তু ভাগ্যদোষে
> ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি।—
> কি লজ্জা ! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি
> লিখিলি এ পাপকথা, হায় রে কেমনে ?
> কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে ! হস্তদাসী সদা
> তুই, মনোদাস হস্ত, সে মনঃ পুড়িলে
> কেন না পুড়িবি তুই ? বজ্রাগ্নি যদ্যপি
> দহে তরুশিরঃ, মরে পদাশ্রিত লতা !
> হে স্মৃতি, কুকর্মে রত দুর্মতি যেমতি
> নিবায় প্রদীপ, আজি চাহে নিবাইতে
> তোমায় পাপিনী তারা ! দেহ ভিক্ষা, ভুলি
> কে সে মনঃ-চোর মোর, হায়, কেবা আমি !
> ভুলি ভূতপূর্ব কথা,—ভুলি ভবিষ্যতে!

কর্তব্যে ও প্রেমে দোলায়িতচিত্তা তারার প্রেমে যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও হৃদয়রসের রোমাঞ্চ এখানে প্রকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা গীতিকাব্যের বিষয়। অনুভূতি গভীরতা ও তীব্রতা ইহাকে স্থায়িত্ব দিয়াছে।

মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬) সন্ধান করিলে পাঁচটি প্রেমবিষয়ক সনেট পাওয়া যায় : 'মেঘদূত' ১, 'পরিচয়' ১-২, 'নিশা' ও শততম সনেটটি [প্রফুল্ল কমল যথা]।

'নিশা' সনেটের সমগ্র অষ্টক-বন্ধে নৈশ প্রকৃতি কবিচিত্তের প্রতিবিম্ব হইয়া উঠিয়াছে এবং ষটকবন্ধে অষ্টকের অলংকার-প্রসাধন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে :

> এ হৃদয়, দেখ, এবে ওই সরোবরে,—
> চন্দ্রিমার রূপে এতে তোমার মূরতি।

আর 'প্রফুল্ল কমল যথা' সনেট মধুসূদনের প্রেমচেতনার সর্বোত্তম প্রকাশ রূপে দেখা দিয়াছে। সনেটটিতে দাম্পত্য চেতনার মহত্তম প্রকাশ ঘটিয়াছে :

প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আঁধারে!
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার মাঝারে।

কবির গৃহলক্ষ্মী এখানে মর্মের গেহিনী ও সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেই বন্দিত হইয়াছেন।

প্রকৃতিবিষয়ক কবিতার ক্ষেত্রে যেমন, প্রেমকবিতার ক্ষেত্রে তেমনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। এই বৎসর নিম্নলিখিত কাব্যগুলি প্রকাশিত হয়:

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী—প্রেমপ্রবাহিনী, বঙ্গসুন্দরী, বন্ধুবিয়োগ
বলদেব পালিত—কাব্যমালা
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কবিতাবলী

ইহার পূর্বে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিহারীলালের 'সংগীতশতক' প্রকাশিত হয়। এই কাব্যে প্রেমের আদর্শায়িত রূপ চিত্রণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এখানে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, বাস্তব জগতে প্রেমের কোনো লৌকিক প্রতিষ্ঠাভূমি নাই, অন্তর্জগতেই প্রেমের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। এই প্রেম স্পষ্টতঃই আদর্শায়িত প্রেম। তারপর 'বন্ধুবিয়োগ' ও 'প্রেমপ্রবাহিনী' কাব্যে বিহারীলাল নূতন পথে অগ্রসর হইয়াছেন। 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যে বিষয় নির্বাচনে অসাধারণ সাহসিকতা ও মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায়। তিন বন্ধু ও নিজ স্ত্রী—এই চারজনের উদ্দেশে কবি ছন্দোবদ্ধ স্মৃতিতর্পণ করিয়াছেন নিজ ভাবানুভূতি এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য। এই কাব্যে সাহিত্য প্রথানুবর্তন একেবারেই নাই। বন্ধুপ্রেম ও পত্নীপ্রেমের আলোচনায় গতানুগতিকতাবর্জিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই। কবির নিজ দাম্পত্যপ্রেমের ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ অথচ একান্ত বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা এখানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পত্নীবিয়োগে অনিবার্য অসহনীয় শোকের অগ্ন্যুৎপাত-বর্ণনায় সাহিত্য-রীতির অকুতোভয় বর্জন, ভাষার ওজস্বিতা ও তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। তবে সাহিত্য-কারুকর্মের অভাব সর্বত্রই প্রকট।

নিদ্রিতা স্ত্রী সরলার বর্ণনা এইরূপ:

নিদ্রা যায় সব শুয়ে শয্যার উপরে,
গায়ের উপরে বায়ু ঝুর্ ঝুর্ করে,
শোভিছে চন্দ্রের করে নীরব বদন,
নিমীলিত হয়ে আছে কমল নয়ন।
সুদীর্ঘ অরাল পক্ষ্ম পবন-হিল্লোলে,
অল্প অল্প হেসে হেসে কেঁপে কেঁপে দোলে
কপোল গোলাপ ফুল গোলাপী আভায়,

অধর পল্লব নব কিবা শোভা পায়!
পাশে গিয়ে বসিলাম স্নেহার্দ্র পরাণে,
রহিলাম স্থির চক্ষে চেয়ে মুখপানে।
বায়ুবেগে পল্লবদল করে থর থর,
তেমনি উঠিল কেঁপে প্রিয়ার অধর।
কল-স্বরে ধীরে ধীরে ফুটিল বচন,
'আমি যত বাসি, তুমি বাস না তেমন।'
অমনি আদরে ধোরে করিয়ে চুম্বন,
কোলেতে বসায়ে, তুলে ধরিনু নয়ন।

প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে কবির গতানুগতিকতাবর্জিত বিলাপ প্রকাশে তীব্রতা ও আন্তরিকতা ধরা পড়িয়াছে:

হা হা রে হৃদয়ধন সরলা আমার,
কোথা গেলে ত্রিভুবন করি অন্ধকার!
উহু উহু বুক ফাটে হায় হায় হায়,
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল মাথায়!......
মরি মরি কি মাধুরী, হায় হায় হায়,
কাছে এস প্রিয়তমে, কাজ কি লজ্জায়!
হৃদয়ের ধনে আজি রাখিয়ে হৃদয়ে,
জীবন জুড়াই, থাকি সুশীতল হয়ে।
কই কই! কোথা গেল দেখিতে দেখিতে,
সৌদামিনী লুকাইল খেলিতে খেলিতে!
দৃষ্টিপথে আবির্ভূত দ্বিগুণ আঁধার,
শ্রবণে বজ্রের ধ্বনি বাজে অনিবার।
হা হা রে হৃদয়ধন সরলা আমার,
কোথা গেলে ত্রিভুবন করি অন্ধকার?
হায় কি হ'ল কোথায় গেল
আমার প্রিয় দুখিনী!
হৃদয় কেমন করে, কাঁদিয়ে উঠিছে প্রাণী।
এত সাধের ভালবাসা,
এত সাধের তত আশা,
সকলি ফুরায়ে গেল হায় হায় হায়!
চরাচর সমুদয়,
শূন্যময় তমোময়।
বিষাদ বিষম বিষ দহে দিবস যামিনী।

('বন্ধুবিয়োগ', তৃতীয় সর্গ

অমৃত সাগর যেন আত্মার তৃপ্তির !
আঁজি বিশ্ব আলো কার কিরণ নিকরে,
হৃদয় উথলে কার জয়ধ্বনি করে ;
বিপদ সম্পদ্ যত জগতের ধন,
কেন আজি যেন-সব নিশির স্বপন ;
কেন দুষ্ট পাপের দুর্দ্দান্ত সৈন্য যত,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছে হয়ে অবনত ;
কেন সেই প্রবৃত্তির জ্বলন্ত অনল,
পদতলে পড়ে আছে হয়ে সুশীতল ;
ছুটিয়ে পলান কেন পীরিতি সুন্দরী,
কেন বা উহারে হেরে মনে হেসে মরি !

ক্রমে ক্রমে নিবিতেছে লোক-কোলাহল,
ললিত বাঁশরীতান উঠিছে কেবল ।
মন যেন মজিতেছে অমৃত সাগরে,
দেহ যেন ফাটিতেছে সমাবেগভরে ।
প্রাণ যেন উড়িতেছে সেই দিক পানে,
যথার্থ তৃপ্তি স্থান আছে যেই স্থানে ।
অহো অহো, আহা আহা একি ভাগ্যোদয় ।
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আজি প্রেমানন্দময় !

(প্রেমপ্রবাহিনী, পঞ্চম সর্গ)

ইহাই সারদামঙ্গল কাব্যের যথার্থ ভূমিকা ।

গার্হস্থ্যজীবনকে কেন্দ্র করিয়া গার্হস্থ্য প্রেমের (domestic love) কবিতা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হয় ।

মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে যে ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার সূচনা, তাহা বলদেব পালিতের কবিতায় পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে ও পরে দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, স্বর্ণকুমারী দেবী, মুন্সী কায়কোবাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, বরদাচরণ মিত্র, প্রিয়নাথ মিত্র, কুঞ্জলাল রায়, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর কবিতায় বিচিত্র বিকাশ লাভ করিয়াছে ।

আদর্শান্বিত (idealised) প্রেমকবিতার সূচনা হইয়াছে বিহারীলালের 'সঙ্গীতশতক' ও 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে ; তাহা পরিপুষ্ট হইয়াছে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' কাব্যে । হেমচন্দ্র, অক্ষয় বড়াল, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, প্রমথনাথ রায়-চৌধুরী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, সরোজকুমারী দেবী প্রভৃতি কবিদের রচনায় তাহা বিকশিত হইয়াছে ।

ইন্দ্রিয়সম্পর্করহিত কল্পনার উচ্চস্তরাশ্রিত প্লেটোনিক প্রেমকবিতার সূচনা হইয়াছে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) ও 'সাধের আসন' (১৮৮৮) কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' (১৮৯০) কাব্যে ইহার বিকাশ 'নিষ্ফল কামনা', 'সুরদাসের প্রার্থনা' ও 'শেষ উপহার' কবিতায়। তারপর 'সোনারতরী (১৮৯৪) ও 'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্যে ইহার পরিণতি।

॥ ১ ॥

গার্হস্থ্য প্রেমকবিতা

গার্হস্থ্য জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রেম তাহার শান্ত, মৃদু, নিস্তরঙ্গ ধারা উপরোক্ত তিনটি প্রবাহের পাশাপাশি নীরবে বহিয়া গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি নবজাগরণের আঘাতে বিস্ময় লইয়া জাগ্রত হইয়াছিল। ইংরাজী কাব্য পাঠান্তে ও সম্ভোগান্তে বাঙালি কাব্যরসিক জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিপুলত্বের ও বৈচিত্র্যের প্রকাশ দেখিয়াছিল। জীবনে উন্মুক্ত রাজপথে বিচরণ করাতেই তাহার শক্তি নিঃশেষিত হয় নাই! প্রকৃতির প্রতিটি রহস্যময় আকর্ষণ অনুভব করাতেই সে ক্ষান্ত হয় নাই। প্রেমের বিচিত্র জটিল পথের অনুসরণে সেদিনের বাঙালি কবি একটি অশ্রান্ত পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। গার্হস্থ্য-প্রেম সেই যাত্রাপথের ধারে দেখা দিয়াছে। নবোদ্বোধিত বিস্ময় ও আনন্দের দৃষ্টিতে বাঙালি নিজ ঘর-গৃহস্থালীকে দেখিয়াছিল; ফলে অপরূপ আলোকে বাঙালির গৃহ ভরিয়া উঠিয়াছিল। গার্হস্থ্য জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই বাঙালি অপার আনন্দ আহরণ করিয়াছে। এ সেই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির ফল। মাতার প্রতি শিশুর আকর্ষণ, শিশুর প্রতি মাতার আকর্ষণ, সংসারের সমস্ত দুঃখবেদনার উপর শিশুর হাসির জয় ঘোষণা, মহিমাময় বাৎসল্য রসের আবেগে কেবল নিজ সন্তানকে নহে, গৃহহারাকে আশ্রয় দানের আন্তরিক ব্যাকুলতা, সংসারকে একটি অখণ্ড শান্তির নীড় বলিয়া স্বীকৃতি দান—এ সবই এই গার্হস্থ্য প্রেমের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বাঙালি জীবনে সেদিন নিজ গৃহই ছিল মূল আকর্ষণ, এই সত্যই গার্হস্থ্য প্রেমের কবিতাগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মায়ের প্রতি সন্তানের আকর্ষণ গার্হস্থ্য প্রেমের অন্যতম অবলম্বন। রজনীকান্ত সেনের 'মা', 'নবমীর সন্ধ্যা' 'ব্যাকুলতা'; মানকুমারী বসুর 'মাতৃহারা' প্রভৃতি কবিতায় জননীর প্রতি সন্তানের অসীম অনুরাগ প্রকাশ লাভ করিয়াছে। শিশুকে ঘিরিয়া যে বাৎসল্যরস, তাহার সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়াছে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'ভয়ে ভয়ে' 'চোর'; প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'অবোধ ব্যথা' কতিায় দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অপূর্ব শিশুমঙ্গল' কাব্যে, মানকুমারী বসুর 'অতিথি' 'অভ্যর্থনা', রমণীমোহন ঘোষের 'দেবশিশু', হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিশুর হাসি' প্রভৃতি কবিতায়। ছোট্ট শিশুর খেলার বর্ণনায় গার্হস্থ্য

প্রেমের এক নূতন প্রকাশ ঘটিয়াছে—কুসুমকুমারী দাসের 'খোকার বিড়ালছানা', 'দাদার চিঠি' কবিতা দুইটি ইহার সুন্দর পরিচয়স্থল।

গার্হস্থ্য প্রেমের কবিতাগুলি তাই বাঙালির একদা যে শান্তির নীড় ছিল, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছিল। আজ সে শান্তির নীড় নাই, এবং এই শ্রেণীর কবিতাও আজ আর লেখা হয় না। বিগত শতাব্দীর বাঙালি জীবনের শান্তি ও সংস্থিতির পরিচায়করূপে এই কবিতাগুলি রহিয়া গিয়াছে।

গার্হস্থ্য প্রেমের কবিতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পঞ্চম অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

॥ ২ ॥

ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা

ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা (sensuous love-poems) নিঃসন্দেহে ইংরাজী প্রভাবের ফল। ইহার পূর্বে যে সকল কবিতা ও কাব্য রচনা হইয়াছিল, তাহা ইন্দ্রিয়াসক্ত (sensual) কবিতা। এই ইন্দ্রিয়াসক্ত কবিতার সুন্দর পরিচয়স্থল জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে। জয়দেব রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে ধর্মশাস্ত্রের আবেষ্টন হইতে মুক্ত করিয়া ও ইহাকে সাত শত বৎসর হইতে প্রবাহিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্যধারার সহিত সংযুক্ত করিয়া ইহার ভবিষ্যৎ প্রসার ও পরিণতির পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। জয়দেবে মাধুর্যসৃষ্টি মুখ্য উদ্দেশ্য ; আধ্যাত্মিকতার ব্যঞ্জনা গৌণ। দার্শনিক তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত অশরীরী, অলৌকিক প্রেমের মধ্যে তিনি প্রাকৃত প্রেমের তীব্র হৃদয়াবেগ ও রসানুভূতি সঞ্চার করিয়া ইহাকে কাব্যগুণসমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন। গীতগোবিন্দ কাব্যে ইন্দ্রিয়াসক্তি যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা অনস্বীকার্য। জয়দেব ঐশী প্রেম আলোচনায় যে শৃঙ্গার রসপ্রাধান্যের ধারা প্রবর্তন করিলেন বিদ্যাপতি তাহাকেই নিজ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রণয়কলাচাতুরীর মণ্ডনকলাসম্মত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাহা ছাড়া রাজপ্রতিবেশ-প্রভাবের ফলে প্রণয়ের আস্বাদনে বিদ্যাপতি বিদগ্ধ রুচির ও পরিপক্ব অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

কিন্তু ইহার পর চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য হ্রাস পাইয়াছে। "চৈতন্যদেবের জীবনব্যাপী নিগূঢ় অনুভূতির উৎসমুখ হইতে উদ্ভূত এক কূলপ্লাবী অধ্যাত্মভাবের প্লাবন পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া ইহার সৌন্দর্যসম্ভোগ বর্ণনার বেগবান তরঙ্গোচ্ছ্বাসের সহিত সমতা রক্ষা করিয়াছে। এই চৈতন্যোত্তর কবিতার দেহসৌন্দর্য ও ইন্দ্রিয়-লালসার চিত্রণের নগ্ন আতিশয্যের মধ্যে এক প্রকার শিশু-সুলভ নিষ্পাপ সরলতা, আত্মবিস্মৃত ভক্তিবিহ্বলতা ও অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনা অনুস্যূত হইয়া ইহাকে সমস্ত অস্বাস্থ্যকর বিকারের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। প্রণয়লীলা সম্বন্ধে পরিপক্ব অভিজ্ঞতার ছাপটি কেবল বিদ্যাপতিতে নহে, চৈতন্যোত্তর পদাবলীতেও লক্ষ্য

করা যায়।" (—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', পৃ ১২)। বৈষ্ণব কবি যখন প্রেমবর্ণনায় ভক্তিবিহ্বল তখনও তিনি কামশাস্ত্র ও রসবিদগ্ধ সমাজ জীবনের শিক্ষা বিস্মৃত হন নাই। এই পাকা ওস্তাদি সুর বহু শতাব্দী ধরিয়া অনুশীলিত সংস্কৃত প্রেমকবিতার নিকট হইতে বৈষ্ণব কবিতা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে। পদাবলীতে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত রসিকের বিশেষজ্ঞতারও সমন্বয় হইয়াছে। তাই বৈষ্ণবপ্রেম কবিতার ইন্দ্রিয়াসক্তি (sensuality) আধ্যাত্মিকরসে জারিত হইয়া পরিশুদ্ধ হইয়াছে।

বৈষ্ণবদের মতে রস একটি মাত্র –তাহা ভক্তি। কামবীজে ইহার উদ্ভব, হ্লাদিনীর মাদনাখ্য অনুভূতিতে পরিণতি। 'উজ্জ্বলনীলমণিতে' কামকলা ও নায়িকা-প্রকরণ আছে, কিন্তু সকলের গতিই অপ্রাকৃত নবীন মদনের আনন্দে। সুতরাং আদিতে রতি ও রতিবিলাস, মধ্যে মিলন মান রসোদ্গার, অন্তে বিরহ ও ভাবসম্মিলন। বৈষ্ণবদের রসসাধনা তথা শিল্পসাধনা এই অর্থেই অখণ্ড জীবনরসের সাধনা। পরবর্তীকালে এই সাধনার অবনতি ঘটিয়াছে।

বাংলা বৈষ্ণব প্রেমকবিতা অধ্যাত্ম-অনুভূতি-শাসিত। কিন্তু ইহার উৎস যে প্রাচীন ভারতীয় প্রেমকবিতা, তাহা একান্তই পার্থিব প্রেমকবিতা। বৈষ্ণব প্রেমকবিতার উপজীব্য যে, রাধাকৃষ্ণের চিরপ্রেমলীলা, তাহা পূর্বে প্রাকৃত প্রেমোপাখ্যান রূপেই প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ভিতরে রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যান প্রেমের গান ও ছড়া রূপে আভীর সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র পরিধি অতিক্রম করিয়া বৃহৎ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসার লাভ করিয়াছিল। মহাকবি হাল-রচিত 'গাহা-সত্তসই' (বা 'গাথা-সপ্তশতী'), 'অমরুশতক', 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়', 'সুভাষিতাবলী', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'সূক্তি-মুক্তাবলী', 'শার্ঙ্গধর পদ্ধতি', 'সূক্তিরত্নহার' প্রভৃতি মধ্যযুগীয় প্রাকৃত প্রেম-কবিতা-সংকলনগুলিতে যে সকল কবিতা রহিয়াছে, দ্বাদশ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব প্রেমকবিতায় তাহারই নির্ভুল প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রাকৃত প্রেমকবিতার নায়িকা হিসাবে আমরা যে রাধার উল্লেখ পাই, তিনি 'মহাভাবদ্যুতিস্বরূপিণী' কৃষ্ণৈকপ্রাণা রাধিকায় পরিণত হইয়াছেন চৈতন্য যুগে ; প্রাক্-চৈতন্য যুগে তিনি প্রাকৃত নায়িকা ছিলেন। জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কালের বৈষ্ণব কবিতার সহিত প্রচলিত ভারতীয় প্রেমকবিতার ধারার গভীর মিল রহিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে যত শৃঙ্গার বর্ণনা, যত নায়িকার নানা অবস্থাভেদের বর্ণনা আছে, তাহা সম্পূর্ণই ভারতীয় কাব্যসাহিত্য ও রতিশাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। আধ্যাত্মিক মর্যাদা আরোপিত হইয়াছে পরে—ষোড়শ শতাব্দীতে। পূর্ববর্তীরা সম্ভোগকেই প্রধান করিয়া প্রেমকে অনেক ক্ষেত্রে স্থূল করিয়া ফেলিয়াছেন ; আর বৈষ্ণব কবিগণ বিরহকে প্রধান করিয়া প্রেমের ভিতর সূক্ষ্মতার ও অতলতার সৃষ্টি করিয়াছেন।

ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়াশ্রিত লৌকিক প্রেমকবিতা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে নাই, একথা অনস্বীকার্য। আধুনিক যুগের অব্যবহিত পূর্বের ভারতচন্দ্রের কাব্য এই ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রকট রূপে দেখা দিয়াছে। বিদ্যাপতিতে যাহা মণ্ডনচাতুর্যে ও মৈথিলীর আবরণে অপ্রকাশ্য রহিয়াছে, ভারতচন্দ্রে তাহাই নগ্নরূপে ধরা পড়িয়াছে। এক হিসাবে বিদ্যাপতি ভারতচন্দ্রের আদিপুরুষ। উভয়ের কাব্যেই রাজপ্রতিবেশ প্রভাব, বাগ্‌বৈদগ্ধ, অলংকারচাতুর্য, প্রণয়চাতুরী লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য বিদ্যাপতির কল্পনাশক্তি ও ভাবগভীরতা ভারতচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। বিদ্যাপতির পদে হীরা মালিনীর পূর্বপুরুষস্থানীয়া কুট্টনীর উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে।

ভারতচন্দ্রের সময় হইতে বাংলার সমাজজীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে পট-পরিবর্তন হইতে থাকে। ভারতচন্দ্র ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজসভার কবি, তাই আদিরসের প্রাচুর্য তাঁহার কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। এদেশে নাগরিক সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রথম স্তরে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের, মদনমোহন তর্কালংকারের 'বাসবদত্তা' ও 'রসতরঙ্গিণী' কাব্যের এবং ঈশ্বর গুপ্তের আদিরসাত্মক কবিতার খুব জনপ্রিয়তা ছিল। এ সকল কবিকর্ম ইন্দ্রিয়াসক্ত কাব্য ছাড়া আর কিছুই নহে।

বৈষ্ণব প্রেমকবিতা অধ্যাত্ম রসে জারিত হইয়া পরিশুদ্ধি লাভ করিয়াছিল বলিয়াই তাহার ঊর্ধ্বায়ন সম্ভব হইয়াছিল। ইন্দ্রিয়াশ্রিত কবিতা বৈষ্ণব পদাবলীতে মিশিয়া গিয়াছে—উহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখা যায় না। রূপসম্ভোগপ্রধান প্রেমকবিতার বর্ণোচ্ছ্বাস অতীন্দ্রিয় প্রেমের নীল পারাবারে আসিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র-মদনমোহন-ঈশ্বর গুপ্তের ক্ষেত্রে সে ঊর্ধ্বায়ন হয় নাই, কারণ এখানে প্রেমের অধ্যাত্ম পরিশোধন ও আদর্শায়িত রূপায়ণ কিছুই ছিল না। বরং অশ্লীলতাই লক্ষ্য করা যায়। সেই রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়কালে, সমাজজীবনের ভাঙন আবর্তে, নৈতিক আদর্শের অবশ্যম্ভাবী শৈথিল্যের ভূমিকায় এই অশ্লীলতার কৈফিয়ৎ আছে।

ইহার পরই পাই কবিগান ও টপ্পা। কবিগান ও টপ্পাকে এক কথায় বলা চলে বৈষ্ণব প্রেমকবিতার ইতর সংস্করণ। এই বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। একটি ক্ষেত্রে কবিগান ও টপ্পা বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র মর্যাদা দাবী করে। অধ্যাত্মপ্রভাবমুক্ত লৌকিক প্রেমের অকুণ্ঠ দৃপ্ত আত্মঘোষণা এই গানগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে এই গান যথার্থ ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতায় পরিণত হয় নাই। কারণ, এখানে বস্তুর ঊর্ধ্বায়ন ও পরিশুদ্ধি হয় নাই। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার যে সূচনা লক্ষ্য করা গিয়াছে, তাহার পরিপুষ্টি এইবার লক্ষ্য করা যাইবে।

বাংলা কাব্যে যথার্থ ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা ইংরাজী কাব্যের সংস্পর্শে আসার পর লেখা হইয়াছে, একথা বলা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে ইহাও সত্য যে, কবি শেলী ও কীট্‌স্ এই প্রবল রূপতৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়াশ্রয়-প্রবণতার মূল প্রেরণাস্থল।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতিবিষয়ক কবিতার ন্যায় প্রেমকবিতার ক্ষেত্রেও ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। এই বৎসর বলদেব পালিতের 'কাব্যমালা' প্রকাশিত হয়। বলদেব পালিত হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়রসের কারবারী ছিলেন। তাহার স্পষ্ট পরিচয় এই 'কাব্যমালা'। এখান হইতেই ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার প্রকৃত যাত্রা শুরু হইল। 'কাব্যমালা' প্রেমকবিতার সংকলন। ইহার যে কোন একটি কবিতা আলোচনা করিলেই এই ইন্দ্রিয়-উপাসনা ধরা পড়িবে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইহা কোথাও ইন্দ্রিয়-অসংযমে পরিণত হইয়াছে কিনা। 'নারীর প্রেম' কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করিতেছি :

'একদিন অস্তগামী দিবাকর করে,
স্নানান্তে বসিয়া কোন সরসীর ধারে,
দেখিলাম এক নারী, নম্রা কুচভারে,
ভাঙ্গিল মৃণাল এক মৃণালিনী-করে ;
জলে তারে পুনরায় ডুবায় সাদরে,
সোপানে বসিয়া ধনী, স্বেচ্ছা অনুসারে
লিখিল একটি কথা দেখায়ে আমারে,
'যাক প্রাণ তবু প্রেম থাকুক অন্তরে।'
সে লেখা পড়িয়া, তার রূপ-রত্নাকরে
মগ্ন হয়ে, তারে আমি সঁপিলাম মন ;
কিন্তু কি আশ্চর্য! তারি দু-দিনের পরে,
আমারে ত্যজিয়া বালা করিল গমন ;
উভয় সমান জ্ঞান হইল তখন,
নারীর পিরীতি আর বারির লিখন।'

কবিতাটিতে নারীর রূপবর্ণনা ও প্রেমাবেগ প্রকাশে কবি সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, তখনো বিহারীলালের 'সারদা মঙ্গল' (১৮৭৯) প্রকাশিত হয় নাই এবং কবিগান-টপ্পার গৌরব-যুগ মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে অতিক্রান্ত হইয়াছে। কবি কোথাও ইন্দ্রিয়সম্পর্ক-রহিত প্রেমের কথা লেখেন নাই। তথাপি এই বর্ণনায় সংযম ও শুচিতা লক্ষ্য করা যায়। দেবেন্দ্রনাথ সেনের ও রবীন্দ্রনাথের নারীরূপবর্ণনামূলক সনেটগুলির কথা এই কবিতা মনে পড়াইয়া দেয়।

'প্রিয়তমা শ্রীমতী—র প্রতি' কবিতাটিতে কবি তাঁহার কাব্যসাধনার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন :

বড় বড় কবি যাঁরা, বীর-রস-ভক্ত তাঁরা,
সে রসে মজিতে ধনি পারে কি সবাই ?
বহিতে গাণ্ডীব-ভার, পার্থ বিনা সাধ্য কার,
আমি প্রেম-ফুলধনু: কেবল নোয়াই।
মধুর পিরীতি রস— আমি ত ইহারি বশ,
অন্য রস কটু বলে স্পর্শিতে না চাই।
আশা করি ভালবাসা, গাঁথিয়া কোমল ভাষা,
আদি রসে ডুবাইয়া তোমারে যোগাই।

'কাব্যমালা'র প্রতিটি ছত্রে এই উদ্দেশ্যই রূপলাভ করিয়াছে। কবি যে 'মধুর রস' সৃজনেই তাঁহার সকল শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল প্রেমের উত্তেজনা ও আলোক নহে, মধুর বিচ্ছেদের কোমল বেদনাও তাঁহার লেখনীতে ধরা পড়িয়াছে। 'বিচ্ছেদ', 'ভুল না আমায়' ইহার পরিচয়স্থল। 'চুম্বন', 'পয়োধর' কবিতা দুইটিকে গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় কবিতার অগ্রদূত হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই দুইটি কবিতাতেও লক্ষ্য করা যায়, কবি কোথাও ইন্দ্রিয়ের অসংযমকে প্রশ্রয় দেন নাই। 'চুম্বন' কবিতাটিতে সুন্দরীকে কবি প্রশ্ন করিতেছেন :

হেন সাধে প্রণয়িনি কেন সাধি বাদ
'না না না না' বলে, মনে ঘটাও বিষাদ ?

তারপর নিজেই সমাধান আবিষ্কার করিয়াছেন :

তা নয় লো ধনি তব, বুঝিয়াছি ভাব,
চতুরা নবোঢ়াদের এমনি স্বভাব।
আগ্রহ বাড়াতে শুধু না না না কহে,
ফলে তাহা মনোগত অভিপ্রায় নহে।

শেষে কবি এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন :

না না ধ্বনি ধনি তব শুনিব না আর,
মানিব না কোন মতে নিষেধ তোমার ;
তবে কেন সদয় হৃদয়ে রসবতি,
অধীনে চুম্বন দান কর না সম্প্রতি ?

একটি অপ্রত্যাশিত সমাপ্তিতে আমরা চকিত হইয়া উঠি। 'পয়োধর' কবিতাতেও একই মনোবৃত্তি ও সংযম প্রকাশ পাইয়াছে। এইখানে কবির বর্ণনার সংযম ও নৈপুণ্যের চরম পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সুখের বিষয়, কবি ইন্দ্রিয়াসক্তির পরিচয় দেন নাই। বর্ণনার সূচনায় এইরূপ :

অঞ্চলেতে ঢাকা, প্রিয়ে, তব পয়োধর
মেঘাবৃত গিরি প্রায় ছিল শোভাকর।......
এখন অম্বর মুক্ত করি মনঃসাধে
অপূর্ব মোহন ধাম নিরখি অবাধে ;
পীনোন্নত সুকঠিন রজত বরণ।
জিনিয়া ধবল গিরি মনোজ্ঞ গঠন।

শেষে কবির সিদ্ধান্ত :

চন্দনে উহাতে লিখি মকর আকার,
চৌদিগ বেড়িয়া দিব কুসুমের হার ;
পল্লবস্বরূপ ধনি এ কর-পল্লবে
রাখিব ঘটের মুখে কাম-মহোৎসবে।
সিন্দূরের বিনিময়ে নখক্ষতচ্ছটা
অপূর্ব শোভিবে, যেন প্রবালের ছটা।

বলদেব পালিতের এই আদর্শে অনুসৃত কবিতার দেখা শীঘ্রই পাওয়া গেল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কুসুমমালা' কাব্যে এই অনুসরণ লক্ষ্য করা গেল। গোপালকৃষ্ণ ঘোষ এই কাব্যে আরো এক ধাপ অগ্রসর হইলেন। সুন্দরীর হাসির বর্ণনায় তিনি 'হাসি' কবিতায় বলিয়াছেন—

বিধি কি মধুর হাসি দিয়েছে সে বদনে।
সে যে হাসি সুধাময়—
সুধার অধরে রয়—
সরসী-হিল্লোলে যেন মাখা শশি কিরণে—

হাসিতেই যেন বিধি গড়েছে সে কামিনী ;
হাসি তার ওষ্ঠাধরে
হাসি সে কপোলোপরে—
হাসি তার দুটি চক্ষে—খেলে যেন দামিনী।

কিন্তু কবির সাধনা শেষ হয় নাই :

তবু তারে এত করে নারিলাম চিনিতে ;
কত রূপ গন্ধ আলো
থাকি থাকি চমকিল
ঘেরি ঘেরি প্রিয় মুখ লাগিলেক ঘুরিতে,
তবু তারে এত করে নারিলাম চিনিতে।

শেষে কবির দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা :

তার হাসি দিয়ে আমি তারে এবে জেনেছি—
ওই বটে সেই জন—

সেই মোর স্বপ্ন-ধন—
জন্ম জন্ম যারে আমি প্রাণে ভালবেসেছি !

নারীসৌন্দর্য-বর্ণনা যে ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে চলিয়াছে, ইহা তাহার প্রথম প্রমাণ। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হাসি' কবিতাটি উপরি-ধৃত কবিতা অপেক্ষা আরো একধাপ অগ্রসর হইয়াছে। কবিতাটি ('শ্রাবণী' কাব্য, ১৮৯৭) সম্পূর্ণ উদ্ধার করা গেল :

পড়েছে রজতরেখা রক্তিম অধরে,
মরমের ভাষা যেন হয়েছে বিকাশ।
জ্যোছনার স্নেহ যেন গোলাপের পরে
ফুটায়ে দিতেছে তার সুষমা সুবাস।
কোন্ শুভ দিবসের চুম্বনের স্মৃতি
অধরের রাঙিমায় হয়েছে বিলীন ;
কোন্ সুখরজনীর চাঁদের কিরণ
অধর পরশে এসে আপনা বিহীন।
দুইটি তরঙ্গ মাঝে শুভ্র রশ্মিরেখা,
তরঙ্গের গতি যেন গিয়াছে থামিয়া।
দু'টি সুখস্মৃতি যেন আপনা ভুলিয়া
সহসা অধর কোণে মিশেছে আসিয়া।
পড়েছে রজতরেখা রক্তিম অধরে
মরমের ভাষা যেন গিয়াছে গলিয়া।

ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতারচনায় যাহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ তিনজন বিশেষ আলোচনার যোগ্য : হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, গোবিন্দ-চন্দ্র দাস ও দেবেন্দ্রনাথ সেন। অল্পখ্যাত কবিদের মধ্যে ইহারা উল্লেখযোগ্য—

স্বর্ণকুমারী দেবী (কবিতা ও গান : ১৮৯৫) ; মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় (বনপ্রসূন : ১৮৮২) ; আনন্দচন্দ্র মিত্র (মিত্রকাব্য : ১৮৭৪) ; মুন্সী কায়কোবাদ (অশ্রুমালা :) ; বরদাচরণ মিত্র (অবসর : ১৮৯৫) ; প্রিয়নাথ মিত্র (হরিষে বিষাদ :) ; কুঞ্জলাল রায় (মালা : ১৮৯৩) ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (আর্যগাথা : ১৮৮২ ও মন্দ্র : ১৯০২)।

স্বর্ণকুমারী দেবী ইন্দ্রিয়াশ্রিত দাম্পত্যপ্রেমের চিত্র অংকনে সিদ্ধহস্ত। প্রিয়তমাকে হাসিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপনে ও তাহার মূল্য নির্ণয়ে কবি এক নূতন আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন। 'হাস একবার' কবিতাটি ইহার পরিচায়ক। কবি বলিতেছেন :

হাস একবার সখি সে মোহন হাসি !
ভস্মময় হৃদে যাহা ঢালে সুধারাশি।

বিষাদ তিমিরে, সই, একটি আলোক ঐ,
আঁধার সংসারে উহা ধ্রুবতারা মম !······
যতদিন মোর লাগি সোহাগে উঠিবে জাগি,
সখি লো ! অধরে তোর মধুময় হাসি—
ততদিন প্রিয়ে, শোন, আমার হৃদয় মন
সুখ বলি মানিবে লো বিপদের রাশি !

'কেমনে ভুলি', 'ভাবিও না', 'প্রতিদান', 'নহে অবিশ্বাস', 'সে কেমনে চলে যায়', 'যামিনী' প্রভৃতি কবিতায় বিরহের রক্তরাগে মিলনের তীব্রতাকে বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে।

উপরোক্ত অন্যান্য কবিরা প্রেমের বিরহ-মিলনের সুরে তাঁহাদের কবিতার সুর বাঁধিয়াছেন। প্রেমের সরল আকর্ষণের ব্যাকুলতাই সেখানে প্রকাশ পাইয়াছে। ভাব-নিবিড়তা ও আন্তরিকতাই এখানে শেষ কথা। পরবর্তী কালের প্রেমকবিতায় যে জটিলতা, যে পরিধি-বিস্তার, যে রহস্যময় বৈচিত্র্য, জীবনের দুশ্ছেদ্য প্রশ্নসংকুলতার আবরণে প্রেমের যে নব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তাহা এখানে অনুপস্থিত।

ইহাদের মধ্যে একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি মুন্সী কায়কোবাদ। কায়কোবাদের প্রেমকবিতায় এমন একটি আন্তরিক আবেগ ও তীব্রতা আছে যাহা সচরাচর প্রেমকবিতায় মিলে না। উপরন্তু মণ্ডনকলাচাতুর্যে ও শব্দঝংকারে সেগুলি রসসমৃদ্ধ হইয় উঠিয়াছে। 'কে তুমি ?' কবিতাটিতে এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছে :

কে তুমি ?— কে তুমি ?
ওগো প্রাণময়ি
কে তুমি রমণীমণি !
তুমি কি আমার হৃদি-পুষ্প-হার
প্রেমের অমিয় খনি !
কে তুমি রমণী মণি ?

প্রণয়িণীকে নানা বিশেষণে ভূষিত করার মধ্যে কবির অতন্দ্র শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায় :

কে তুমি ?—
তুমি কি চম্পক-কলি ?
গোলাপ মতিয়া বেলী ?
তুমি কি মল্লিকা যূথী ফুল্ল কুমুদিনী ?
সৌন্দর্যের সুধাসিন্ধু,
শরতের পূর্ণ ইন্দু

আঁধার জীবন-মাঝে পূর্ণিমা রজনী !
কে তুমি রমণী মণি ?

শেষকালে কবি তাঁহার প্রণয়িনীকে যেরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের রবীন্দ্রনাথের উচ্চতর কল্পনার কথা মনে করাইয়া দেয়ঃ

কে তুমি ?—
তুমি কি আমার সেই
হৃদয় মোহিনী ?
সেই যদি—কেন দূরে ? এস, এই হৃদিপুরে
এস প্রিয়ে প্রাণময়ি
এস সুহাসিনি !
এস যাই সেই দেশে —ফুল ফুটে চাঁদ হাসে
দয়েলা কোয়েলা গায়
প্রাণের রাগিনী।
জরা নাই—মৃত্যু নাই প্রণয়ে কলঙ্ক নাই
চল যাই সেই দেশে
এস সোহাগিনি !
কে তুমি রমণী মণি ? (অশ্রুমালা)

প্রেমকে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানভূমি হইতে তুলিয়া জরামৃত্যুহীন অকলংক প্রণয়ের স্বপ্ন-জগতে উত্তরণ করিবার পর কবিকল্পনা ক্ষান্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার সার্থক সৃষ্টিরূপে ইহা আমাদের মনোযোগ দাবি করে। মুন্সী কায়কোবাদের শক্তির পরিচয় পাই ‘প্রণয়ের প্রথম চুম্বন’ ও ‘বিদায়ের শেষ চুম্বন’ কবিতা দুইটিতে। প্রথম চুম্বন ও শেষ চুম্বন লাভের অভিজ্ঞতায় যে পার্থক্য তাহা সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছেঃ

প্রথম চুম্বনের অভিজ্ঞতাঃ

মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন !
যবে তুমি মুক্ত কেশে
ফুলরাণী বেশে এসে
করে ছিলে মোরে প্রিয়া স্নেহ আলিঙ্গন।
মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন ?
হায় সে চুম্বনে
কত সুখ দুঃখে কত অশ্রু বরিষণ !
কত হাসি কত ব্যথা,
আকুলতা ব্যাকুলতা,
প্রাণে প্রাণে কত কথা কত সম্ভাষণ !
মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন !

ইহার সহিত শেষ চুম্বনের তুলনা :

বিদায় চুম্বন
উভয়েরি প্রাণে করে অগ্নি বরিষণ,
উভয়ে উভয় তরে
আকুলি ব্যাকুলি করে,
উভয়েরি হৃদিস্তরে যাতনা ভীষণ !
এমনি কঠোর হায় বিদায় চুম্বন !

প্রণয়ের মধুমাখা প্রথম চুম্বনে
শুধু সুখ সমুল্লাস
এতে ঘন হা হুতাশ
কেবলি যে বহে হায় উভয়েরি মনে।

'প্রথম চুম্বনে'র তুলনায় ' শেষ চুম্বন' নিকৃষ্ট কেননা এখানে কল্পনার সমুন্নতি নাই। হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, গোবিন্দ দাস, দেবেন্দ্র সেন প্রভৃতির অভিজ্ঞতার সহিত কায়কোবাদের এই অভিজ্ঞতা তুলনীয়। দৈহিক সম্পর্ককে অসংযমের প্রবাহে কবি ছাড়িয়া দেন নাই ; বিদায়ের অসহ্য জ্বালাতেও চুম্বন-সুখের নিপুণ বিশ্লেষণে কবির আগ্রহ বর্তমান ; ইহা আমাদের বিস্ময়মিশ্রিত প্রশংসা দাবী করে।

এইবার প্রধান তিন কবির ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার আলোচনা করিব।

কবি হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী 'বিনোদমালা' (১৮৭৮) ও 'মালতীমালা' (১৮৯৯) কাব্যে প্রেমের পরিপক্ক অভিজ্ঞতার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। প্রণয়িণীর প্রতি সানুরাগ সম্বোধন, তাহার রূপবন্দনা, বিরহের অসহ মধুর বেদনায় প্রেমের উজ্জল প্রকাশ। ভালবাসা ফুরাইয়া যাওয়ায় অমৃতে গরল লাভের বেদনা ও তজ্জনিত হাহাকার—এসবই কবির সহৃদয় চিত্তে নিপুণভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। 'নিপীড়ন' (মালতীমালা) কবিতায় কবি প্রণয়িনীর নিকট অনুযোগ করিয়াছেন :

এত সাজে সাজিয়াছ কেন রূপেশ্বরি ?
কোমলাঙ্গ রস-মণি-কনক-পীড়নে—
কেন আজি রাখিয়াছ নিপীড়িত করি
ইহাতে কি বাড়িয়াছে শোভা মনোরমে ?

এই বিরোধাভাসের মধ্য দিয়া কবির প্রণয়িণীর রূপ চাতুর্যের সহিত অংকিত করিয়াছেন ; শেষে অনুরোধ করিয়াছেন :

পর, দেবি, শ্বেত সূক্ষ্ম কোমল বসন,
খুলে ফেল, রত্নময় স্নেহ-অলংকার ;

এ নির্দোষ-রূপে নহে মণি সুশোভন,
বিদ্রূপ,—যে চারু কেশে পাঁতি মুকুতার।

'হাসিও না' ('বিনোদমালা') কবিতাটিতে এই একই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

'প্রেম-পূর্ণিমা' ('মালতীমালা') কবিতাটিতে কবি প্রণয়িণীর প্রেমমহিমার বন্দনা গাহিয়াছেন :

যে দিন আসিয়াছিনু, সেই দিন প্রিয়ে!
দেখেছিনু যামিনীর অর্ধ অবসানে,
রেখেছিল নিশি কাল-অঞ্চলে বাঁধিয়ে,
ক্ষয়িত চন্দ্রমা-মণি বিষন্ন বয়ানে!

তারপর আজিকার অমা নিশায় কবির ঘোষণা :

না রহিল চারু চন্দ্র নাহি ক্ষতি তায়,
নাহি কাজ চন্দ্রভাসে রঞ্জিয়া ধরণী ;
থাকুক যামিনী সতী মাখি তমসায়,
মৃদু করে সুধু তারা জ্বলুক এমনি।

সেই তুমি, সেই আমি দেখ বিদ্যমান,
সেই প্রাণ, সেই মন, সুচারু হাসিনি!
জলোচ্ছ্বাসে সেই পদ্মা বহে খরসান,
কি ক্ষতি করিবে তবে অচন্দ্রযামিনী।

এই অচন্দ্রযামিনীতে প্রেয়সীর রূপের নব নব প্রকাশ ও প্রেমের অপরাজিত মহিমার কথা ঘোষণা করিয়া কবি এই সিদ্ধান্তই করিতেছেন :

বলেছিলে তুমি সেই,—গত বহুক্ষণ,
'জ্যোৎস্না রাতি নহে, নিশি ভরা অন্ধকারে,'
ভেবেছিলে হেরি বুঝি অচন্দ্র গগন,
তিমিরে নাহিক সুখ কানন বিহারে!
কিন্তু কত সুখ তাহে বুঝিলে এখন,
অচন্দ্র সচন্দ্র নিশি সকলি সমান ;
পূর্ণ জোয়ারের জল বহিছে যখন,
কেমনে সে জলস্রোত বহিবে উজান?

'অমৃতে গরল' ('বিনোদমালা') ও 'বিদায়' ('মালতীমালা') কবিতা দুইটিতে কবি বিদায়কালে—প্রেমের নবলব্ধ গৌরবপূর্ণ বিদায়ের লগ্নে এবং হৃতপ্রেম হতাশাপূর্ণ বিদায়ের লগ্নে—প্রেমিকের মনে যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া হয়, তাহাই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া উপস্থিত করিয়াছেন।

'অমৃতে গরল' কবিতায় হৃতপ্রেমের হতাশা আশ্চর্য সংযমের সহিত চিত্রিত হইয়াছে :

এতদিনে বুঝি সখি ফুরাল প্রণয় রে !
এ প্রাণের সাধ যত,
ফুরাইল অবিরত,
এতদিনে আজি প্রিয়ে আঁধার হৃদয় রে !

প্রেমিকের মর্মবেদনার তীব্র অভিব্যক্তি :

তুমি ত ভুলিলে প্রিয়ে আমি কি তা পারিব ?
যতদিন তিন বেলা
সংসারে করিবে খেলা,
ততদিন নিশিদিন আঁখি নীরে ভাসিব ,
ততদিন প্রাণেশ্বরি !
থাকিব মরমে মরি,
হৃদয় ভাণ্ডার-মাঝে স্বধু দুঃখ ভরিব ।

এই বেদনার জ্বালাময় অভিব্যক্তি, আন্তরিকতা ও আবেগ আমাদের মনকে স্পর্শ করে ; শেষে কবির সিদ্ধান্ত আমাদের অভিভূত করে :

প্রণয়বিরহে জ্বলি,
যখন যাইব চলি,
অনন্ত সুখের ধাম পরমার্থ ভুবনে ;
তখন আসিয়া প্রিয়ে ।
মৃতকায়া বুকে নিয়ে,
মধুময়ী প্রেমকথা শুনাইও শ্রবণে ।

কবি এখানেই সান্ত্বনা খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন। কিন্তু 'বিদায়' কবিতায় কবি ব্যর্থ হইয়া চলিয়া যাইতেছেন না ; এখানে প্রেমের নবলব্ধ গৌরব না হারাইয়াই কবি বিদায় ভিক্ষা করিতেছেন। সূচনাতেই কবির প্রার্থনা :

আর নয়, বিদায় লো ! যাই এইবার।
সুরক্ত অধরোপরি
বিদায় চুম্বন করি,
চাপিয়া উরসে বর শ্রীঅঙ্গের ভার
হাসিয়া বিদায় দাও প্রেয়সি আমার।

কল্পনার সমারোহ ও শব্দের ঐশ্বর্য এখানে কবির প্রীতিপ্রসন্ন চিত্তের স্বাক্ষর রাখিয়াছে। তাই বিদায়বেলাতেও প্রকৃতির সৌন্দর্য কবির চোখ এড়ায় নাই :

যাই তবে, যায় নিশি চঞ্চল চরণে ;
সন্ধ্যায় আঁচল ভরি

তুলিলে যতন করি—
কত বেল, কত যূঁই বকুলের সনে,
ফুটাইলে সুরভিত-শ্বাস-পরশনে।

এ বিদায়ে পুনর্মিলনের আশ্বাস রহিয়াছে; তাই পূর্ব কবিতার অসহ্য মর্মজ্বালা এখানে অনুপস্থিত :

যাই তবে, যামিনী যে পোহাবে এক্ষণে,
আবার মিলিব আসি,
আবার এ পৌর্ণমাসী
নিরখিব সৌধ-শিরে বসিয়া দু'জনে,
প্রকৃতির শান্ত শোভা দেখিব কাননে।

বিদায়কালে তাই কবির আনন্দময় প্রত্যাশা :

যাই তবে, নিয়ে যাই বিদায়ের কালে,—
অই দেহ সুরভিত
ফুল গন্ধে সুবাসিত,
সেই বাসে সুগন্ধিত করি দেহ মন,—
সেই গন্ধ প্রিয়ে! তব প্রেম নিদর্শন।

প্রেমিক-চিত্তের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিপুণ রূপায়ণে হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস বাংলাকাব্যজগতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও সারল্যের জন্য বিখ্যাত। কবির সমগ্র জীবন নিদারুণ সংগ্রামের ইতিহাস। কঠোর দারিদ্র্য, যন্ত্রণাকর ব্যাধি, শোকের আঘাত, জন্মভূমি হইতে বিতাড়ন, জমিদারের শত্রুতা ও প্রাণহানির আশংকা —ইহাতেই তাঁহার জীবন পরিপূর্ণ। সেইজন্য তাঁহার পক্ষে কখনও নিশ্চিন্ত হইয়া কাব্যসাধনা করা সম্ভব হয় নাই। আর যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে বহির্জগতের এই সকল ঘটনা ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। তাই গোবিন্দ দাসের কাব্যে হতাশা ও নিরাশা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। হরিশ্চন্দ্র মূলতঃ প্রেমের কবি ছিলেন, কিন্তু গোবিন্দ দাস তাহা নহেন। শোকসংগীত, বিদ্রূপাত্মক কবিতা, সমাজবিষয়ক কবিতা, অধ্যাত্ম কবিতা, প্রকৃতি-কবিতা, দেশভক্তিমূলক কবিতা রচনার সঙ্গে তিনি কিছু প্রেমকবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। বাল্যপ্রেম ও পত্নীপ্রেম, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের এই দুইটি বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই কবি প্রেম-কবিতা রচনা করিয়াছেন। এসকল কবিতায় গোবিন্দ দাসের বৈশিষ্ট্য বর্তমান আছে। সেই তীব্র অসংস্কৃত সারল্য, সেই দুর্মর হৃদয়াবেগ, নারীর প্রতি সেই বিচিত্র আকর্ষণ সবই এখানে প্রতিফলিত হইয়াছে। 'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৮), 'কুঙ্কুম' (১৮৯২), 'কস্তুরী' (১৮৯৫) ও 'চন্দন' (১৮৯৬) কাব্যের প্রেমকবিতাগুলিতে এই তীব্রতা ও সারল্যের পরিচয় রহিয়া গিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর যে সকল বাঙালি কবি প্রেমকবিতা লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে ইংরাজী প্রেমকবিতার দ্বারা প্রভাবিত। ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা অনাধুনিক বাংলা কাব্যে ছিল না, ইহাই তাহার প্রমাণ। একমাত্র ব্যতিক্রম গোবিন্দচন্দ্র দাস। গোবিন্দ দাসের প্রেমকবিতায় ইংরাজী প্রভাব একেবারেই নাই। সেইজন্যই রূপকর্মের প্রতি অমনোযোগ, শব্দচয়নে শৈথিল্য, আবেগের অসংস্কৃত রূপ, প্রেমপ্রকাশে অকাব্যোচিত তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। তথাপি ইন্দ্রিয় ও আবেগ, এই দুই ক্ষেত্রে গোবিন্দ দাসের স্বাভাবিক অধিকার ছিল, যাহার ফলে তিনি সফল ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আধ্যাত্মিকতাবর্জিত মানবিক আবেগ ও বলিষ্ঠ দেহানুগত্য—গোবিন্দ দাসের প্রেমকবিতার দুইটি প্রধান লক্ষণ।

দেহ-মনের আবেগ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশে সংকোচহীন কবি বলিয়াছেন :

আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ,
অমৃত সকলি তার—মিলন বিরহ
বুঝিনা আধ্যাত্মিকতা,
দেহছাড়া প্রেমকথা,
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ।

এই স্পষ্ট স্বীকৃতিই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। দেহাশ্রয়ী হইয়াও এই সকল কবিতা দেহসর্বস্ব নয়, তাহার প্রমাণ :

আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ
আজো তার ভস্ম ছাই, বুকে মেখে চুমা খাই
আজো সে গায়ের গন্ধ বহে গন্ধবহ।
আনন্দ উল্লাসে খুলি আজো তার চুলগুলি
গলায় বাঁধিয়া আহা জুড়াই বিরহ।

এইভাবে কবি দেহকে আশ্রয় করিয়াই এক নবরসের চেতনায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

'প্রেম ও ফুল' এবং 'কুঙ্কুম' কাব্যের প্রেমকবিতায় যে অনবধানতা ও অপরিণতি লক্ষ্য করা যায়, আহা পরবর্তী 'কস্তুরী' ও 'চন্দন' কাব্যে নাই। কয়েকটি কবিতা আলোচনা করিলেই ইহা প্রমাণিত হইবে এবং গোবিন্দচন্দ্রের প্রেমকবিতার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িবে। 'রমণীর মন' ('প্রেম ও ফুল') কবিতাটিতে নারীমনের রহস্য উদ্‌ঘাটন প্রয়াস প্রশংসা দাবি করে :

রমণীর মন,
কি যে ইন্দ্রজালে আঁকা, কি যে ইন্দ্রধনু ঢাকা,
কামনা-কুয়াশা-মাখা মোহ- আবরণ,

কি যে সে মোহিনী মন্ত্র রয়েছে গোপন!
কি যে সে অক্ষর দুটি, নীল নেত্রে আছে ফুটি,
ত্রিভুবনে কার সাধ্য করে অধ্যয়ন?

বাল্যসখীর প্রতি কবির মোহ কয়েকটি কবিতার উৎস, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। 'পরনারী' (কুঙ্কুম) কতিাটিতে এই বাল্যপ্রেমের পরবর্তী মূল্যায়নে কবিহৃদয়ের অন্তর্জ্বালা ও অসহায়তা সুন্দর প্রকাশ লাভ করিয়াছে। কবি আবেগকম্পিত হৃদয়ে বলিতেছেন :

আজ, সে যে পরনারী!
কেন তবে বল চাঁদ, দেখাও সে মুখ-ছাঁদ,
সে নবলাবণ্য আভা—সুষমা তাহারি?
কেন নিতি নিতি আসি, দেখাও তাহারি হাসি।
হৃদয়-সমুদ্র সে কি সামালিতে পারি?
সে যে পরনারী।......

সে যে পরনারী!
তারি আলিঙ্গন দিয়া, ধরিও না জড়াইয়া,
যদিও—যদিও 'কুসু' আছিল আমারি,
ছুঁয়োনা লতিকা কেহ, আমার এ পাপ-দেহ,
জনমের মত আজ দোঁহে ছাড়াছাড়ি!
সে যে পরনারী।

তাই কবি এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন :

সে যে পরনারী!
যত কিছু উপহার সব অপবিত্র তার,
মিলনের স্বর্গ সেও নরক আমারি;
কেবল পবিত্রতম, তার সে বিরহ মম
যজ্ঞীয় অনলসম প্রাণদাহকারী!
পুড়িয়া হইতে ছাই, আদরে নিয়েছি তাই
হেন প্রেম উপহার ভুলিতে কি পারি?
কহিও সে কুসুমেরে সে যে পরনারী!

'কুসুমে'র প্রতি তীব্র আসক্তিকে কবি এইভাবে নিজ মৃত্যুসংকল্পে পরিবর্তিত করিয়াছেন। কবিহৃদয়ের তীব্র অসংস্কৃত দুর্মর প্রেমাবেগ এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।

'সারদা ও প্রেমদা' (কস্তুরী) কবিতাটি পবিত্র পত্নীপ্রেমের উপর স্থগিত। প্রথমা স্ত্রী সারদা গত হইলে কবি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। প্রথমা সারদা ও দ্বিতীয়া প্রেমদার আকর্ষণ-বিকর্ষণে কবিচিত্তের যে দ্বন্দ্ব তাহা এখানে নিপুণভাবে ফুটিয়াছে :

সারদা পশ্চিমে ডুবে প্রেমদা উঠিছে পূবে
জীবন-গগন মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া
অপূর্ব সুন্দরী উষা অপূর্ব সন্ধ্যার ভূষা
পৃথিবীর দুই প্রান্ত উঠিছে প্লাবিয়া !

কিন্তু কবি দুই স্ত্রীর এই দ্বন্দ্বে শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই :

কিবা ঘুম কিবা জাগা, দুজনে পিছনে লাগা,
পারি না তিষ্ঠিতে বড় পড়েছি ফাঁপরে
একটু নাহিক স্বস্তি, জ্বালায়ে ফেলিল অস্থি,
হায় ! হায় ! লোকে কেন দুই বিয়া করে ?

এই কবিতাগুলিতে উপলক্ষ্যের ছাপ রহিয়া গিয়াছে, ইহা উত্তীর্ণ হইবার সাধ্য গোবিন্দচন্দ্রের ছিল না ; ফলে এগুলি শিল্পোত্তীর্ণ হয় নাই।

'এই এক নূতন খেলা'(কস্তুরী) কবিতাটি কৈশোর-প্রেমের নিপুণ আলেখ্য। সমগ্র কবিতাটি একটি তরল পরিহাসের সুরে পূর্ণ। যেমন,

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি এই এক নূতন খেলা।......
পুতুল টুতুল রেখে দিয়ে
চল বকুলের বনে গিয়ে
বৌ বৌ বৌ খেলি মোরা ফুলল সন্ধ্যা বেলা
আয় বালিকা খেলবি যদি এই এক নূতন খেলা......
আয় বালিকা খেলবি যদি এই এক নূতন খেলা !
'না ভাই তুমি দুষ্টু বড়
একটি বলে আরটি কর,
ফাঁকি দিয়ে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে গেলা !'
চুপ্‌ চুপ্‌ চুপ কস্‌নে কারে—এই এক নূতন খেলা !

কেবল তরল পরিহাস নহে, পত্নীর অন্তর্ধানে সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে শূন্যতাবোধ আচ্ছন্ন করে, তাহার পরিচয়ও এ কাব্যে আছে। আপাত-অস্বীকৃতির মধ্য দিয়া কবি নারীপ্রেমের জয় ঘোষণা করিয়াছেন ; লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ইহাতেও ইন্দ্রিয়দৃষ্টি অনুপস্থিত নহে। 'সামান্য নারী' (কস্তুরী) কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করা যাক :

সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ ?
শূন্য করে গেছে যেন সমস্তটা প্রাণ।
একটু গিয়াছে হাসি,
একটু গিয়াছে কান্না,
একটু আঁখির জলে মাখা অভিমান !
একটু চুম্বন গেছে,
একটু নিঃশ্বাস দীর্ঘ,

একটুকু আলিঙ্গন তৃণের সমান !
যা গেছে, সে ক্ষুদ্র গেছে,
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আছে,
তবে যে ভরে না কেন তার শূন্য স্থান ?
সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ ?

'চন্দন' ও 'কস্তুরী' কাব্যের অন্যান্য প্রেমকবিতার মধ্যে পুরুষচিত্তের উপর নারীর প্রবল অধিকার কবি কখনো পূর্ণ আত্মনিবেদন, কখনো বা সবল অস্বীকৃতির মধ্য দিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই স্বীকৃতি অস্বীকৃতির বিচিত্র টানা পোড়েনের মধ্য দিয়া কবি ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমেরই জয় ঘোষণা করিয়াছেন। দুইটি উদাহরণে এই বিপরীত ভাব পরিস্ফুট হইবে। 'দিনান্তে' (কস্তুরী) কবিতায় কবির ব্যাকুল প্রার্থনা :

দিনান্তে দেখিতে দিও চারু চন্দ্রানন,
ভরিবে এ শূন্য বুক শূন্য প্রাণময় !
আরো যে বাসনা আছে,
বলিব আসিলে কাছে,
কি কাজ আগেই তাহা বলিয়া এখন ?
না, না, না, ও তীক্ষ্ণধার,
বুকে ঢাকা তরবার
পারিনা যে না বলিয়া কেটে যায় মন !
প্রাণের লুকানো কথা—'একটি চুম্বন !'

অপরপক্ষে 'শত্রু' ('চন্দন') কবিতায় নারীর প্রতি কবির অভিযোগ ও প্রবল অস্বীকৃতি ঘোষণা :

পুরুষের তীক্ষ্ণ অসি, তীক্ষ্ণ তরবার
অমৃত মরণে করে যাতনা উদ্ধার।
নারী করে গুপ্তহত্যা আঁখির আঘাতে,
অনন্ত বিষাক্ত মৃত্যু ঢেলে দিয়া তাতে।
জীবনের দিন দণ্ড পল অনুপল,
মরণ মরণ মম মরণ কেবল,
মৃত্যুময় এ জীবন বহিতে না পারি,
রমণী আমার শত্রু, আমি শত্রু তারি।

বাহ্যত অস্বীকৃতি ও বিরোধাভাসের মধ্য দিয়া নারীপ্রেমের নিকট আত্ম-নিবেদনের এই বিশিষ্ট ভঙ্গিমা গোবিন্দ দাসের এই সকল ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতাকে একটি স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে।

এইবার ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার প্রধান কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতা আলোচনা করিব। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা

ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের স্থান সর্বাগ্রে। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় দেখা যাইবে এই শ্রেণীর প্রেমকবিতা কোন্ পরিপক্ব পরিণতি লাভ করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ একান্তভাবে অন্তরলোকের কবি। বস্তু ও বাহির বিশ্বের ভ্রূক্ষেপহীন ভাবতান্ত্রিক কবি হিসাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠা। যুগপ্রভাব তাঁহার পক্ষে ব্যর্থ হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-পিপাসা অতিমাত্রায় আবেগপূর্ণ, নিজ ভাবস্বপ্নে বিভোর। এক্ষেত্রে বিহারীলালের সহিত তাঁহার কতকটা মিল আছে। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে প্রবল রূপতৃষ্ণা লক্ষ্য করা যায়। তাহা ছাড়া আর একটি বিষয় এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথের রূপ-কল্পনায় ধ্যানের নিবিড়তা ছিল না, নেশার মত্ততা ছিল; সচেতনতা ছিল না, তীব্র মাদকতা ছিল; বস্তুচেতনার প্রধান্য ছিল না, ভাবাবেগের বিহ্বলতা ছিল। ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতাগুলি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য-জীবনের মধ্যাহ্নে রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পর তিনি আদর্শান্বিত প্রেমকবিতা ও নারীবন্দনা রচনার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। 'অশোকগুচ্ছ' (১৯০০) কাব্যেই ইন্দ্রিয়াশ্রিত কবিতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কীট্‌সের প্রথম যুগের কবিতার সহিত এই কাব্যের অনেক কবিতার মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এখানে স্বভাবতই মনে পড়ে এই কবিতাগুলি: 'And what is Love?' 'I cry your mercy,' 'You say you love,' 'O blush not so'। কীট্‌সীয় রূপতৃষ্ণা দেবেন্দ্রনাথের 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যে আবিষ্কার করা কঠিন নহে। দেবেন্দ্রনাথের কবিকল্পনার চরিত্রই ছিল দুর্বার গতি-সম্পন্ন। সৌন্দর্যের আরতিতে দেবেন্দ্রনাথের কবিকল্পনা সমস্ত উপচার নিবেদন করিয়াছে। কিন্তু এই আরতি তিনি করিয়াছেন সৌন্দর্যের মন্দিরে ধ্যানাসনে থাকিয়া নহে, স্বাভাবিক ভাবাবেগের খর প্রবাহে তরণী ভাসাইয়া দিয়া আর্টের সংযম তিনি অভ্যাস করেন নাই, অথচ কবি-প্রকৃতির পূর্ণশক্তিবলে তিনি সংযমকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বহিরিন্দ্রিয় সজাগ ও রূপতৃষ্ণা প্রবল ছিল বলিয়াই দেবেন্দ্রনাথের প্রেমকবিতায় ইন্দ্রিয়াশ্রয় লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু কোথাও ইন্দ্রিয়াসক্তি ঘটে নাই।

দেবেন্দ্রনাথ যে রূপের পূজারী, তিনি নিজমুখেই সে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন:

চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি
রূপের পূজারী
সারাসন্ধ্যা সারানিশি রূপ বৃন্দাবনে
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি।
অধরে রঙ্গের হাস বিদ্যুতের পরকাশ,
কেশের তরঙ্গে নাচে নাগের কুমার।
বাসন্তী ওড়োনা-সাজে প্রকৃতি-রাধিকা নাচে,
চরণে ঘুঙ্গুর বাজে আনন্দে ঝঙ্কারি।

নগনা দোলনা কোলে মগনা রাধিকা দোলে
কবিচিত্তে কল্পনার অলকা উযারি'—
আমি সে অমৃত-বিষ পান করি অহর্নিশ,
সংসারের ব্রজবনে বিপিনবিহারী।

তাঁহার এই পরিচয়ই সুপরিচিত 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যে বিধৃত হইয়াছে। নারীকে তিনি এই সময় সৌন্দর্যের প্রতিমা রূপে গ্রহণ করিয়াছেন; নারী-রূপের আরতি করিয়াছেন—সে আরতি অসহ্য হর্ষ-মিশ্রিত উন্মত্ত আরতি। নারীরূপের প্রতি কবির তীক্ষ্ণ সজাগ নেশামত্ত আকাঙ্ক্ষা অসহ্য আবেগের পথে প্রকাশ পাইয়াছে; ইন্দ্রিয়ের অতিরেক নাই। "এখানে লালসাও মহত্তর—তাহা পদ্মের ন্যায় বিশদ, ধূপের ন্যায় সুরভি, গোলাপের ন্যায় রক্তবর্ণ।" (মোহিতলাল মজুমদার, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', পৃঃ ১৯৮)।

দেবেন্দ্রনাথ একেবারে গোড়ার যুগের রচনায় নারীরূপের যে আরতি করিয়াছেন, তাহাতে আবেগের এই অসহ্যতা ও উন্মত্ততা ছিল না, তাহা পরে আসিয়াছে। 'দর্পণ পাশে' ('নির্ঝরিণী': ১৮৮১) কবিতায় কেবল রূপের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, ভোগের অসহ্য তৃষ্ণা তখনো আসে নাই। কবি এই কবিতায় বলিতেছেন ঃ

ভাল করি আসি দাঁড়াও রমণি,
ও মুখ-কমল হেরিব আজিকে
ফুটিত দর্পণে চারুচন্দ্রাননি ;
শ্বেতদূর্বা জিনি ও শোভন অঙ্গ
নিরখিব আজি মানস ভরিয়া,
দর্পণের আগে দাঁড়াও আসিয়া।···
দর্পণ ভিতরে চিত্রিত যে ছবি,
এ ছবি তুলনা কে দিবে রে বল ?
এ ছবি বর্ণিতে পারে না'ক কবি।
কাছে এস প্রিয়ে, মুখে মৃদুহাসি,
তাকাও সুমুখি মোর মুখ পানে,
তোমার তুলনা তুমিই ভুবনে।

এখানে কেবল 'তাকাও সুমুখি মোর মুখ পানে', কিন্তু ইহার দুই দশক পরে প্রকাশিত সুপরিচিত 'অশোকগুচ্ছ' (১৯০০) কাব্যগ্রন্থে কবির দাবী আরো বাড়িয়া গিয়াছে ; সেখানে অসহ্য হর্ষ, ব্যাকুল তৃষ্ণা ও উন্মত্ত আবেগ।

নারীরূপবর্ণনা, রূপসম্ভোগ ও রূপকামনার বিচিত্রতর প্রকাশ ঘটিয়াছে 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যে। এই কাব্যে প্রকৃতি-বর্ণনাও এই একই সুরের। নারীরূপবর্ণনায় যে রূপসম্ভোগেচ্ছা ও ইন্দ্রিয়-উপাসনা লক্ষ্য করা যায়, তাহা প্রকৃতি-বর্ণনাতেও উপস্থিত। দুইটি কবিতা এখানে উল্লেখ করিব প্রকৃতি-

কবিতা হিসাবে নহে, প্রেমকবিতা হিসাবেই। 'অশোকফুল' ও 'বকুল' এই দুইটি কবিতায় দেবেন্দ্রনাথের কাব্যবৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'অশোকফুল':

কোথায় সিন্দুর গাঢ়—সধবার ধন?
আবীর কুঙ্কুম কোথা গোপিনী-বাঞ্ছিত?
কোথায় সুরীর কণ্ঠ আরক্ত-বরণ?
কোথায় সন্ধ্যার মেঘ লোহিতে রঞ্জিত?
কোথায় বা ভাঙে-রাঙা রুদ্রের লোচন?
কোথা গিরিরাজ-পদ অলক্তে মণ্ডিত?
মদন-বধূর কোথা অধরের কোণ—
ব্রীড়ার বিক্ষেপে হায় সতত লোহিত?
সকলেরই কিছু কিছু চারুতা আহরি'
ধরি রাগ অপরূপ গাঢ় ও তরল,
গুচ্ছে গুচ্ছে তরুবরে করিয়া উজ্জ্বল
রাজিছে অশোকফুল, মরি কি মাধুরী!
চৈত্র আর বৈশাখের অনিন্দ্য গরিমা—
হে অশোক, ও রূপের আছে কিরে সীমা?

'বকুল':

ফেলিয়া দিয়াছি বাসি মালতীর মালা
চম্পক অঙ্গুলিগুলি ঘুরায়ে ঘুরায়ে?
গাঁথিছ বকুল হার বিনায়ে বিনায়ে?
শেষ না হইতে মালা ওই দেখ বালা,
তোমার অলকগুচ্ছ হয়েছে উতলা
মালা-গাঁথা শেষ হ'লে পাইবে সম্পদ,
তাই বুঝ উরসের যুগ্ম কোকনদ
সরসে নলিনীসম হয়েছে চঞ্চলা?
আমিও কুসুম সখি, সারাটি যামিনী
সঞ্চিয়াছি তব লাগি' রূপ ও সৌরভ,
লভিতে এ পুষ্পজন্মে বিভব গৌরব,—
হ্যাদে দেখ, কি উতলা হয়েছি সজনি!
চিকণিয়া গাঁথিতেছ বকুলের মালা—
আমারেও ওই সাথে গেঁথে ফেল বালা!

বাংলা কাব্যে এমন সহজ, গভীর, স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রবল ইন্দ্রিয়ানুভূতি আর কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। পূর্বেই বলিয়াছি তিনি ভাবে বিভোর, আবেগে উন্মত্ত, প্রকাশে বাঁধনছেঁড়া। কবি বলিয়াছেন—

'দুর্জ্জয় বানের মুখে ভাসাইয়া দিব সুখে
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন!'

এই রহস্যাবিষ্কারে তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। নারীর রহস্যসন্ধানে যাত্রা করিয়া শেষ পর্যন্ত ইহার নিকট নতি স্বীকার করিয়া নারীকে সম্বোধনান্তে কবি বলিতেছেন :

যাদুকরি, তুই এলি—
অমনি দিলাম ফেলি
টীকা ভাষ্য ;—তোর ওই চক্ষু দীপিকায়
বিদ্যাপতি মেঘদূত সব বুঝা যায়!
শব্দ হয় অর্থবান,
ভাব হয় মূর্তিমান,
রস উথলিয়া পড়ে প্রতি উপমায়!
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায়?

(যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায়' : 'অশোকগুচ্ছ')

অবশেষে কবি নারীরহস্য উন্মোচনের দ্বার খুঁজিয়া পাইয়াছেন। চুম্বনেই এ রহস্য ধরা পড়িয়াছে। চুম্বনের উপর আমরা তিনটি কবিতা পাই। 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যে একটি—'দাও দাও একটি চুম্বন', 'গোলাপগুচ্ছ' কাব্যে দুইটি—'প্রথম চুম্বন', 'শেষ চুম্বন'। রবীন্দ্রনাথ ও ও হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর এই ধরণের কবিতার সহিত তুলনায় দেবেন্দ্রনাথের কাব্যবৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। 'দাও দাও একটি চুম্বন' কবিতায় কবির তীব্র তৃষা ও অসহ্য আবেগ ধরা পড়িয়াছে :

পশে যবে রবিকর পদ্মের উরসে,
তরল কনক সেই শিশির পরশে,
লাজ-রক্ত-শতদল, প্রাণবৃন্তে ঢল ঢল,
সর্বস্ব বিলায়ে ফেলে চিত্তের হরষে।
তেমতি, তেমতি তুমি, বৈশাখী চুম্বনে চুমি,
লও, লও, (আঁখি মোর আসিছে মুদিয়া,)
প্রাণের মদিরা মম গণ্ডূষে শুষিয়া।
দাও, দাও, একটি চুম্বন—
মিলনের উপকূলে সাগর-সঙ্গমে,
দুর্জয় বানের মুখে, দিব ভাসাইয়া সুখে,
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন,
দাও, দাও, একটি চুম্বন।

'গোলাপগুচ্ছ' কাব্যে কবি এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন। 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যে কবির ধারণা একটি চুম্বনেই তিনি দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবনকে

আবিষ্কার করিতে পারিবেন ; সেখানে কবির গভীর তৃষ্ণা, ব্যাকুল কামনা, অসহ্য আবেগ। 'গোলাপগুচ্ছ' পর্কে কবির এই দৃষ্টি পরিবর্তিত হইয়াছে। এই নারীবিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া কবির সৌন্দর্য-কল্পনার পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা আদর্শায়িত প্রেমকবিতায় পরিণত হইয়াছে। এখানে তাই নারীপ্রেম দাম্পত্যপ্রেমে পরিণতি লাভ করিয়াছে— পিপাসার পরিবর্তে তৃপ্তি, অভাবের পরিবর্তে ভোগ, বিরহের পরিবর্তে মিলন, ব্যথার পরিবর্তে সুখ দেখা দিয়াছে। আদর্শায়িত প্রেমকবিতা হিসাবে আমরা পরে এগুলির বিস্তৃত আলোচনা করিব।

ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার আরেক রূপ লক্ষ্য করা যায় বলেন্দ্রনাথের কবিতায়। 'মাধবিকা' (১৮৯৬) ও 'শ্রাবণী' (১৮৯৭) কাব্যে বলেন্দ্রনাথের প্রেমকবিতা সংকলিত হইয়াছে। তরুণ মানসের রূপতৃষ্ণা, পৃথিবী ও মানুষের প্রতি বস্তুগত আকর্ষণ হইতে বলেন্দ্রনাথের প্রেমকবিতার জন্ম। বলেন্দ্রনাথের কবিতায় দেবেন সেনের যৌবনের অসহ্য হর্ষ ও উল্লাস অনুপস্থিত ; আত্মকেন্দ্রিক স্বগতোক্তিমূলক প্রেমপিপাসার প্রকাশেই ইহার ক্ষান্তি। নারীর দেহলাবণ্য বর্ণনায় বলেন্দ্রনাথ উৎসাহ আছে, কিন্তু তিনি সান্নিধ্য পরিহার করিয়া দূর হইতে নারীকে দেখিয়াছেন। 'কলবেদনা' কবিতায় ইহার পরিচয় পাই—

'আমারে বাঁধিয়া লহ কটিতটে তব
হে সুরসুন্দরি, চারু অঙ্গে অভিনব
রহিব সন্নদ্ধ ওই বসনের মত
তনুখানি সযতনে সম্বরি সতত
মোর স্বচ্ছ জলধারে।'

গোবিন্দচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের আত্মহারা প্রেমোন্মাদনা বলেন্দ্রনাথের নাই, আছে সৌন্দর্যলোভী মুগ্ধ কবির মৃদু ভ্রমরগুঞ্জন। দেহরূপের সত্য উদ্‌ঘাটনে কবির সাহস নাই, কল্পনায় ব্যক্তিগত চেতনার রঙে দেহলাবণ্য রঞ্জিত করাতেই বলেন্দ্রনাথের সকল উৎসাহ ব্যয়িত হয়। 'মাধবিকা' কাব্যের নিম্নধৃত সনেটটি বলেন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত করে :

পঞ্চ ঋতু থাক প্রিয়ে যাহে খুসী যার,
মধুমাস থাক প্রিয়ে তোমার আমার।
শুধু এই যৌবনের অনন্ত উচ্ছ্বাস
অনুরাগ রঙ্গে ভরা নিত্য নব আশ,
এই তন্দ্রা, এই স্বপ্ন, এই নিশিশেষ,
এই মনোমোহকর মদির আবেশ,
শুধু এই মুকুলিত আম্রকুঞ্জবন,
গন্ধভরা দিশাহারা প্রভাত পবন,
শুধু এই পত্রে পত্রে মধুর মর্মর

কুঞ্জে কুঞ্জে মুখরিত সংগীত নির্ঝর,
এই স্বচ্ছ নীলাকাশ, কুলু কুলু নদী,
এই বর্ণ, এই গন্ধ, গীতি নিরবধি
এই প্রাণ, এই প্রেম, এ পূর্ণ পুলক
থাক যতক্ষণ থাকে দিনের আলোক।

রবীন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা 'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে আছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমোক্ত কাব্যের 'রাহুর প্রেম' ও দ্বিতীয়োক্ত কাব্যের 'বাহু', 'চুম্বন' প্রভৃতি কবিতা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

॥ ৩ ॥

আদর্শায়িত প্রেমকবিতা

আদর্শায়িত প্রেমকবিতা যে ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার এক ধাপ উপরে তাহা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কবিরাও জানিতেন। বৈষ্ণব পদাবলী এই উচ্চ কোটির প্রেমকবিতার সুন্দর পরিচয়স্থল। যথার্থ ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা প্রাচীন বাংলা কাব্যে ছিল না, কিন্তু আদর্শায়িত প্রেম-কবিতার কোনদিনই অভাব ঘটে নাই।

বৈষ্ণবপ্রেমকবিতার জন্মকোষ্ঠীতে প্রাকৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তাহাই শেষ। জীবনে সে অধ্যাত্ম-পরিচয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবপ্রেমকবিতা অধ্যাত্ম-রসে জারিত হইয়া পরিশুদ্ধি লাভ করিয়াছিল বলিয়াই তাহার ঊর্ধ্বায়ন সম্ভব হইয়াছিল। তাই রাধাকৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত ব্রজের গোপপল্লীর কিশোর কিশোরী মাত্র ছিলেন না এবং তাহাদের কামক্রীড়া প্রাকৃত অর্থে আবদ্ধ ছিল না। কৃষ্ণ 'রসিক-শিরোমণি' ও রাধা 'মহাভাব-স্বরূপিণী' হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা বৈষ্ণব পদাবলীতে মিশিয়া গিয়াছে—উহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখা যায় না। রূপসম্ভোগ-প্রধান প্রেমকবিতার বর্ণোচ্ছ্বাস অতীন্দ্রিয় প্রেমের পারাবারে আসিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে।

আধুনিক যুগের কবিরা এই ভাবে প্রেমের ঊর্ধ্বায়ন ঘটাইতে পারেন নাই, তাঁহাদের কাব্যভাবনা আধ্যাত্মিক অনুশাসনের দ্বারা চালিত হয় নাই।

আধুনিক বাংলা কাব্যে আদর্শায়িত প্রেমকবিতার সূচনা হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। এই বৎসর বিহারীলালের 'সংগীত শতক' প্রকাশিত হয়। একাব্যে কেবল প্রেমকে নয়, প্রেমিকাকে কবি আদর্শায়িত রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, বাস্তব জগতে প্রেমের কোন লৌকিক প্রতিষ্ঠাভূমি নাই; অন্তর্জগতেই প্রেমের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। এখানেই আদর্শায়িত প্রেমকবিতার যাত্রা শুরু হইল।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে—যখন মধুসূদনের প্রবল প্রতাপ—তখন বিশুদ্ধ আদর্শায়িত প্রেম-গীতিকবিতা (Idealistic Love-lyrics) রচনা করিয়া বিহারীলাল পথিকৃতের দুর্লভ সম্মান লাভ করিয়াছেন। বিহারীলালের 'সংগীতশতক' (১৮৬২) দুইটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই কাব্যে প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির নিজস্ব আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন কবিতার দেখা পাই ; সঙ্গে সঙ্গে আদর্শায়িত প্রেম-কবিতারও দেখা পাই। প্রেমের বিচিত্র রূপ বর্ণনায়, বন্দনাগানে, প্রেয়সীর প্রতি অনুরাগপূর্ণ আত্মনিবেদনে কবিহৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। সূচনাতেই দেখি কবির সেই প্রেম-অন্বেষণ :

কোথায় রয়েছ প্রেম !
দাও দরশন !
কাতর হয়েছি আমি
কোরে অন্বেষণ। (৪ সংখ্যক স্তবক)

তারপরই কবি বলিতেছেন :

এই যে সমুখে প্রেম
মানসমোহন !
আভাময় প্রভাজালে
আলো ত্রিভুবন ;
সারল্যের স্বচ্ছ জলে
প্রত্যয়ের শতদলে,
সুখেতে শয়ন করি
সহাসবদন ;
সন্তোষ অনিল বায়,
আনন্দলহরী ধায়,
চিত মধুকর গায়
সুধা বরিষণ—
চারিদিকে সুধা বরিষণ ;
এই যে সমুখে প্রেম
মানসমোহন ! (৫)

প্রেমাগমে কবির এই আনন্দ-উল্লাস শীঘ্রই প্রাণপ্রেয়সীর আনন্দ-বন্দনায় রূপান্তরিত হইয়াছে :

প্রাণপ্রেয়সি আমার !
হৃদয়ভূষণ,
কত যতনের হার ,
হেরিলে তব বদন,
যেন পাই ত্রিভুবন,

অন্তরে উথলে ওঠে
আনন্দ অপার। (৬)

তারপর প্রেমের নানা আকর্ষণ বিকর্ষণ, হৃদয়ের নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কয়েকটি কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে :

না দেখিলে দহে প্রাণ,
দেখিলে দ্বিগুণ হয়,
কিছুই বুঝিতে নারি
কেনই এমন হয়! (১২)

যত দেখি, ততই যে
দেখিবারে বাড়ে সাধ,
নির্মল লাবণ্য-রসে
না জানি কি আছে স্বাদ!
কে যেন বাঁধিয়ে মন
বলে করে আকর্ষণ,
ফিরেও ফিরিতে নারি,
বিষম প্রমাদ! (১৩)

পুনশ্চ,

এত আদরের ধন
সাধের প্রণয়!
কেন গো ক্রমেতে আর
তত নাহি রয়?
প্রথম উদয়ে শশী
কত যেন হাসি খুসি,
শেষে কেন ক্রমে ক্রমে
ম্লান অতিশয়?
যোগাইতে যে আদরে,
সদাব্যস্ত পরস্পরে,
সে আদর করা পরে,
ভার বোধ হয়?
বটে মানুষের মন
চায় নব আস্বাদন,
তা বোলে প্রণয়ও কি রে
নব রসময়? (২১)

প্রেমের প্রতিটি স্তর বিহারীলাল সহৃদয়তা ও নিপুণতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। প্রথমে অনুরাগ, তারপর অনুরাগের পরিপক্ক স্তর, প্রেমের অবশ্যম্ভাবী ভ্রান্তি, তজ্জনিত বেদনা ও হতাশা, এবং প্রেমের সর্বগ্রাসী সব-ভুলানো মোহিনী মায়া—এসবই কবির নিপুণ তুলিকার বর্ণালিম্পনে ধরা পড়িয়াছে। কেবল তাহাই নহে, প্রেমলাভের জন্য যে যোগ্যতা অত্যাবশ্যক তাহাও কবি নির্দেশ করিয়াছেন, এবং ইহার অভাবে যে জীবন বঞ্চনায় পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছেন 'সংগীতশতক' কাব্যে।

কবি প্রেমের দোলাচলচিত্ততার নিপুণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন :

হায়, যে সুখ হারায়!
সে সুখের সম নাহি তুলনায়।
সাগরে ডুবিলে, পৃথিবী ঘুঁটিলে
আকাশে উঠিলে,
পাতালে পশিলে,
পরাণ সঁপিলে, সহস্র করিলেও,
তবু কি সে নিধি
আর পাওয়া যায়? (৩০)

কবি প্রেম-লাভের পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন :

অন্তর নির্মল কর
পাবে প্রেম-দরশন,
পবিত্র হৃদয় হয়
প্রেমের প্রিয় আসন। (৫৩)

শেষকালে কবি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়াছেন যে, বাস্তব জগতে প্রেমের কোন লৌকিক প্রতিষ্ঠাভূমি নাই,—

বৃথায় ভ্রমিবে আর
অসার প্রেমের আশে
হৃদয় প্রফুল্ল পদ্ম
শান্তি-সুধারসে ভাসে,
কিছুই যাতনা নাই,
সদাই আনন্দ পাই,
আমি যারে ভালবাসি,
সবে তারে ভালবাসে। (৯৭)

এই প্রশান্তির সুর 'প্রেম-প্রবাহিনী' কাব্যেও শোনা গিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে 'সংগীত শতক' ও 'প্রেমপ্রবাহিনীর' সুর 'সারদামঙ্গলের' আগমনীর সুর।

আদর্শায়িত প্রেমকবিতার কয়েকটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি নারী-

বন্দনার ধারা; একটি নারীপ্রেমের তত্ত্ব ও মাধুর্যের আলোচনা; আর একটি, নারীরূপের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা।

বাঙালি তাহার নবজাগরণের প্রথম প্রহরে নারী-মহিমা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। বোধ করি এতদিনের অবহেলার প্রবল প্রতিক্রিয়াতেই নারীর প্রতি বাঙালি কবির শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক গীতিকবিতার পথে শুভযাত্রার পূর্বেই মহাকাব্যের সরণিতে বাঙালি কবিরা নারীবন্দনা গাহিয়া বেড়াইয়াছিলেন। রঙ্গলালের তিনখানি আখ্যান-কাব্যই নারীর নাম বহন করিতেছে; মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা' নারীহৃদয়ের ক্ষাত্রপ্রেমকে কাব্যবারি দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া লইয়াছে; 'মেঘনাদবধ কাব্যে'ও কবি প্রমীলা ও সীতা-চরিত্র আঁকিতে বসিয়া তাঁহার বর্ণভাণ্ডের সকল রঙ্ নিঃশেষ করিয়াছেন।

এই নারীবন্দনার সূচনা মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র (১৮৬৬) 'প্রফুল্ল কমল যথা' সনেটে। দাম্পত্যপ্রেমের মহনীয় ধ্যান রূপেই এটি এখানে স্মরণযোগ্য। এই সনেটটির আলোচনা বর্তমান অধ্যায়ের সূচনাতে করা হইয়াছে।

গীতিকাব্যের পথিকৃৎ বিহারীলাল 'বঙ্গসুন্দরী'তে (১৮৭০) নারীর মহিমা গান করিয়াছেন; সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 'মহিলা কাব্য' (১৮৮০) লিখিয়াছেন; দেবেন্দ্রনাথ সেন 'নারীমঙ্গল' কবিতা (১৯১০) রচনা করিয়াছেন; অক্ষয় বড়াল 'এষা' কাব্যে (১৯১২) নারীবন্দনা করিয়াছেন; শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যে (১৮৯২) নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকার দিতে চাহিয়াছেন।

'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে বিহারীলাল বঙ্গনারীর বিচিত্র রূপ ধ্যান করিয়াছেন। সর্বংসহা স্নেহশালিনী অনন্ত ধৈর্যময়ী করুণাময়ী নারীকে কবি বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার উপচার দিয়া অর্চনা করিয়াছেন। এই কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ 'নারী-বন্দনা'তেই এই শ্রদ্ধা প্রকটিত হইয়াছে। কবি সূচনাতেই ভবভূতির একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন: "ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ"। বঙ্গ-নারীর জায়া ও জননী—এই দুই রূপ তিনি অংকন করিয়াছেন।

কবি নারীর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন:

যেমন মধুর স্নেহে ভরপুর,
নারীর সরল উদার প্রাণ;
এ দেব-দুর্লভ সুখ-সুমধুর
প্রকৃতি তেমতি করেছে দান।

আমরা পুরুষ, পরুষ নীরস,
নহি অধিকারী এ হেন সুখে,

কে দিবে ঢালিয়ে সুধার কলস,
অসুরের ঘোর বিকট মুখে।…

অয়ি ফুলময়ী প্রেমময়ী সতী,
সুকুমারী নারী, ত্রিলোক শোভা,
মানস-কমল—কানন-ভারতী
জগজন-মন-নয়ন-লোভা !

সংসার ক্ষেত্রে নারীর বিচিত্র ভূমিকা স্মরণ করিয়া কবি বলিতেছেন :

করম ভূমিতে পুরুষ সকলে,
খাটিয়ে খাটিয়ে বিকল হয় ;
তব সুশীতল প্রেম-তরু-তলে,
আসিয়ে বসিয়ে জুড়ায়ে রয়।
তুমি গো তখন কতই যতনে,
ফল জল আনি সমুখে রাখ ;
চাহি মুখপানে স্নেহের নয়নে,
সহাস আননে দাঁড়ায়ে থাক।

পরবর্তী সর্গে (তৃতীয় সর্গে) কবি গৃহনারীকে সুরবালা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন :

তুমিই সে নীল-নলিনী-সুন্দরী,
সুরবালা সুর-ফুলের মালা ;
জননীর হৃদি-কমল-উপরি,
হেসে হেসে বেশ করিতে খেলা।

তারপর নারীসৌন্দর্যের বর্ণনা। এই বর্ণনায় উচ্চস্তরাশ্রিত কল্পনা, স্বপ্নাবিষ্টতা ও সৌন্দর্য-উপলব্ধিতে ধ্যানতন্ময়তা লক্ষ্য করা যায়। নারী-সৌন্দর্যের অধ্যাত্ম ভাবস্বরূপ-বর্ণনায় ইহা রবীন্দ্রনাথের পূর্বাভাস।

সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী,
স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী,
মানস-সরস-নীল-মৃণালিনী,
কে তুমি অন্তরে বিরাজ সতী ?
আহা এই প্রেম-প্রতিমার রূপ,
বয়সে বিরূপ নাহিক হবে ;
চিরদিন সুর-কুসুম অনুপ,
সমান নূতন ফুটিয়ে রবে।
যতদিন রবে মনের চেতনা,
যতদিন রবে শরীরে প্রাণ ;

ততদিন এই রূপসী কল্পনা,
হৃদয়ে রহিবে বিরাজমান।

শেষে কবি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন :

তুমিই সুরবালা! সে সুররমণী,
উষারাণী হৃদি-উদয়াচলে,
সখা-শক্তিশেল-বিশল্যকরণী,
মৃতসঞ্জীবনী ধরণীতলে।

কল্পনার উচ্চগ্রামে উঠিয়া কবি তাঁহার উপাস্যা নারীকে 'রূপসী কল্পনা' ও 'সুরবালা' রূপে গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ সর্গে 'চিরপরাধিনী' বঙ্গনারীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনার দুঃখময় ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম সর্গে বঙ্গনারীকে করুণার প্রতিমারূপে কবি দেখিয়াছেন। ষষ্ঠ সর্গে আবার নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা। কবি এখানে নারীকে লজ্জার প্রতিমা রূপে দেখিয়াছেন। বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন :

আপনার রূপে আপনি বিহ্বল,
হেসে চারিদিক চাহিয়ে দেখে;
কে যেন তাহারি প্রতিমা সকল,
জগত জুড়ায়ে রেখেছে এঁকে।
আচম্বিতে যেন ভেঙে যায় ভুল,
অমনি লাজের উদয় হয়;
দেহ থর থর, হৃদয় আকুল,
আনত নয়নে দাঁড়ায়ে রয়।
আধ ঢুলু ঢুলু লাজুক নয়ন,
আধই অধরে মধুর হাসি;
আধ ফোটা ফোটা হয়েছে কেমন,
কপোল-গোলাপ-মুকুলরাশি!
আননের পানে সরমবতীর,
স্থির হয়ে চাঁদ চাহিয়ে আছে;
আসি ধীরে ধীরে শীতল সমীর,
ব্যজন করিয়ে ফিরিছে কাছে।

পতিসুখে নিরাশ হওয়ায় এই 'সোনার পুতলী' শেষ পর্যন্ত ম্লান হইয়া 'বিষাদিনী' রূপে দেখা দিয়াছে। এই ঘটনার জন্য কবি আন্তরিক শোক করিয়াছেন :

হা বিধি! এ বিধি বুঝিতে পারিনি,
কোমল কুসুমে কীটের বাস;

বিপাকে বধিতে সরলা হরিণী
শবরে পাতিয়ে রয়েছে পাশ।

পরবর্তী সপ্তম সর্গে কবি এই নারীকে 'প্রিয়লপী' রূপে বন্দনা করিয়া বলিতেছেন:

সরেস গাহনা শুনিলে যেমন,
কানে লেগে থাকে তাহার তান ;
তোমার উদার প্রণয় তেমন,
ভরিয়ে রেখেছে আমার প্রাণ।
ভাবিতে ভাবিতে উথলে অন্তর,
প্রেমরসভরে বিহ্বল প্রাণ ;
অয়ি, তুমি মম সুখের সাগর,
জুড়াবার প্রিয় প্রধান স্থান।

'বিরহিণী' শীর্ষক অষ্টম সর্গে বিরহিণী নারীর বেদনাকে আশ্রয় করিয়া কয়েকটি চমৎকার গানের সমাবেশ হইয়াছে। পতি-বিরহিণীর অসহ হৃদয়বেদনা এই গান ও বর্ণনায় ধরা পড়িয়াছে। পরবর্তী নবম সর্গে পুনর্বার 'প্রিয়তমা' নারীর বন্দনা। দশম সর্গে প্রোষিতভর্তৃকা গর্ভবতী 'অভাগিনী' নারীর বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। পুরুষের জীবনে গৃহলক্ষ্মীর যে অবিচল আসন পাতা রহিয়াছে, নবম সর্গে তাহারই আনন্দময় স্বীকৃতি। কবি প্রশ্ন করিয়াছেন, প্রিয়তমার প্রেমলাভের পর—'হেন ধরাধাম থাকিতে সমুখে, সুরলোকে লোকে কেন রে যায়!' এবং স্বর্গের তুলনায় মর্ত অনেক সুখের স্থান, কেননা এখানে আছে 'নারীর মতন সুখশান্তিময়ী অমৃতলতা' ; এই অমৃতলতা স্বর্গে নাই, তাই স্বর্গ চাহি না। কবি প্রিয়তমার সুখশান্তিদায়িনী অমৃত-প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইয়া বলিতেছেন :

প্রফুল্ল-বদনে হাসিতে হাসিতে
এই যে আমার আসনে উষা ;
নয়ন সজল স্নেহ-মাধুরীতে,
হৃদে অবিনাশ অরুণ-ভূষা।

সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী,
স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী,
মানস-সরস-বিকচ-নলিনী,
আলয়-কমলা করুণাবতী!

প্রিয়ে! তুমি মম অমূল্য রতন!
যুগযুগান্তরে তপের ফল ;
তব প্রেম-স্নেহ অমিয়-সেবন
দিয়েছে জীবনে অমর বল।

এই আনন্দময় প্রীতির সুরে কবি বিহারীলাল বঙ্গনারীর বন্দনা শেষ করিয়াছেন।

বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের পর সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা' কাব্যের প্রসঙ্গ স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। নারীবন্দনায় এই দুই কবির মিলও আছে, অমিলও আছে। মিল এইখানে যে উভয়েই বঙ্গনারীর আদর্শায়িত রূপধ্যান করিয়াছিলেন।

'মহিলা' কাব্যের অবতরণিকায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ঘোষণা করিয়াছেন:

হৃদয়ে জেগেছে তান
পুলকে আকুল প্রাণ
গাব গীত খুলি হৃদি-দ্বার,
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার। (২)
কোন বরবর্ণিনী বিশেষ নায়িকার
চাটুস্তুতি না চাই রচিতে;
সমুদয় নারীজাতি নায়িকা আমার,
বাঞ্ছা চিত্তে বিশেষ বণিতে;
স্মরি চির-উপকার
দিব গীত-উপহার
শুধিবারে ধার মমতার,
মায়া-কায়া মাতা, জায়া, নন্দিনী, আমার। (৩)

কবি আকুল পুলকে ভরা আনন্দে নারী-বন্দনাগান গাহিতে উদ্যত হইয়াছেন:

সবিলাস বিগ্রহ মানস-সুষমার
আনন্দের প্রতিমা আত্মার
সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার,
মূর্তিমতী মুরতি মায়ার;
যত কাম্য হৃদয়ের,
সংগ্রহ সে সকলের—
কি বুঝাব ভাব রমণীর,
মণিমন্ত্র-মহৌষধি সংসার ফণীর! (৬)

বিকচ পঙ্কজ-মুখে শ্রুতি-পরশিত;
সলাজ লোচন ঢল ঢল,
চাঁচর চিকুর চারু চরণ-চুম্বিত,
কি সীমন্ত ধবল সরল!
কাতর হৃদয়ভরে,

স্বচ্ছমুক্তা-কলেবরে
ঢল ঢল লাবণ্যের জল।
পাটল কপোল কর-চরণের তল। (১৩)

পূজিবার তরে ফুল ঝরে' পড়ে পায়,
হৃদি-ফল পরশে পাখীতে ;
মুগ্ধমুখে কুরঙ্গিনী মুগ্ধমুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে !
স্পর্শে পদরাগভরা
অশোক লভিল ধরা,
এলোকেশে কে এল রূপসী—
কোন্ বনফুল, কোন্ গগনের শশী ! (১৪)

সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা' কাব্যে নারীস্তোত্র রচিত হইয়াছে। কিন্তু বিহারী-লালের সহিত মিল এই পর্যন্তই। তারপর সুরেন্দ্রনাথের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে প্রথম পরিচয়ের সশ্রদ্ধ বিস্ময় ও আত্মসমর্পণের ভাবটিই প্রাধান্য পাইয়াছে। কিন্তু 'মহিলা' কাব্যে বিস্ময় অপেক্ষা সজ্ঞান শ্রদ্ধা, কল্পনার রসাবেশ অপেক্ষা বাস্তবের বস্তু-পরীক্ষাই অধিক। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী'তে নারীসৌন্দর্যের স্বপ্নাবিষ্ট ধ্যান ও ভাববিভোরতাই প্রাধান্য পাইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ মোহিনী মহিলার মহীয়সী মহিমা যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; তিনি নারী চরিত্রের গূঢ় রহস্য চিন্তা না করিয়া সংসারে ও সমাজে, ইতিহাসে ও লোকব্যবহারে, নারীর নানাগুণের যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই সবিস্তারে নানা দৃষ্টান্ত উপমা ও অলংকারের সাহায্যে উপস্থিত করিয়াছেন। এ কাব্যে আধ্যাত্মিক বিভোরতা বা স্বপ্নময় বিহ্বলতা প্রাধান্য লাভ করে নাই, একথা যথার্থ; তবে যুক্তি ও তত্ত্বালোচনার ফাঁকে ফাঁকে আন্তরিক সহানুভূতি, বাস্তব-দৃষ্টি, চিত্তের প্রদীপ্তি ও রসাবিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। "অতিশয় প্রাকৃত প্রেমের সংস্কার এ কাব্যের ভিত্তিভূমি।" ('আধুনিক বাংলা সাহিত্য'— মোহিতলাল মজুমদার)। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই কবি ইহার স্থূলতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যুক্তি ও দর্শনের পথে বিহার করিয়াছেন, নারীকে তাহার মহীয়সী মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভোগের বস্তুকে কবি শ্রদ্ধার বস্তুতে পরিণত করিয়াছেন। 'মহিলা' কাব্যে সুরেন্দ্রনাথ মাতা, জায়া ও ভগ্নী এই তিন রূপে নারীস্তোত্র রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। শেষ অধ্যায় সমাপ্ত করিতে পারেন নাই।

'মহিলা' কাব্যের অবতরণিকায় কবি আরো বলিয়াছেন :

এক দুগ্ধে দধি, তক্র, ঘৃত, নবনীত,
নানা উপাদেয় যথা হয় ;—
এক নারী নানা রূপে করে বিরচিত
সংসারের সুখ সমুদয় ;—
সৃষ্টি পুষ্টি জননীর,
প্রিয় চিন্তা ভগিনীর,
কন্যা সেবা, জায়ার বিহার ;—
অতুলনা দান যাঁর কুমারী কুমার! (২৭)

সংসার পেষণি, নর অধঃশিলা তায়,
রেখে মাত্র আলম্বন আর,
নারী ঊর্দ্ধখণ্ড, কার্য করিছে লীলায়,
কীলে রন্ধ্রে মিলন দোঁহার !—
ভাবচক্ষে নিরখিয়া,
দেখ হে ভবের ক্রিয়া,
বিপরীত বিহার অতুল !—
রমণী-রমণ রসে পুরুষ বাতুল ! (৪৪)

যদি মৃত্যু এনে থাকে মহিলা ধরায়,
সে ক্ষতি সে করেছে পূরণ ;
যম-যানে জরাজীর্ণে লোকান্তরে যায়,
নারী করে প্রসব নূতন !
কোন দুঃখ ধরা ধরে
নারী যারে নাহি হরে ?
তাই পুনঃ মৃষার লিখন, -
নারী-বীজে হবে ফণি ফণার দলন! (৪৮)

সংসারে ধাত্রী ও পালয়িত্রী নারীর অশেষ গুণ বর্ণনান্তে কবি বলিতেছেন :

নারী-মুখ সংসারের সুষমার সার,
শ্রেষ্ঠ গতি নারীর গমন,
জ্যোতির প্রধান লোল আঁখি ললনার—
আত্মা নট-নৃত্য-নিকেতন !
নারী-বাক্য গীত জানি,
নারী-কার্য অনুমানি
সকরুণ লীলা বিধাতার !
মর্ত্তে মূর্তিমতী মায়া অঙ্গে অঙ্গনার ! (৬৭)

কবি অপূর্ব মমতা ও শ্রদ্ধার সহিত মাতৃবন্দনা গাহিয়াছেন :

সুকোমল অঙ্কে নিয়া,
অঙ্গে কর বুলাইয়া,
পিয়াইয়া পুনঃ হৃদি-পীযুষ-ধারায়,
মমতায় বিমোহিয়া,
স্নেহ-বাক্যে ভুলাইয়া,
হে জননি, কর পুনঃ বালক আমায়!
তব অঙ্ক পরিহরি,
সংসারে প্রবেশ করি,
সদা মত্ত থেকে মাগো বিষয়ের রণে!
তুমি গড়েছিলে যাহা,
আর আমি নাই তাহা
তব প্রেম-স্বর্গ-কথা কিছু নাই মনে!
কেমনে বর্ণিব তায় স্মৃতির বিহনে! (১)

জায়া-খণ্ডে কবি প্রেয়সী-বন্দনা করিয়াছেন। তিনি সূচনাতেই জায়া-আবাহন করিয়াছেন এই বলিয়া :

এসো এসো প্রিয়তমা প্রতিমা সাকার!
জাগাও ভক্তের হৃদে ভাব নিরাকার ;—
রাগভরে করি তব স্তবন পূজন!—
পৌত্তলিক ভাবি মনে,
হাসিবে অবোধগণে ;
সুবোধ বুঝিবে আছে নিগূঢ় কারণ—
নিরাকারে ধ্যান নভঃকুসুম-চয়ন। (৬)

তারপর কবি প্রেয়সীর মহিমা কীর্তন করিয়াছেন :

জরা-বাল্যকাল মাঝে সুখের যৌবন,
মানুষের মধ্যে মান্য মধ্যস্থ যে জন,
আঁখি-মধ্যভাগে আঁখি-মণির বিহার ,—
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মাঝে
প্রেমভাব যথা সাজে,
তুমি মধ্যচারী তথা মাতা দুহিতার,
পূর্ণ চারু বামা-ভাব-সাকার-লীলার। (১০)

কোথায় উপমা দিব যুবতী-শোভায়?
অতি চারু শশাঙ্ক শারদ পূর্ণিমায়?
শারদ সরসি বটে পরম শোভার ;

বিমল রসাল কায়,
মন্দ আন্দোলিত বায় ;
কিন্তু কোথা পাব তায় বিহার আস্থার !—
মদালস সে লোল লোচন লালসার ! (৩৯)

তপনে কিরণ তুমি কিরণে প্রকাশ,
হৃদয়ের প্রেম তুমি বদনের হাস,
জড়ে অবয়ব তুমি বিজ্ঞান আত্মার,
তুমি শীতগুণ জলে,
তুমি গন্ধ ফুলদলে,
মধুর মাধুরী স্বরে সঙ্গীতে সঞ্চার,
কাঞ্চনের কান্তি তুমি বল অবলার ! (৪০)

অশ্বে যথা বল্গা, অঙ্কুশ করীর,
দেহে যথা দৃষ্টি, কর্ণ যেমন তরীর.
বুদ্ধিবৃত্তি-দলে যথা হিতাহিত জ্ঞান,
সিন্ধু-যাত্রী—পথ-হারা
তার যথা ধ্রুব তারা,
পুরুষে প্রেয়সী তুমি সেরূপ বিধান ;
তোমা বিনা পথ-ভ্রান্ত পান্থের সমান ! (৬৬)

জগৎ ও জীবন, সংসার ও বাস্তবকে ইতিহাস-দর্শনের সঙ্গে তিনি একসূত্রে গাঁথিয়াছেন এবং নারীর প্রতিটি রূপের বস্তুগত বর্ণনা দিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রেমের আদর্শে, তথা নারীবন্দনায়, আদিরস পূর্ণ মাত্রায় আছে। অতিশয় প্রাকৃত প্রেমের সংস্কারকে কবি যুক্তিদর্শনের পুটপাকে শোধিত করিয়া লইয়াছেন এবং নারীকে সম্পূর্ণ নূতন আদর্শে ধ্যান করিয়াছেন। এখানেই সুরেন্দ্রনাথের আদর্শান্বিত প্রেমকবিতার বিশিষ্টতা।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোক-গুচ্ছে'র 'নারীমঙ্গল' কবিতাটিও নারী-বন্দনা। বঙ্গনারীকে কবি মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই কবিতার শেষে যে আহ্বান জানাইয়াছেন, তাহাই এ বন্দনার মূল মন্ত্র :

এস সখি, আজি তোমা অভিষেক করি !
ধর ধর ছত্রদণ্ড, রাজরাজেশ্বরী !—
বিপুল ভাবের রাজ্য, অদ্ভুত, বিরাট !
বিচিত্র-ফুল্ল—আলোকে তোরণ-কপাট
আলোকিত সিংহদ্বারে ; কল্পনা-অপ্সরী

বরষিছে লাজমুষ্টি ; গায় শত ভাট
তোমার মঙ্গল-গীতি, হে বঙ্গ-সুন্দরি !

দেবেন্দ্রনাথের কাব্যের উপজীব্য সেই সৌন্দর্যনিষ্ঠা যাহাকে অবলম্বন করিয়া পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মাধুর্য ও শান্তি বিকশিত হয়। কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী এই সৌন্দর্যের প্রতিমা। কবি নারীর পতিঅনুরাগিণী, সেবাময়ী, কল্যাণদায়িনী রূপটি দেখিয়া আত্মহারা হইয়া বলিয়াছেন :

শব্দ-ঘটাময়ী শুধু নহ গো কবিতা—
তুমি সখি অর্থময়ী, ভাবময়ী গীতা।

রবীন্দ্রনাথে আসিয়া এই আদর্শায়িত প্রেমের ঊর্ধ্বায়ন হইয়াছে। সেখানে কল্পনা ও সৌন্দর্য উভয়ে মিলিয়া মানসসুন্দরীরূপে কবির চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে ; শেষ পর্যন্ত তাহা বিচিত্ররূপিণী হইয়া দেখা দিয়াছে। কবির একই সময়ে মনে হইয়াছে :

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

এবং,

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।

বঙ্গসুন্দরী শেষ পর্যন্ত বিশ্বসুন্দরীতে পরিণত হইয়াছে। রোমান্টিক কবিভাবনা কস্‌মিক কবিভাবনায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। এ সম্পর্কে নবম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

অক্ষয় বড়ালের 'এষা' কাব্য একাধারে বিষাদ কাব্য ও নারীবন্দনা-কাব্য। বাঙালি কবির দাম্পত্য-প্রীতি নারীর একটি মহিমাময়ী মূর্তি না গড়িয়া পারে না। বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ এই প্রতিমার অর্চনা করিয়াছেন, অক্ষয়কুমারও করিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের নারীবন্দনার স্বরূপ কি ? তিনি বাঙালির গৃহ-প্রাঙ্গণে নিত্য লক্ষ্মীপূজার উৎসবে—বাস্তব সুখ দুঃখের গন্ধ-পুষ্প ও সুগভীর স্নেহরসের আলিপনায়, এই প্রতিমাকে হৃদয়েশ্বরীরূপে বন্দনা করিয়াছেন। বাঙালির সংসারে অধিষ্ঠাত্রী যে নারী, অক্ষয়কুমার তাহারই বন্দনা গাহিয়াছেন। 'এষা' কাব্যের 'শোক' খণ্ডের ৪সং কবিতাটি ইহার পরিচয়স্থল। বাঙালির সংসারে নারী যে কী সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিতা, তাহা এই কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। বাঙালি জীবনের সহজ ও আন্তরিক হৃদয়-সংবেদনা 'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে' এই প্রতিমা গড়িয়া তুলিয়াছে। নারীকে কল্পনার উচ্চ চূড়ায় না বসাইয়া, আদিরসের পঙ্কে না নামাইয়া, দাম্পত্য-প্রেমের প্রদীপে তিনি নারীর আরতি করিয়াছেন। এই কবিতায় তিনি সরল ও আন্তরিক সুরে গাহিয়াছেন—

জীবনে সে পায় নাই সুখ,
দুখে কভু ভাবে নাই দুখ,

রোগে শোকে হয়নি চঞ্চল ;
সরল অন্তরে, হাসি মুখে,
সকলি সহিয়াছিল বুকে ;
কাঁদিলে যে হবে অমঙ্গল।
পায় নাই যতন আদর,
তবু—তবু ছিল কি সুন্দর !
ইঙ্গিতের বিলম্ব না সয়—
প্রাণের মমতা যত্ন দিয়া
সব দুখ দিত মুছাইয়া ;
দিত পায় পাতিয়া হৃদয়।

সুখে দুখে ছিল চিরসাথী,
জগৎ-জুড়ানো জ্যোৎস্নারাতি !
জীবনের জীবন্ত স্বপন !
আপনারে হারায়ে—হারায়ে
গিয়াছিল আমাতে জড়ায়ে
প্রতিদিন অভ্যাস মতন।

পড়ে' আছে নয়নে নয়ন—
অসঙ্কোচে করি আলাপন,
দেহে দেহ, নাহিক লালসা।
হৃদে হৃদি, প্রাণে প্রাণ হেন —
অতি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব যেন !
এক আশা ভাবনা ভরসা।

ছায়া সম ফিরি' নিরন্তর,
কখন দিত না অবসর
বুঝিতে সে প্রেমের মহিমা ;
মর্মে মর্মে বুঝিতেছি আজ,—
তার প্রতিদিবসের কাজ,
চলা, বলা, চাহনি, ভঙ্গিমা!……
যখন যা করেছি মনন—
আগেভাগে করি আয়োজন,
অপেক্ষায় রহিত বসিয়া।

ক্ষুদ্র দুখ, তুচ্ছ অনটন—
যখনি হয়েছি অন্যমন,
অমনি চেয়েছে নিশ্বসিয়া।......
ঘরদ্বার জগৎ সংসার,
সকলি—সকলি ছিল তার !
আমি নিত্য অতিথি নূতন ;
দিলে পাই, নিলে তুষ্ট হই—
অনায়াস দিবস কেমন !

এই প্রতিমা মর্মের গেহিনী নহে, অতিশয় বাস্তব সংসারের কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী। অক্ষয়কুমার এই গৃহলক্ষ্মীকেই বন্দনা করিয়াছেন। 'এষা' কাব্যের নিবেদনে কবি স্পষ্টই বলিয়াছেন : "মানবীর তরে কাঁদি, যাচি না দেবতা।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুদীর্ঘ কাব্যজীবনে নারীকে বারেবারেই উচ্চাসন দিয়াছেন। নারীর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরাগ ও বন্দনার প্রথম পরিচয় পাই 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যে (১৮৯২)।

এই কাব্যে অর্জুন বলিয়াছে :

খ্যাতি মিথ্যা,
বীর্য মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি। আজ মোর
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য
তুমি, এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্মের তুমি
বিশ্রামরূপিণী। কেন জানি অকস্মাৎ
তোমারে হেরিয়া বুঝিতে পেরেছি আমি
কী আনন্দকিরণেতে প্রথম প্রত্যূষে
অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টি শতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মোচিত হয়ে
এক মুহূর্তের মাঝে।

চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে নারীর দাবী ধ্বনিত হইয়াছে :

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখো
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি করো
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,

যদি সুখে দুঃখে মোরে করো সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

'কাহিনী' (১৯০০) কাব্যের 'পতিতা' কবিতায় একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে। 'ক্ষণিকা' (১৯০০) কাব্যের 'কল্যাণী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমারের ন্যায় গৃহলক্ষ্মী নারীর বন্দনা করিয়াছেন :

তোমার শান্তি পান্থজনে ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্যকুঞ্জবনে কত অধীর সমীরণে
কত যে ফুল কত আকুল মুকুল খসে পড়ে।
সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান আছে তোমার তরে॥

এই দাবী রবীন্দ্র-কাব্যে বার বার ঘোষিত হইয়াছে। 'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যের 'দুই নারী' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। 'পলাতকা' (১৯১৭) কাব্যের 'মুক্তি' কবিতায় এই দাবীর স্পষ্ট ঘোষণা :

আমি নারী, আমি মহীয়সী
আমারে স্মরি সুর বেঁধেছে
জ্যোৎস্না-তারায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সূর্য, চন্দ্র ওঠা,
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল ফোটা।

'মহুয়া' কাব্যে (১৯২৯) এই দাবীর আরো স্পষ্ট উচ্চ ঘোষণা। 'সবলা' কবিতায় এই দাবী ধ্বনিত হইয়াছে :

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা।
নত করি মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে।
শুধু শূন্যে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গা-পাশে।
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি পণ॥

'স্পর্ধা' কবিতায় এই দাবীকে কবি স্বীকৃতি ও সম্মান দিয়াছেন :

নারী সে-যে মহেন্দ্রের দান,
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান ॥

নারীবন্দনায় বাঙালি কবি যে উৎসাহ বোধ করিয়াছিলেন, এতক্ষণ তাহার আলোচনা করিয়াছি। এইবার আদর্শান্বিত প্রেমকবিতার মূল ধারাটি আলোচনা করিব। নারীবন্দনায় বিমুগ্ধ ভক্তের দৃষ্টি ; নারীপ্রেমের মূল তত্ত্বালোচনায় ও সৌন্দর্যের প্রতিমা-আরতিতে আদর্শাঞ্জন-মাখা দৃষ্টি। একটিতে পুজোপচার সমর্পণ, অপরটিতে কল্পনাকাশে বিচরণ।

এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম সার্থক পরিচয় পাই বিহারীলালের কাব্যে। তাঁহার 'শরৎকাল' কাব্যের অন্তর্গত 'নিশান্ত সংগীত' কবিতাটি সৌন্দর্যপ্রতিমা নারীর আরতি।

নিদ্রিতা প্রেয়সীর মুখারবিন্দ দেখিয়া কবির ভাবোচ্ছ্বাস :

আহা এই মুখখানি—
প্রেমমাখা মুখখানি—
ত্রিলোক সৌন্দর্য আনি কে দিল আমায় !
কোথায় রাখিব বল,
ত্রিভুবনে নাহি স্থল,
নয়ন মুদিতে নাহি চায় ! (৩)

সদাই দেখি রে ভাই,
তবু যেন দেখি নাই,
যেন পূর্বজন্মকথা জাগে মনে মনে !
অতি দূর দিগন্তরে
কে যেন কাতর স্বরে
কেঁদে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে ! (৪)

এইখানে কবি রোমান্টিক কবিভাবনার সার্থক পরিচয় দিয়াছেন। তারপর কবি তাঁহার প্রিয়তমাকে জাগাইতেছেন ; এই জাগরণী-গান অতুলনীয়। একাধারে বাস্তব প্রেম ও অবাস্তব সৌন্দর্য-পিপাসা মিটাইবার যে সাধনা তিনি করিয়াছিলেন, তাহারই একটি সহজ ও সরল, অথচ গভীর ও মধুর গীতোচ্ছ্বাস পরবর্তী স্তবকগুলিতে ধ্বনিত হইয়াছে—

উঠ প্রেয়সী আমার—
উঠ প্রেয়সী আমার—
হৃদয়-ভূষণ কত যতনের হার !

হেরে তব চন্দ্রানন
যেন পাই ত্রিভুবন
অন্তরে উথলে ওঠে আনন্দ অপার!
উঠ প্রেয়সী আমার! (৫)

মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে ও মুখশশী জাগে অনিবার।
কি জানি কি ঘুমঘোরে,
কি চক্ষে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর!
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার! (৬)

ওই চাঁদ অস্তে যায়!
বিহঙ্গ ললিত গায়,
মঙ্গল-আরতি বাজে নিশি অবসান;
হিমেল্ হিমেল্ বায়
হিমে চুল ভিজে যায়,
শিশির-মুকুতা-জালে ভিজেছে বয়ান;
উঠ প্রেয়সী আমার, মেল নলিন-নয়ান! (১০)

"এই 'নিশান্ত সঙ্গীত' শুধুই দাম্পত্য প্রেমের পূর্ণ সুখ-সম্ভোগ নয়; এ প্রেম বিশ্ব-নিখিলের সঙ্গে কবিহৃদয়কে যুক্ত করিয়াছে; কবির চিত্তাকাশে দিগন্ত-ব্যাপিনী ঊষার সমারোহে মঙ্গল-আরতি-গানের সঙ্গে সঙ্গে 'নিশি অবসান' হইতেছে। এইখানেই এই গীতি-কল্পনার মৌলিকতা, এই মানব-সুলভ স্বাভাবিক প্রেমই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য-ধ্যানের সহায়ক হইয়াছে—বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-হৃদয়ের এই যে মিলন-তীর্থ কবি আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার কাব্যসাধনার মূলমন্ত্র।" ('আধুনিক বাংলা সাহিত্য'—মোহিতলাল মজুমদার)।
এই 'শরৎকাল' কাব্যের আরেকটি কবিতা—'নিশীথ-সঙ্গীত' হইতে কয়েকটি স্তবক উদ্ধার করিয়া বিহারীলালের এই মূলমন্ত্রটি প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস করিব। প্রেমসম্ভোগের নেশায় কবির যে প্রমত্ততা, তাহা তিনি স্বীকার করিয়া বলিতেছেন:

প্রিয়ার পবিত্র মুখ
উদার স্বরগ-সুখ,
কেবল আমারি তরে বিধির সৃজন;

কেহ নাই চরাচরে,
প্রাণ ভোরে ভোগ করে,
কারো নাই এ প্রমত্ত নেশার নয়ন। (১৮)

কবির প্রাণেতে পশি
আচম্বিতে কে রূপসী
বীণা করে খেলা করে হসিত বয়ানে ;
অলস অপাঙ্গে চায়
কবি নিজে মোহ যায়
জগৎ জাগিয়া ওঠে একমাত্র গানে ! (২৫)

এই দৃঢ় ঘোষণা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা, নিজ আদর্শে অবিচল নিষ্ঠা ও প্রেম-সাধনার অনন্যমুখিতা বিহারীলালের প্রেমধ্যানকে বিশিষ্টতা দিয়াছে। যে আদর্শায়িত প্রেমের সাধনা কবি করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তবনিষ্ঠা যথেষ্ট আছে ; এ কাব্যে অবাস্তবের প্রতি কবির কোন শ্রদ্ধা নাই। কবি এই প্রেমকে তাঁহার জীবনে ধ্রুবসত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন :

ধিক্ রে অধম ধিক্
ভালবাসা 'প্লেটোনিক্'
ছদ্মবেশী রসিক মধুর 'মিয়ু মিয়ু',
প্রেমের দরাজ জান্,
আকাশে ঢালিয়া প্রাণ,
সজোরে পাপিয়া হাঁকে 'পীহ পীহ পীহু'। (৩১)

দুর্বহ প্রেমের ভার
যদি না বহিতে পার
ঢেলে দাও আকাশে বাতাসে ধরাতলে !
(মিটায়ে মনের সাধ
ঢালিয়া দিয়াছ চাঁদ)
ঢেলে দাও মানবের তপ্ত অশ্রুজলে ! (৩২)

উথলে অমৃতরাশি
মুখেতে ধরে না হাসি
বিশ্বের প্রেমিক ওহে প্রিয় সুধাকর,
প্রেয়সীরো থর থর
হাসি-মাখা বিম্বাধর
সাধের স্বপনময়ী মূর্তি মনোহর ! (৩৩)

আর কিছু নাই সুখ,
ওই চাঁদ, এই মুখ,
যেন আমি জন্মান্তরে ফিরে দুই পাই ;
যাই আমি যেইখানে,
যেন আমি খোলা প্রাণে
এক মাত্র পবিত্র প্রেমের গান গাই। (৩৪)

এই স্তবকগুলিতে বিহারীলালের রোমাণ্টিক কবিভাবনা সুন্দর প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এখানে বস্তুনিষ্ঠা অপেক্ষা ভাবমুগ্ধতার মাধ্যমে নারীসৌন্দর্যের কল্পনা-রূপান্তর ও বিশ্ববিস্তৃতি ঘটিয়াছে।

ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার এক ধাপ উপরে এই আদর্শায়িত প্রেমকবিতা। দেবেন্দ্রনাথে ইহার সুন্দর ও স্পষ্ট পরিচয় লিখিত আছে। তাঁহার 'অশোকগুচ্ছ' (১৯০০) কাব্যে ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের জয় ঘোষণা হইয়াছে ; সেখানে তীব্র তৃষা ও অসহ্য আবেগ। আর 'গোলাপগুচ্ছ' (১৯১২) কাব্যে আদর্শায়িত প্রেমের জয় হইয়াছে – সেখানে পিপাসার পরিবর্তে তৃপ্তি, বিরহের পরিবর্তে মিলন, ব্যথার পরিবর্তে সুখ, অভাবের পরিবর্তে শান্ত সম্ভোগ। এখানে নারীপ্রেম বিশেষে ধরা দিয়াছে—দাম্পত্য প্রেমের ঊর্ধ্বায়ন হইয়াছে। নারীবিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া কবির সৌন্দর্য-কল্পনার পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনায় একটি নূতন সুরের সংযোজন হইয়াছে এখানে। নারী তাঁহার সৌন্দর্য-সাধনার সাকার বিগ্রহ, সুমধুর দাম্পত্য-প্রীতি সৌন্দর্য-কল্পনায় মণ্ডিত হইয়া এই কবিতাগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীই এই চির-পরিচিতা সুখদুঃখভাগিনীর মূর্তিতে তাঁহার হৃদয়ের আরতি লাভ করিয়াছে। বাস্তববোধে নহে, আদর্শের ধ্যানলোকে কবি তাঁহার প্রেমকে আবিষ্কার করিয়াছেন। 'পরশমণি' কবিতাটিতে কবি হেমচন্দ্রের কবিতার উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ প্রেম-সম্পর্কে এই ধারণা ব্যক্ত করিয়াছেন :

না গো না, এ চক্ষু নয় সে অতুল মণি !
প্রেমই পরশমণি, যাদুকর-স্পর্শে যার
হয়েছে অমরাবতী মাটির ধরণী !
ইহারি পরশবলে অতুল রূপসী-সাজে
দাঁড়ায় যুবার পার্শ্বে শ্যামাঙ্গী রমণী !
ইহারি পরশবলে কৃষ্ণ ভৃঙ্গে ক্রোড়ে লয়ে
মদন-লাঞ্ছন মুখ নেহারে জননী !
ইহারি পরশ পেয়ে ত্রিভঙ্গের শ্যাম অঙ্গে
হেরে ত্রৈলোক্যের রূপ ব্রজবিহারিণী !
হে কবি, ইহারি বলে হেরিয়াছ বঙ্গ-ঘরে

ডেসি-লেসি-ড্যাফোডিল্-কুসুম-লাঞ্ছন
বঙ্গনারী পুষ্পরাজি বিশ্বে অতুলন!

এ প্রেম স্পষ্টতই আদর্শান্বিত প্রেম। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দেবেন্দ্রনাথের পরবর্তী প্রেমকবিতায় লক্ষ্য করা যায়। দীপহস্তে সুন্দরী অথবা মৃতা বৃদ্ধার শয্যায় বিরহী বৃদ্ধ, প্রথম অথবা শেষ চুম্বন, প্রকৃতিরাজ্যে মিলন অথবা আঁখির মিলন—সর্বত্রই ইহার ছাপ পড়িয়াছে। পূর্বের অসহ্য আবেগ ও তপ্ত তৃষ্ণা গিয়াছে, এখন আসিয়াছে শান্ত সম্ভোগের পরিতৃপ্তি ও সুমধুর দাম্পত্য-প্রীতি।

প্রেমের আদর্শান্বিত রূপচিত্রণের বিশিষ্ট উদাহরণ হিসাবে আমরা 'দীপহস্তে যুবতী' সনেটটি গ্রহণ করিতে পারি :

"ছাড় ছাড়, হাত ছাড়—"
ছাড়িলাম হাত,
হে সুন্দরী রোষ কেন? তুমি যে আমার
পরিচিত, মনে নাই সে নিশি আঁধার?
তোমাতে আমাতে হ'ল প্রথম সাক্ষাৎ!
তরুটি ভরিয়া গেছে অশোকে অশোকে,
বসেছে জোনাকি-পাঁতি কুসুমে কুসুমে;
কবিচিত্ত ভরি' গেল মাধুরী-আলোকে,
তুমি সখি তরু হ'তে নেমে এলে ভূমে!
কি অশোক-বার্তা আনি' মরমে মরমে
ঢালি' দিলে কবি-কর্ণে অশোক-সুন্দরী!
দিবসের পাপ চিন্তা কলুষ সরমে
হেরি ও সাঁজের দীপ গিয়াছে' বিস্মরি?
হাসিয়া ছাড়ায়ে হাত গেল বধূ ছুটি'—
প্রাণের তুলসী-মূলে জ্বালিয়া দেউটি।

'আঁখির মিলন' কবিতাটিতে দম্পতির গোপন আলাপের মাধুরী কবি আবিষ্কার করিয়াছেন—

আঁখির মিলন ও যে—আঁখির মিলন।
লোকে না বুঝিল কিছু লোকে না জানিল কিছু
দম্পতির হ'ল তবু শত আলাপন!
হ'ল মন জানাজানি হ'ল মন টানাটানি
আশার চিকণ হাসি, মানের রোদন;
বিজয়ার কোলাকুলি— আঁধারে শ্যামার বুলি,
প্রেমের বিরহ-ক্ষতে চন্দন-লেপন—
ওই আঁখির মিলন!

'অশোক গুচ্ছে'র 'দাও দাও একটি চুম্বন' কবিতার আলোচনা ইন্দ্রিয়াশ্রিত

প্রেমকবিতার ক্ষেত্রে আলোচনা করিয়াছি। এখন আদর্শান্বিত প্রেমকবিতার উদাহরণ রূপে 'গোলাপগুচ্ছে'র 'প্রথম চুম্বন' ও 'শেষ চুম্বন' কবিতাদুইটি গ্রহণ করিতেছি। প্রথম চুম্বনের গৌরব-কীর্তন করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন :

না জানি কি নিধি দিয়া গড়িল চতুর বিধি,
প্রথম চুম্বন।.........
অজানা সুরভি ঘ্রাণে,
কি জানি কি জাগে প্রাণে,—
কোকিলা ঝঙ্কার ছাড়ে মাতায় ভুবন।
আগ্রহে দম্পতি করে প্রথম চুম্বন!......
নব বক্ষে নব মুখ,
নব ধর্ম, নব যুগ,
নব শশী হেসে সারা প্লাবিয়া ভুবন!
জোৎস্নার আবছায়ে যৌবন নেশার ঝোঁকে,
মধুর মধুর এই প্রথম চুম্বন!

পুনশ্চ, শেষ চুম্বনের মহিমা প্রকাশ করিয়া কবি বলিতেছেন :

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!
জীবনের রত্নাগার একেবারে করি খালি,
অভাগারে ফাঁকি দিয়ে মরণে দিতেছ ডালি!
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!
লয়ে ও হীরার কুচি, চক্ষের সলিল মুছি,
দরিদ্র করিবে, সখি, জীবন-যাপন
দাও, দাও, বিদায় চুম্বন!......
একি! একি! একি গোল! একি রোদনের রোল!—
সব শেষ; তারি সমাচার?—
দাও তবে প্রাণ-ভরা শেষ উপহার।
সুধা-হলাহল ওই চুম্বন তোমার!

এখানে ইন্দ্রিয়তৃষা গৌণ, প্রাণের তৃপ্তিই মুখ্য।

হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' দুই খণ্ড (১৮৭০, ১৮৮০) আলোচনা করিলে আমরা মাত্র ছয়টি প্রেমের কবিতা পাই—'কামিনী কুসুম', 'হতাশের আক্ষেপ', 'প্রিয়তমার প্রতি,' 'কোন একটি পাখীর প্রতি', 'উন্মাদিনী', 'এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী?'।

হেমচন্দ্রের এই কবিতাগুলি পড়িলে একথাই মনে হয়, গীতিকাব্যের মূল রহস্যটি কবির অনায়ত্ত ছিল। গীতিকাব্যের প্রধান উপজীব্য, বস্তুর নির্যাস,

বস্তু নহে হেমচন্দ্র বস্তুর নির্যাস যে সত্য তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, তাই তথ্য প্রাধান্য লাভ করিয়া কবিতাকে ক্ষুণ্ন করিয়াছে। এই কবিতা-গুলিতে হেমচন্দ্র প্রকৃতির পটভূমিকায় প্রেমকে স্থাপন করিয়া উপভোগ করিতে চাহিয়াছেন। এই কাজ বহু মহৎ কবিই করিয়াছেন। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের মূল কৌশল ছিল ইহাই। বিদ্যাপতিরও তাহাই। বিরহী চিত্তের দুঃখ প্রকৃতিতে আপতিত করিয়া বিদ্যাপতি এক মুহূর্তেই প্রেমকে অসামান্যতা দান করিয়াছেন। 'এ ভরা বাদরে, মাহ ভাদরে,' অশ্রান্ত ধারা বর্ষণে স্নাতা পৃথিবী বিরহী চিত্তের প্রেমকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু প্রেমকে উদ্বেলিত করিয়া তোলার এই কৌশল নিপুণ কারিগরের সাধ্য, আনাড়ি কামারের পক্ষে তাহা অসাধ্য। রূপকর্মে শব্দচয়নে আশ্চর্য দক্ষতা ছিল বলিয়াই বিদ্যা-পতির পক্ষে এই দুঃসাধ্য সম্ভব হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের এই নৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম হাত ছিল না, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। 'কামিনী-কুসুম', কোন একটি পাখীর প্রতি', 'প্রিয়তমার প্রতি', 'হতাশের আক্ষেপ' : প্রতিটি কবিতা সম্পর্কেই এ-কথা সত্য। 'প্রিয়তমার প্রতি' শীর্ষক কবিতার কয়েকটি চরণ এখানে উদ্ধার করিতেছি :

প্রেয়সি রে, অধীনেরে জনমে কি ত্যজিলে ?
এত আশা ভালবাসা সকলি কি ভুলিলে ?
অই দেখ নব ঘন গগনে আসিয়ে পুনঃ,
মৃদু মৃদু গরজন গুরু গুরু ডাকিছে,
দেখ পুনঃ চাঁদ আঁকা, ময়ূর খুলিয়ে পাখা,
কদম্বের ডালে ডালে কুতূহলে নাচিছে !······
ত্যজিবে কি প্রাণ সখি ? ত্যজিতে কি পারিবে ?
কেমনেসে স্নেহলতা এ জনমে ছিঁড়িবে ?
আজি এ পূর্ণিমা নিশি প্রিয়ে কারে দেখাবে ?······
অই দেখ চক্রবাক, ডাকে অমঙ্গল ডাক,
বলে সুধাইবে কারে, কে বাসনা পুরাবে ?
তবু মন সমর্পণ, করেছিল যেই জন,
তারে কাঁদাইলে, হায়, প্রণয় কি জুড়াবে ?

এই কয় চরণই যথেষ্ট। বর্ষার কবি বিদ্যাপতি ও রবীন্দ্রনাথ যে বস্তু হইতে কাব্যসত্যের নির্যাস বাহির করিয়াছেন, হেমচন্দ্র তাহা হইতে তথ্য আহরণ করিয়াছেন। সেই জন্যই এই ধরণের প্রেমকবিতাগুলি সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। অথচ সার্থক আদর্শায়িত প্রেমকবিতায় পরিণত হইবার সুযোগ এগুলির ছিল। 'হতাশের আক্ষেপ' কবিতাটি বহু পরিচিত। 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে !' প্রমুখ ছত্রগুলি সুপরিচিত। এখানে কৈশোর-

প্রেমের স্মরণে নাটকীয় রস জমাইবার সম্ভাবনা ছিল ; কারুকর্ম ও ভাব-গ্রন্থন-নৈপুণ্যের সহজাত অভাবে ইহা গন্ড-বিলাপে পরিণত হইয়াছে।

হেমচন্দ্রের কবিতায় যে গুণের অভাব ছিল, তাহা কবির অনুজ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় পূর্ণ মাত্রায় ছিল। শব্দচয়নে ও রূপকর্মে দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে একটি কাব্যপ্রতিমা গড়িয়া তোলার স্বাভাবিক ক্ষমতা ঈশানচন্দ্রের ছিল। তাঁহার 'বাসন্তী' (১৮৮০) কাব্যে আদর্শান্বিত প্রেমকবিতার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশানচন্দ্রের "ভুলে যাও' না বলিলে ভুলিতাম তায়" কবিতাটি প্রেমাবেগ প্রকাশের একটি অভিনব উদাহরণ। কবি প্রথমে বলিয়াছেন :

'ভুলে যাও' না বলিলে ভুলিতাম তায়।
দূর হতে ম্লান মুখে, না চাহিলে আমা পানে,
ভাসিয়া যাইত প্রেম এই নিরাশায়।
বুঝাতেম হৃদয়েরে ত্যজিতাম এ দুরাশা,
'অভাগিনী' না বলিলে কথায় কথায়।
ভুলিলে সে সুখে রবে, সে কথা বলিতে যদি
ভুলিয়ে হ'তেম সুখী কিন্তু তা ত নয়।

প্রেমের চারিদিকে যে সূক্ষ্ম ভাবাসঙ্গ রচিত হয়, এখানে তাহারই আলোচনা। তারপর কবি পূর্বস্মৃতি-চারণা করিয়াছেন। প্রেমের অসহ্য আবেগকে লুকাইয়া রাখিবার কী আপ্রাণ প্রয়াস !

নহে দিন—নহে মাস নহেক বৎসর।
পঞ্চম বৎসর আজ, লুকায়ে রাখিয়াছিনু,
এই নিরাশার স্রোত প্রাণের ভিতর।......
দারুণ যন্ত্রণা এত সহি নিরন্তর।
তবু কি ভুলিতে তায়, পারিয়াছি একদিন,
তবু কি যাতনা কভু ভেবেছি কঠোর।

যাহা ভুলিবার নয়, তাহাকে ভুলিবার কী মর্মান্তিক প্রয়াস! তারপর কবি সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার সুফল প্রকাশ করিয়াছেন। প্রেমের প্রথম আবির্ভাব স্মরণে কবি বলিতেছেন :

জীবনের রঙ্গভূমে প্রথমে যখন—
বিশ্ববিমোহিনী রূপে, প্রবেশিলে ধীরে ধীরে
সেই কথা আজ সখি হতেছে স্মরণ॥
দুইটি বৃহৎ আঁখি, অনিন্দ্য বদনখানি,
নিরখিয়া কি চঞ্চল হয়েছিল মন!
অতৃপ্ত হৃদয়ে সেই, প্রথমে দেখিয়াছিনু,
অতৃপ্ত হৃদয় সেই রহিল এখন॥

প্রেমের স্থূল ইন্দ্রিয়োপভোগকে অতিক্রম করিয়া যে একটি আত্মবিশ্লেষণ ও

অধিকার করিয়া তৃপ্তিলাভের আশায় পিপাসা এই কাব্যে অন্তঃস্রোত হইয়া আছে। 'কড়ি ও কোমলে'র প্রেম একান্ত পার্থিব প্রেম—রূপজ দেহজ প্রেম। ইন্দ্রিয়জ ভোগের হর্ষবিলাস, যৌবনসুলভ আকাঙ্ক্ষা এ কাব্যের কবিতাগুলিকে একটি সহজতার অনুপম রূপ দিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতিতে, দৈনন্দিনের তুচ্ছতায়, নারীর রূপে, যেখানেই যে সৌন্দর্য মানুষের ইন্দ্রিয়ের অন্তরে স্পর্শ করিতে পারে, তাহাকেই কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।" (শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, 'কবিগুরু' পৃঃ ১৪১)। ইন্দ্রিয়াশ্রিত ভোগের আবেগে এই কাব্য মুখরিত। তখন কবির মনে হইত, 'আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ। ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।' এই কাব্যের সনেটগুলি ইন্দ্রিয়াশ্রিত ভোগের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। 'বাহু' শীর্ষক সনেটেই তিনি বলিয়াছেন:

কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা,
কাহারে কাঁদিয়া বলে যেয়ো না যেয়ো না।
কেমনে প্রকাশ করে ব্যাকুল বাসনা,
কে বুঝেছে বাহুর নীরব আকুলতা।

কিন্তু এই ভোগাকাঙ্ক্ষার সহিত একটা অতৃপ্তির বেদনা লুকাইয়া আছে। তাই 'বন্দী' শীর্ষক সনেটে কবি আর্তনাদ করিয়াছেন:

দাও খুলে দাও সখী ওই বাহুপাশ
চুম্বন-মদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান।
কোথায় উষার আলো কোথায় আকাশ
এ চির পূর্ণিমা রাত্রি হ'ক অবসান।
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ।

তাই 'শেষ কথা' বলিতেছেন:

মনে হয় কী একটি শেষ কথা আছে,
সেইটি হইলে বলা সব বলা হয়,
কল্পনা ফিরিছে সদা তারি পাছে পাছে,
তারি পানে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়।

ইহার পরই 'মানসী' কাব্য রচিত হয়। "এ কাব্যের সর্বত্র বাস্তবের রূঢ়তার সহিত দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত মানবাত্মার আর্তক্রন্দন, প্রবল নৈরাশ্য, ভোগাকাঙ্ক্ষার উপরে আত্মার ক্ষুধার জয়লাভ, স্পষ্ট আধ্যাত্মিক আকুলতা এবং 'মর্মের কামনা' মানসীকে ধ্যানযোগে লাভের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।" (শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, 'কবিগুরু' পৃঃ ৫৪-৫৫)। 'মানসী' কাব্যে

রবীন্দ্রনাথ প্রেমের মহারহস্যের তাৎপর্য বুঝিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন। 'ওগো, ভাল করে বলে যাও' কবিতাটিতে এই ঔৎসুক্যের পরিচয় পাই। যাহা এমন করিয়া হৃদয় ও মনকে গ্রাস করে, বুদ্ধি এমন কি চেতনাকে অবলুপ্ত করিয়া দেয়, যাহার স্বপ্ন অর্ধেক তন্দ্রা, অর্ধেক সম্বিৎময় একটি অনুভূতি, বাক্যের দ্বারা যে অনুভূতিকে প্রকাশ করা যায় না, যাহা অন্তঃকরণকে মথিত করে এবং আচরণে একটা উন্মাদ আবেগ আনে, সংসারক্ষেত্রে যাহা অনেক সময় কষ্টের সহিত বিজড়িত, তাহাকে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য কবি আকুল। বুঝা মানেই এক প্রকার মুক্তি। প্রেমের রহস্য যে ব্যাখ্যার অতীত, তাহা 'মৌন ভাষা' কবিতায় কবি স্বীকার করিয়াছেন; প্রেমের অনন্ত রহস্য প্রকৃতির রূপে ও বিশ্বসৌন্দর্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে: 'কথায় ব'লো না তাহা আঁখি যাহা বলিয়াছে।' কেননা মোহভঙ্গের আশংকা আছে। 'অপেক্ষা' কবিতায় প্রেমের সর্বনাশা সব-ভুলানো রূপটি কবি দেখাইয়াছেন:

আঁধারে যেন দুজনে আর
　　দু-জন নাহি থাকে।
হৃদয়মাঝে যতটা চাই
ততটা যেন পূরিয়া পাই,
প্রলয়ে যেন সকল যায়।
　　হৃদয় বাকি রাখে।
হৃদয় দেহ আঁধারে যেন
　　হয়েছে একাকার।
মরণ যেন অকালে আসি
দিয়েছে সব বাঁধন নাশি,
ত্বরিতে যেন গিয়েছি দোঁহে
　　জগৎ-পরপার।
দু-দিক হতে দু-জনে যেন
　　বহিয়া খরধারে
আসিতেছিল দোঁহার পানে
ব্যাকুলগতি ব্যগ্রপ্রাণে,
সহসা এসে মিশিয়া গেল
　　নিশীথ-পারাবারে।

এই কবিতাগুলিতে যৌবন-আবেগ একটা দেহাতীত নিশ্চিন্ত নির্ভরের ব্যাকুল অন্বেষণে উদ্ভ্রান্ত।

'সংশয়ের আবেগ' কবিতায় প্রেমের প্রকৃতির পরিচয় দিতে গিয়া

কবি দেখাইয়াছেন যে, বাস্তব ক্ষেত্রে প্রেমের সহিত তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অধীরতা, সংশয়ের আন্দোলন বিজড়িত থাকে :

ভালবাস কিনা বাস বুঝিতে পারি নে,
তাই কাছে থাকি।
তাই তব মুখপানে রাখিয়াছি মেলি
সর্বগ্রাসী আঁখি।
তাই সারা রাত্রিদিন শ্রান্তি-তৃপ্তি-নিদ্রাহীন
করিতেছি পান
যতটুকু হাসি পাই, যতটুকু কথা,
যতটুকু গান।.........
জানি যদি ভালবাস চির-ভালবাসা,
জনমে বিশ্বাস।
যেথা তুমি যেতে বল সেথা যেতে পারি,
ফেলি নে নিশ্বাস।......
নহে তো আঘাত করো কঠোর কঠিন
কেঁদে যাই চলে।
কেড়ে লও বাহু তব ফিরে লও আঁখি,
প্রেম দাও দলে।
কেন এ সংশয়-ডোরে বাঁধিয়া রেখেছ মোরে।
বহে যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে,—প্রেম নহে ফাঁকি
প্রাণ নহে খেলা।

'আত্মসমর্পণ' কবিতায় দেখি প্রেম স্বতঃই পূজা ও আত্মনিবেদনে আত্মপ্রকাশ করিতে চায় ; কলহান্তরিতা প্রেয়সীকে ধ্যানলোকের মানসীরূপে দেখিতে চায়। প্রেমকে জীবনের একটা আংশিক সত্যভাবে দেখিয়া প্রেমিকের তৃপ্তি নাই, ইহাকে সর্বব্যাপী উপলব্ধিরূপে পাইতে চায়। তাই কবির সংকল্প :

তবে লুকাব না আমি আর
এই ব্যথিত হৃদয়ভার।
আপনার হাতে চাব না রাখিতে
আপনার অধিকার।
বাঁচিলাম প্রাণে তেয়াগিয়া লাজ,
বদ্ধ বেদনা ছাড়া পেল আজ,
আশা নিরাশায় তোমারি যে আমি
জানাইনু শতবার।

কিন্তু বাস্তব জীবনে প্রেমের আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী, এই সত্যটিও

'মানসী' কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎ ও সাংসারিক জীবনের কঠোর সত্যের সহিত আমাদের অন্তরতম ব্যাকুলতার কোন সঙ্গতি নাই—ইহাই এ কাব্যের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়াছে। এই অসঙ্গতি পার্থিব প্রেমের ইতিহাসে সর্বত্র পরিস্ফুট। কখনো হাস্যকর অসঙ্গতি ('বঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ'), কখনো সুকরুণ ব্যর্থতা ('বধূ'), কখনো দৈহিক সম্পদের নিকট আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের অপমান ('গুপ্ত প্রেম')। কেবল সংসারের অসঙ্গতি নহে, সনাতন সত্য অসঙ্গতিও আছে। প্রণয়িযুগলের মধ্যে প্রথম উন্মত্ততা শেষ পর্যন্ত করুণ ট্রাজেডিতে পরিণত হয়—'নারীর উক্তি', 'পুরুষের উক্তি', 'ভুলে' 'ভুল ভাঙা', 'ব্যক্ত প্রেম' ;—সংসার ও প্রেমের দ্বন্দ্বে জীবনের কী নিদারুণ অপচয়! ইহার সুন্দর প্রকাশ 'ভুল ভাঙা' কবিতাটি :

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই—
থামিল বাঁশি।
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি।
মধু নিশা গেছে, স্মৃতি তারি আজ
মর্মে মর্মে হানিতেছে লাজ।
সুখ গেছে, আছে সুখের ছলনা
হৃদয়ে তোর
প্রেম গেছে, শুধু আছে প্রাণপণ
মিছে আদর।

ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী এখানেই শেষ নহে। প্রেমে বঞ্চনা ও ব্যর্থতায় বাস্তবে প্রেমের স্বর্গলোকের অবসান হয়, এই নিষ্ঠুর সত্য প্রকাশ পাইয়াছে 'তবু', 'বিচ্ছেদের শান্তি', 'বিরহানন্দ', 'ক্ষণিক মিলন', 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা' কবিতায়। পুনশ্চ, তথাকথিত সার্থক প্রেমের মধ্যেও ব্যর্থতার বীজ লুকানো আছে। রূপ প্রেমের আকাঙ্ক্ষাকে উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু রূপের একান্ত সম্ভোগেও আত্মার তৃপ্তি নাই ('হৃদয়ের ধন')। রূপ আকাশের নীলিমার ন্যায় একটা মায়া মাত্র, ইহাকে ধরা যায় না ('নিষ্ফল প্রয়াস')। কিন্তু প্রেমাস্পদের আত্মা—তাহাও তো অনায়ত্ত, আত্মিক মিলন তো ঘটে না ;—তাই 'নিষ্ফল কামনা'য় কবি বলিতেছেন যে, এই ব্যর্থ প্রয়াসের জন্য অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই :

বৃথা এ ক্রন্দন।
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত-বাসনা। ......
বৃথা এ ক্রন্দন।
হায় রে দুরাশা,
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস তাই ভালো,

হাসিটুকু কথাটুকু।
নয়নের দৃষ্টিটুকু।
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস।
কী বা আছে তোর,
কী পারিবি দিতে।
আছে কি অনন্ত প্রেম?
শতদল উঠিতেছে ফুটি;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্য-বিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো. প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।
শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই।

আত্মায় আত্মায় মিলন সহজে ঘটে না, এ মিলন চাহিলে ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। এই 'ক্রন্দন'ই বাস্তব জীবনের প্রেমের শেষ কথা। তবে প্রতিদান না পাইলেও প্রেমিক নিজ হৃদয়ের প্রেমের মধ্যে এক অসামান্য মাধুর্য ও অসীম গৌরবের সন্ধান পান। প্রেমিকের স্বপ্নই তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, কল্পলোকেই প্রেমের সার্থকতা ('আমার সুখ')।

এইরূপে 'মানসী' কাব্যের ভিতর দিয়া কবিজীবনের একটী পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি। প্রেম স্থূল কামনা ও ইন্দ্রিয়জ ভোগের রাজ্য ছাড়িয়া ক্রমেই অন্যলোকে অগ্রসর হইতেছে। নর্মসখী ক্রমে মানসসুন্দরী হইয়া উঠিতেছে। এই পরিবর্তনের সূক্ষ্ম তাৎপর্যটি 'সুরদাসের প্রার্থনা'য় নিহিত আছে। এই কবিতাটি যেন রবীন্দ্রনাথের প্রেমাভিজ্ঞতার রূপক। সপ্তম স্তবকের শেষে যে আত্মবিলাপ রহিয়াছে তাহা "মানসী"র কবিরই অন্তর্গূঢ় ভাব, দশম স্তবকে যে আদর্শ ফুটিয়াছে তাহাই কবির 'মানসী প্রতিমা'। নর্মসখী হইতে মানসসুন্দরীতে উত্তরণের স্পষ্ট পরিচয় এই কবিতায় লিখিত আছে। এই কবিতায় এই সত্যই ফুটিয়াছে: কামনার স্তর উত্তীর্ণ হইলেই মানসীকে পাওয়া যায়; ভোগের মিলনে নহে, ধ্যানেই তাহাকে লাভ করা যায়:

তবে তাই হ'ক, হয়ো না বিমুখ,
দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি !
হৃদয়-আকাশে থাক্ না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি !
বাসনা-মলিন আঁখি-কলঙ্ক
ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল
চিরদিন রবে পায় !
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা,
হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব,
অনন্ত বিভাবরী ।

'মানসী' কাব্যে একটা তীব্র আধ্যাত্মিক নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। ভোগলিপ্সু মনের অন্তরালে যে মহত্তর আত্মা রহিয়াছে তাহা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তব জগতে ভোগের দ্বারা আত্মার পরিতৃপ্তি হয় না। আমাদের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির সহিত পারিপার্শ্বিক জীবন ও অবস্থার কোনো সঙ্গতি নাই ; এই অসঙ্গতি ও তজ্জনিত ব্যর্থতা কবিকে নিরন্তর পীড়িত করিতেছে। তাই 'বৃথা এ ক্রন্দন'। জীবনের 'অনন্ত অভাবের' বোধ এবার জাগ্রত হইয়াছে। 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় এই আত্মার ক্ষুধার পরিচয় আছে। কবিজীবনের সাধনার যাহা লক্ষ্য তাহার স্থান বাস্তবলোকে নহে, ধ্যানলোকে সে 'মানসী'। 'মর্মের কামনা' যখন গাঢ়তম ও গভীরতম হয় তখন আমরা বাস্তবকে যে বাস্তবাতীত অপরূপ মূর্তিতে দেখি তাহাই মানসী। 'সোনার তরী'তে আসিয়া কবি এক ধাপ অগ্রসর হইলেন। এই সময় হইতে রবীন্দ্র-কাব্যে একটী অলৌকিক অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। এখন হইতে কবিকে চালাইতেছে ও তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে অন্য এক অদৃশ্য মহৎ সত্তা। 'মানসসুন্দরী' কবিতা এই শক্তির প্রতি কবির আনুগত্য জ্ঞাপনে ও উহার জয়গানে মুখরিত হইয়াছে। এ আলোচনা পরে হইবে।

প্রেমের কবিতাতেও এই সময়ে একটা পরিবর্তন দেখা যায়। প্রেমের আকর্ষণ মূলতঃ অতিবাস্তবের আকর্ষণ : এই উপলব্ধি এখন কবির মনে ফুটিয়াছে। 'সোনার তরী' কাব্যে প্রেমের মধ্যেও যে একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য আছে তাহার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'মানসসুন্দরী'তে কবির যৌবনস্বপ্নবিভোর কবিকল্পনা অতীন্দ্রিয় প্রেরণাকেও লাবণ্যময়ী প্রেমসোহাগিনী প্রেয়সীরূপে অনুভব করিয়াছে— সুতরাং ইহাকে 'আমার যৌবনস্বপ্নে ছেয়ে গেছে বিশ্বের আকাশ'—এই

রূপমুগ্ধতার বাস্তব রূপায়ণ রূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রেমের আকুল আবেগ যেন সৌন্দর্যসৃষ্টির আকৃতির প্রতি আরোপিত হইয়াছে।

'মানসসুন্দরী'তে যদিও বাস্তবজীবনে সাংসারিক সম্পর্কের মধ্যে প্রেমের বিজয়সিংহাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে, তত্রাচ সেখানেও প্রেম একটা বহুজন্মব্যাপী রহস্যলীলার সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। প্রেমের নূতন অধ্যাত্ম-গৌরব স্পষ্ট রূপে কবি প্রকাশ করিয়াছেন।

"তাঁর বাসনাবাসিনী প্রাণপ্রিয়ার প্রেম ও রূপবৈভব থেকে এই বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যলীলা, আবার বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রূপসম্ভারে সেই প্রাণপ্রেয়সীরই প্রেমলীলার স্মৃতি। দুই-ই অন্যোন্যভাবে বিজড়িত: একে অপরকে ছেড়ে অর্থহীন, তাৎপর্যবিহীন। সৃষ্টির শৈশবে কবে যেন তাঁর প্রেমপ্রেয়সীকে খেলার সঙ্গিনীরূপে তিনি পেয়েছিলেন, তারপর বহুকাল হয়েছে গত, খেলার সেই বিশেষরূপা সঙ্গিনীটি আজ মর্মের গেহিনী, জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কবি আজ তার সীমা পান না।" (শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী' পৃ ৫৫)। তাই কবি সুগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন:

'ছিলে খেলার সঙ্গিনী—
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।'

কবি বহুজন্মের প্রেমের রোমান্স সৃষ্টি করিয়াছেন:

'মানসীরূপিণী ওগো, বাসনাবাসিনী,
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমি কি গো, মূর্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী। এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে।'

এই মানসসুন্দরীর প্রতি কবির ব্যাকুল জিজ্ঞাসা:

'সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা। এই মর্তভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?'

'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় এই জিজ্ঞাসার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে; কবি এখানে আরো ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন:

'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?……
এখন বারেক শুধাই তোমায়—
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,

আছে কি শান্তি আছে কি তৃপ্তি
তিমির তলে।'

এই কবিতাগুলিতে সর্বজগদ্‌গত প্রেমের উদ্দেশে যাত্রা সূচিত হইয়াছে। কবি প্রেমের ভাষা ও ভাব, উহার চিত্তব্যাকুলতার মধ্য দিয়া এক অনন্ত রহস্যএষণার আবেগ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রেম এখানে সমুদ্রগামী নদীর ন্যায় এই রহস্যানুসন্ধানের মধ্যে বিলীন হইয়াছে।

এখন প্রেমের আকর্ষণ যে মূলতঃ অতিবাস্তবের আকর্ষণ, তাহার অন্যতর প্রমাণ এই যে 'ঝুলন' ও 'হৃদয়যমুনা'য় দেখিতে পাই মৃত্যুর রহস্য যেন প্রেমের রহস্যের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। 'ঝুলন' কবিতায় কবির দৃপ্ত ঘোষণা :

আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে
মরণখেলা
নিশীথবেলা।.........
তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণ দোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা ;
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলনখেলা।

প্রেমমোহ হইতে মুক্তিলাভের উচ্ছ্বসিত আনন্দ-বেদনাই এখানে ছন্দোল্লাসে বিধৃত হইয়াছে।

'হৃদয়যমুনা'য় কবি আহ্বান জানাইয়াছেন :

যদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে।
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর—
নাহি তল নাহি তীর
মৃত্যুসম নীল নীর
স্থির বিরাজে।

এই দুইটি কবিতায় 'মরণ' শব্দটি নবতর ধ্বনিমাধুর্য ও আস্বাদ্যমানতা লাভ করিয়াছে। প্রেমবিরহের বিশেষ মুহূর্তে রস-বিলাসের যৌবন-বেদনায় মরণ অপ্রত্যাশিত জীবনরহস্যের অমিতোল্লাস বহন করিয়া আনে, এখানে তাহারই ইঙ্গিত। 'দুর্বোধ' কবিতায় কবি 'অন্তহীন রহস্যনিলয়' প্রেমিক-হৃদয়ের 'নব নব ব্যাকুলতা' ব্যাখ্যা করা যে অসম্ভব, তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন :

এ যে সখী, হৃদয়ের প্রেম
সুখ দুঃখ বেদনার
আদি অন্ত নাহি যার।
চিরদৈন্য চিরপূর্ণ হেম।
নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাতে
তাই আমি পারি না বুঝাতে॥

'প্রতীক্ষা' কবিতায় কবি মৃত্যুকে জীবন-অন্তিমে আহ্বান জানাইয়াছেন :

ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে
এসো বরবেশে ;
আমার পরানবধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালবেসে
ধরিবে তোমার বাহু ; তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি নিয়ো,
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বনদানে
পাণ্ডু করি দিয়ো।

"এই কবিতায় চেতনগভীরে মৃত্যুর স্তব্ধ-গভীর রূপটি অত্যন্ত স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে। জন্মাবধি প্রাণের গোপন গহনে স্থান নিয়ে বসে আছে মৃত্যু। প্রাণপ্রেয়সীর পাশাপাশি তার স্থান। 'চপল চঞ্চল প্রিয়া' তাকে ধরা দিতে চায় না, স্থির হয়ে বসে না মুহূর্তকাল, তবু মৃত্যু জানে ধরা সে দেবে, বশ মানবে, সঙ্গে যাবে তার।

'ক্রমে সে পড়িবে ধরা গীত বন্ধ হয়ে যাবে
মানিবে সে বশ।'

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়টি এই : জীবনের পাশেই মৃত্যুর স্থান হয়েছে ; উভয়ের মধ্যে একটি প্রেমের সম্বন্ধও কবির উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে। জীবন চঞ্চল, মৃত্যু তাকে প্রেমে বশ করে নিয়ে যাবে—এ-কল্পনা সত্যসত্যই নূতন, এর তাৎপর্যও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।" (শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের সোনারতরী', পৃ ৯১-৯২)।

বাস্তবজগতে প্রেমের বৃথা সন্ধান, প্রেমের ব্যাখ্যাতীত রহস্য, সংসারে অধীরতা ও সংশয়ের তীব্রতা, প্রেমাস্পদের সহিত আত্মিক মিলনের জন্য বৃথা ক্রন্দন 'মানসী' কাব্যে আছে। প্রেমাকর্ষণ মূলতঃ অতিবাস্তবের আকর্ষণ, প্রেমের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় রূপ, প্রেমিকহৃদয়ে অন্তহীন রহস্যনিলয়—ইহার পরিচয় 'সোনার তরী'তে আছে। বলেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ ও প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর প্রেমকবিতায় ঠিক এই পরিচয়ই পাই।

বলেন্দ্রনাথের 'শ্রাবণী' কাব্যের 'অন্তরবাসিনী' সনেটটির সহিত 'সোনার তরী'র 'হৃদয়যমুনা' কবিতার বর্ণনায় মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

আজি বর্ষা গাঢ়তম ;
নিবিড় কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম
দুইটি তীরে।

বলেন্দ্রনাথ এই সনেটে বলিয়াছেন :

মেঘ নামিয়াছে আজি ধরণীর গায়
তুমি এস নেমে এস হৃদয়গুহায়
অন্তরের মাঝে, অয়ি অন্তরবাসিনি।
ঘনায়ে আসুক আরো তিমির-যামিনী
তব চারি ধারে, ঘন ঘন গরজনে
পরিপূর্ণ হোক্ দশ দিশি, সন সনে
বহুক পবন খর বেগে ; তুমি রহ
অহরহ পূর্ণ করি' সকল বিরহ
অন্তর-মন্দির-মাঝে ; তব স্নেহছায়ে
সজীব হইয়া উঠে নব মহিমায়
পুরানো বিরহ যত কুঞ্জ-অভিসার
ঝঞ্ঝা ঘন-গরজন শ্রাবণ নিশার ;
মত্ত দাদুরীর রোলে দ্বিধা কেকারবে
তুমি যেন ভরি উঠ সর্ব অবয়বে।

'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত', 'আকাঙ্ক্ষা', 'বর্ষার দিনে', 'একাল ও সেকাল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে তত্ত্ব উপস্থিত করিয়াছেন এখানে তাহাই বর্তমান। বর্ষা মানুষের অন্তর্গূঢ় নিবিড় আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইয়া তোলে, মানবহৃদয়ে বিরহ জাগাইয়া তোলে, বর্ষাতেই মানুষ প্রেম ও বিরহের চিরন্তন স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে : রবীন্দ্রনাথের এই প্রিয় তত্ত্বের প্রতিধ্বনি এই কবিতায় পাওয়া যায়।

সুধীন্দ্রনাথও এই পথের পথিক। তাঁহার 'দোলা' কাব্যে 'মানসী' 'সোনারতরী' কাব্যের প্রেমরূপের পরিচয় আছে। 'নিষ্ফল প্রয়াস', 'পরিতাপ' প্রমুখ কবিতার নামপরিচয়ে বুঝা যায় তাহারা 'মানসী' কাব্যের প্রেমচিন্তার অংশভাগী—বাস্তব সংসারে প্রেমের বৃথা সন্ধান ও তাহার জন্য নিষ্ফল ক্রন্দন এ সকল কবিতায় আছে।

কত রাত্রি কত দিন জীবন মরণ
কত কিছু ভেসে গেছে নিয়ত যেমন
আমি ছিনু অন্যমনে!

সবারে করিয়া দূর ছাড়ি সব কাজ
নেমেছিনু হৃদি-সিন্ধু অতলের মাঝে
ওই মুখ অন্বেষণে !···
দেখেছিনু স্বপ্নে তারে, নিমেষের মাঝে
ঝলসিয়া চলি' গেল আলোকের সাজে
বিমানে বিজুলী পারা।
কোথা আঁখি কোথা দিঠি কোথা মুখখানি,
সব নিয়ে রেখে গেল শুধু ভাবখানি,
আমি খুঁজে হ'নু সারা !
বৃথায় কাটিল দিন নিষ্ফল প্রয়াসে,
স্বপনের ধনে ফিরে' ধরিবার আশে
বৃথা ঘুরি দিশাহারা !
('নিষ্ফল প্রয়াস')

এ-তো সেই কথাই! স্বপনের ধনকে বাস্তব সংসারে আয়ত্ত করিবার নিষ্ফল প্রয়াস।

কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের আদর্শায়িত প্রেমকবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ প্রেমকবিতার মিল আরো গভীরে। 'হৃদয়যমুনা' কবিতা আমরা ইতঃপূর্বেই উদ্ধার করিয়াছি। সুধীন্দ্রনাথের 'হৃদয়যমুনা' কবিতাটিতে আছে :

হৃদয়-যমুনায় ঐ ভাঙা তরী বাহি।
অনুরাগে ঝিরি ঝিরি
বায়ু বহে ধীরি ধীরি,
কূল হতে কূলে ফিরি
কোন বাধা নাহি।······

তারপর শীতে, বসন্তে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় এই তরী বাহিবার অনুপম বর্ণনা আছে। শেষে কবি স্বতঃস্বীকৃত সত্যের আবৃত্তি করিতেছেন :

আমি নিশিদিন এই ভাঙা তরী বাহি।
সারা ঋতু সারা বেলা
ভাসাইয়া প্রেমভেলা
হৃদি মাঝে করি খেলা
কোন কাজ নাহি।
আমি নিশিদিন এই ভাঙা তরী বাহি ॥

তবে এখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতার গভীর ব্যঞ্জনা, রহস্যঘন অতল ভাবনিমজ্জনের কোন আভাস পাওয়া যায় না।

'ভিখারী' কবিতাটিতে কবি নিজেকে প্রেমের ভিখারীরূপে প্রেমের

দেবী প্রেয়সীর নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। এখানেও প্রেমরহস্যের সহিত মৃত্যুর একটি যোগ লক্ষ্য করা যায় :

ভিখারী এসেছি আমি চরণের মূলে
যাহা দেবে দাও তুমি নিজ হাতে তুলে !·····
কিছু নাহি চাহি শুধু দুটি হাত ধরে
অধর-নির্ঝর হতে হাসি দাও ভরে !······
কিছু নাই! ফিরিব কি দুটি শূন্য হাতে !
সব আশা ব্যর্থ হবে আজি এ নিশাতে !
তবে ঐ অলক্তবরণ
নূপুর-শিঞ্জিত চরণ
হৃদি 'পরে তুলে দাও মরণ সাধাতে !

তারপর 'অদৃষ্টদেবী' কবিতায় মানসসুন্দরীর দেখা পাই :

কে তুমি রয়েছ মোর অন্তরের মাঝে
বিচিত্ররূপিণী! কত দিন কত সাজে
হেরেছি তোমায় ;······জানি শুধু এই ভবে
প্রথম জনমে ভ্রূণসম এনু যবে,
তুমি এলে সাথে ; শত জনমে জনমে
জীবন মরণে মোর সকল করমে
তুমি চির রবে ;—নাড়ীতে নাড়ীতে রহি।
························পরাণ বুভুক্ষু
নিশিদিন প্রাণপণে কেমনে না জানি
তোমা হতে প্রাণরস লইতেছে টানি।······
চিরতরঙ্গিত এই জীবন-সাগরে
এত দূর আনিয়াছ তুমি হাত ধরে ;
যাহা ঘটিয়াছে মন হতে দূর করে
এবে তোমা কাছে যাচি—জান ত সুন্দরি
অন্তরের মাঝে মোর দিবস শর্বরী
কি আশা জাগিয়া আছে, তাহে পূর্ণ করি'
জীবনের সুধাপাত্রখানি দাও ভরি'—
তারপর রথচক্র তলে বাঁধি মোরে
যেথা খুসি নিয়ে যেয়ো জন্ম জন্ম ধরে'।

এই উদ্ধৃতির পরে আর কোনো ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 'পদ্মা' ও 'গীতিকা' কাব্যে এই একই কবিকর্মের অনুসরণ করিয়াছেন। প্রমথনাথের প্রেমকবিতায় প্রেমের এই আদর্শ দুর্জ্ঞেয় রহস্য, প্রেমিকাকে জীবন-নিয়ন্ত্রিণীরূপে স্বীকৃতি জ্ঞাপন, পরিপুর্ণ

আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা—এ সবই আছে। তাঁহার কয়েকটি সনেট ও কবিতাংশ আলোচনা করিলেই এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

'পদ্মা' কাব্যের 'মানসী' সনেটে প্রমথনাথ বলিয়াছেন :

চির দিন আছ সাথে ছায়াটির মত
অয়ি স্নেহময়ি! বাল্যে মুগ্ধক্রীড়া কত!
রূপকথা কহিতাম সখা-সাথীগুলি
লয়ে কৈশোরে যখন ; সর্ব কর্ম ভুলি
তুমিও আসিতে নিত্য উৎসুক অন্তর
শুনিতে সকল কথা ;—ভাবিতাম পর!
তাই ব্যথা দিয়েছি তোমারে; অকাতরে
করিয়াছি অনাদর। কবে তারপরে
ধরিলে ষোড়শীমূর্তি ; সিঞ্চিলে অমিয়া
জীবনের শূন্য মাঝে! সন্ত তৃষ্ণা দিয়া
চাহিনু বাঁধিতে!—লজ্জার বসন টানি'
চলি গেলে ; তদবধি রক্ত গণ্ডখানি
অসীম রহস্য সম ফিরে স'রে স'রে
তবু ওই দুটি নেত্রে স্নেহ-অশ্রু ঝরে!

নারী এখানে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে; কৈশোরে যে খেলার সঙ্গিনী ছিল, আজ সে হৃদয়রাণী হইয়াছে। 'বিচিত্র বন্ধন' সনেটে কবির সানুরাগ আনুগত্য জ্ঞাপন :

বন্দী করিয়াছ মোরে বিচিত্র বন্ধনে,
অয়ি বিজয়িনি!··· ··· ··· ···
আমি পাইয়াছি ওই শোভা-আভাময়
সুন্দর সরল স্বচ্ছ একটি হৃদয় ;
অধীনের পদে তাই বন্ধনশৃঙ্খল,
নিঃসহ সুখের ভারে হয়েছে অচল! ('গীতিকা')

তাই,

মনে হয় যেন তুমি যাও নাই দূরে ;
পরিচিত কমকণ্ঠে,—রহি মায়াপুরে
ডাকিছ আমারে! সকল ধ্বনির মাঝে
ক্ষীণ খিন্ন মধুস্বর থাকি থাকি বাজে
মানস-শ্রবণে। বসি দূর দূরান্তরে
যে হাসি, যে স্নিগ্ধদৃষ্টি দিতেছ আমারে
বিলাইয়া সর্বক্ষণ, সে লাবণ্য রাশি
স্বর্ণ কুরঙ্গের মত খেলা করে আসি

করুণ স্বপ্নের সনে হৃদি-তপোবনে,
অপূর্ব অমৃতলোকে ! একাকিনী বনে
কুসুম চয়ন করি মালা গাঁথ যবে,
সে সৌরভ, সে পরশ আমারে নীরবে
বহি আনি দেয় বায়ু! স্বপ্নে মোহে মিশি
রয়েছে উজ্জ্বল মোর বিরহের নিশি।
('মুগ্ধবিরহ', 'গীতিকা')

এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছাই যে, সুধীন্দ্রনাথের কবিভাবনার সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিভাবনার ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক ছিল। বলেন্দ্রনাথ ও প্রমথনাথের প্রেমকবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের প্রেমকবিতার সাদৃশ্য ছিল আদর্শায়িত প্রেমের অর্চনায় ও ধ্যানে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের সহিত মিল আরো গভীরে। সুধীন্দ্রনাথের 'অদৃষ্টদেবী' ও রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী' একই জীবনাধিষ্ঠাত্রী দেবীর দুইরূপ বর্ণনা। প্রেমের দুর্জ্ঞেয় রহস্যরূপের বর্ণনায়, মৃত্যুর সহিত প্রেমের সম্পর্ক আবিষ্কারে, বাস্তব সংসারে প্রেমের ব্যর্থ অনুসন্ধানে ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্রীর নিকট আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা প্রকাশে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি পৌছিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনারতরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬)—এই তিন কাব্যের পরিপূরক কাব্য হিসাবে আমরা সুধীন্দ্রনাথের 'দোলা' (১৮৯৬) কাব্যটিকে গ্রহণ করিতে পারি। তবে এ'কথাও অবশ্যস্বীকার্য যে, এই তিনজন রবীন্দ্রনাথের কবিভাবনার গভীরে ও শিল্পরূপের উৎকর্ষে পৌছাইতে পারেন নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে অন্যান্য কবিরাও এই আদর্শায়িত প্রেমের সুরটিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহাদের কবিতায় এই সুরটি ঠিক মতো বাজিয়া উঠে নাই। এই ত্রুটি আন্তরিকতার অভাবের জন্য নহে, রূপকর্মে অনৈপুণ্যের জন্যই। অপ্রধান কবিদের মধ্যে নাম করিতে হয়—রাজকৃষ্ণ রায় (অবসর-সরোজিনী : ১৮৭৬-৮৯), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (কবিতামালা : ১৮৭৭) ; রজনীকান্ত সেন (কল্যাণী : ১৯০৫) ; অতুলপ্রসাদ সেন (গীতিগুঞ্জ) ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার (ফুলশর ১৯০৪, যজ্ঞভস্ম ১৯০৪, হেঁয়ালি ১৯১৫)।

ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ দাবি করিতে পারেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার। আদর্শায়িত প্রেমচিত্রণে তিনি আপাত-বিরোধের মাধ্যমে প্রবল অনুরাগ প্রকাশের পথটি বাছিয়া লইয়াছেন। এই প্রকাশভঙ্গী তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল বলিয়াই এই শ্রেণীর কবিতা সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। 'মোহিনী' কবিতায় ('যজ্ঞভস্ম') বিজয়চন্দ্র বলিয়াছেন :

কেন গো গাহ ? অমি তো গান
শুনিতে চাহিনি।
করুণ ওই গীতিতে
তরুণ হয় স্মৃতিতে
অতীত সুখ সহিত দুখ-কাহিনী।

'আমায় ভালবাসি' কবিতায় ('হেঁয়ালি') তিনি বলিয়াছেন :

বিষাদ যখন ঘনিয়ে এসে বিশ্ব ফেলে গ্রাসি,
তখন তুমি ওগো বঁধু!
চুম্বনেতে ঢাল মধু ;
সেই অমৃতে বিষের জ্বালা নিঃশেষিয়ে নাশি।
তোমায় ভালবাসিনেক', আমায় ভালবাসি !

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহিলা কবিরা কাব্যক্ষেত্রে নূতন পুষ্পমালা উপহার দিয়াছিলেন। এই মহিলা কবিরা বাৎসল্য, দেশপ্রেম, মৃত্যু, শোক, প্রেম, সমাজসংস্কার, প্রকৃতি প্রভৃতি নানা বিচিত্র বিষয়ের উপরে কবিতা লিখিয়াছিলেন। মহিলা ও পুরুষ—এই ভাবে কবিদের শ্রেণীবিভাগ করা সাধারণতঃ যুক্তিযুক্ত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু যে দেশে মাত্র একশত বৎসর পূর্বেও স্ত্রীশিক্ষার সমূহ সামাজিক অন্তরায় বিদ্যমান ছিল, সে দেশে অন্ততঃ মহিলা-কবিদের পৃথক ভাবে আলোচনার সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে করি। বৃহৎ সংসারের ঈষৎ অবসরে এই মহিলারা কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহারা কাব্যরচনার উপযুক্ত শিক্ষা পান নাই এবং পাওয়া সম্ভব ছিল না। সেইজন্য ত্রুটিহীন কাব্যকলা ইঁহাদের নিকট আশা করা অন্যায়। ভাষার ব্যবহারে, ছন্দের প্রয়োগে, শব্দচয়নে ইঁহাদের শিথিলতা বা ত্রুটি থাকিবেই ইহা অবশ্যস্বীকার্য। ইঁহারা মূলতঃ স্বভাবকবি। এক্ষেত্রে স্বভাবকবি বলিতে ইহা বুঝায় না যে ইনি স্বভাবতই কবি—সে কথা বলা বাহুল্য ; বুঝায় সেই কবিকে যিনি একান্তই হৃদয়-নির্ভর। প্রেরণায় বিশ্বাসী অর্থাৎ যিনি যখন যেমন প্রাণ চায় তেমন লিখিয়া যান, কিন্তু কখনোই লেখার বিষয় চিন্তা করেন না। বাংলার মহিলা কবিরা এইভাবেই কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহারা বিশুদ্ধ আবেগের প্রেরণায় লিখিয়াছেন, আবেগকে শাসন করিয়া লেখেন নাই ; তাই সচেতন কবিকর্ম এক্ষেত্রে আশা করা অনুচিত। এই অর্থেই মহিলা-কবিরা 'স্বভাবকবি'।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা-কবিদের প্রেমকবিতার বিচার তাই উচ্চ মানদণ্ডে করা যায় না। কিছু ভাবগত ও রূপগত ত্রুটি স্বীকারান্তেই বিচার সম্ভব। ইঁহাদের প্রেমের কবিতা মুখ্যতঃ স্বামীকে অবলম্বন করিয়াই লেখা হইয়াছে। এবং একাধিক ক্ষেত্রে স্বামী স্বয়ং ও শ্বশুর

গৃহবধূদের কাব্যচর্চার আনুকূল্য করিয়াছেন, একথা সত্য। সুতরাং তাঁহাদের কবিকর্মের সহিত সংসারের কোনো বিরোধ ছিল না; কাব্যাবেগ প্রকাশ করিতে গিয়া কোন বহিঃসংস্কার বাধা দেয় নাই। নারীর মুখে প্রেমবন্দনা শুনিতে আমরা অভ্যস্ত নই। যুগে যুগে পুরুষ-কবিরাই প্রেমের বন্দনা করিয়াছেন। এক্ষেত্রে তাই বিপরীত সুরটি পাঠকের সতর্ক শ্রুতিমূলে পৌঁছাইয়া দেওয়াই সমালোচনার মূল কর্তব্য।

মহিলা-কবিদের প্রেমকবিতায় একটি গৃহগত প্রাণের শান্ত সুর শুনিতে পাই। বঙ্গনারীর চিরআরাধ্য প্রত্যক্ষ দেবতা স্বামীকে অবলম্বন করিয়া অনেক প্রেমকবিতা লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া যেগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে স্বামীর উল্লেখ নাই, সেসকল কবিতায় একটি মৃদু বেদনার সুর শুনিতে পাই। গত শতাব্দীর সকল মহিলা কবির কাব্যেই এই সুর শোনা যায়। অবশ্য প্রণয়ের মধুর মিলনের প্রীতিপূর্ণ সুরটি কয়েকটি কবিতায় আছে; তাহা ছাড়া প্রেমের আত্মসমর্পণের ভাবটি কয়েকটি কবিতায় অসাধারণ সারল্য ও আন্তরিকতার সহিত উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রেমের জন্য ত্যাগ ও দুঃখ-বরণের মাহাত্ম্য কয়েকটি কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে।

মহিলা-কবিদের মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় কামিনী রায়ের। 'আলো ও ছায়া' কাব্যের রচয়িত্রী হিসাবে তিনি এক সময় বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। এই কাব্যে যে কয়টি প্রেমকবিতা আছে, তাহাদের মধ্যে একটি বেদনার সুর শুনিতে পাওয়া যায়। 'প্রণয়ে ব্যথা' কবিতাটিতে বেদনার চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে:

কেন যন্ত্রণার কথা, কেন নিরাশার ব্যথা,
জড়িত রহিল ভবে ভালবাসা সাথে?
কেন এত হাহাকার, এত ঝরে অশ্রুধার?
কেন কণ্টকের স্তূপ প্রণয়ের পথে?
বিস্তীর্ণ প্রান্তর মাঝে প্রাণ এক যবে খোঁজে
আকুল ব্যাকুল হয়ে সাথী একজন,
ভ্রমে বহু, অতি দূরে পায় যবে দেখিবারে
একটি পথিক-প্রাণ মনেরই মতন;
তখন, তখন তারে নিয়তি কেন রে বারে,
কেন না মিশাতে দেয় দুইটি জীবন?
অনুল্লঙ্ঘ্য বাধারাশি সম্মুখে দাঁড়ায় আসি
কেন দুই দিকে আহা যায় দুইজন?

প্রেমের নির্মল পবিত্র স্বর্গীয় মহিমামণ্ডিত রূপের চমৎকার বর্ণনা পাই 'সে কি?' কবিতাটিতে:

"প্রণয় ?"
"ছি !"
"ভালবাসা—প্রেম ?"
"তাও নয়।"
"সে কি তবে ?"
"দিও নাম, দিই পরিচয়—
আসক্তিবিহীন শুদ্ধ ঘন অনুরাগ,
আনন্দ সে, নাহি তাহে পৃথিবীর দাগ ;
আছে গভীরতা তার উদ্বেল উচ্ছ্বাস,
দুধারে সংযম-বেলা, উর্ধ্বে নীলাকাশ,
উজ্জ্বল কৌমুদীতলে অনাবৃত প্রাণ,
বিম্ব প্রতিবিম্ব কার প্রাণে অধিষ্ঠান।......
হৃদয় মাধুরী সেই, পুণ্য তেজোময়,
সে কি তোমাদের প্রেম ?—কখনই নয়।
শত মুখে উচ্চারিত, কত অর্থ যার,
সে নাম দিওনা এরে মিনতি আমার।"

উপরোক্ত চরণগুলির সহিত শেলীর "One word is too often profaned' কবিতার তুলনা স্বতই মনে আসে।

প্রণয়ের মুগ্ধরূপটি কামিনী রায় সহৃদয়তার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন :

সে কি কথা—যারে চেয়েছিলে
পাও নাই সন্ধান তাহার ?

পুরুষের জীবনে ইহাই বিধিলিপি। প্রেমের আলোয় যে প্রতিমার আরতি করে, বাস্তবের মূর্তিতে তাহাকে পায় না, তাই আর্তনাদ—

পাষাণের প্রতিমাটি যবে
প্রাণময়ী নারীরূপ ধরে,
নারী তার পারে না কি তবে
দেবী হতে পারে বিধাতার বরে ?

প্রেমের জন্য নারীর আত্মদান, বেদনা-ব্যথিত হৃদয়ে প্রেমোৎপল উপহার দানের কোমল ও মধুর রূপটি 'নিরুপায়' কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—

প্রিয়তম, কহ তুমি যাহা ইচ্ছা তব,
যত রুক্ষ তীক্ষ্ণ বাণী আছে গো ভাষায়
সব আনি হান প্রাণে, আমি সয়ে রব
সিক্ত চোখে, মৌন মুখে, আমি নিরুপায়।
তুমি পতি তুমি প্রভু, মন, মান মম
সকলি তোমার হাতে ; দল যদি হায়,

এই রমণীর মন, তাহা, প্রিয়তম
তোমারি চরণ প্রান্তে লুটাবে ধরায়।

এই আত্মনিবেদনের সুরটি নারীপ্রেমে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। 'মাল্য ও নির্মাল্য' কাব্যে কবি প্রেম রমণীর প্রাণ, এই ভাবটী বুঝাইয়াছেন: 'ভালবাসা জীবনের মধু, ভালবাসা নয়নের আলো।'

মানকুমারী বসু যথার্থ প্রেমকবিতা বিশেষ লেখেন নাই। প্রেমের নৈর্ব্যক্তিক রূপটি তাঁহার কাব্যে চিত্রিত হইয়াছে। প্রেমের প্রতপ্ত আবেগ এখানে ধরা পড়ে নাই, উদার নিষ্কাম রূপটী ধরা পড়িয়াছে। তাই কবি 'উদ্ভ্রান্ত' কবিতায় সূর্যের প্রতি নলিনীর ভালবাসা বর্ণনা করিয়াছেন:

নলিনীর ভালবাসা—শুনে হাসি পায়,
সে তো ফোটে ঘোর পাঁকে,
কার মুখ চেয়ে থাকে?
যে রাজা বিরাজে নিত্য আকাশের গায়!

প্রেমের সর্বোচ্চ আদর্শটি কবি এই কবিতায় ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। শেলীর 'Desire of the moth for the star' জাতীয় কবিতার সহিত তুলনায় এ কবিতার অপকর্ষ ধরা পড়ে। নলিনীর ভালবাসা এখানে তথ্য মাত্র, তাহা কাব্যের বাণীমূর্তি গ্রহণ করে নাই:

পাগল পাগল পারা
ভালবেসে হল সারা,
পরাণ দিয়েছে ঢেলে সেই দেবতায়;
সে যেন যোগিনী মত
ধেয়ানে রয়েছে রত,
নিষ্কাম নিষ্ক্রিয় এই মহাসাধনায়,
নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায়! (কনকাঞ্জলি, ১৮৯৬)

প্রেমকে মৃত্যুর সহিত তুলনা মানকুমারীও করিয়াছেন। 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি'র (১৮৯৩) 'মৃত্যুসুহৃৎ' কবিতায় তিনি বলিয়াছেন:

আমি তারে চিনি শুনি ভালবাসি তায়
শুনিলে তাহারি নাম,
উথলে হৃদয়ধাম,
পরাণ শিহরি উঠে সুধা পড়ে গায়;
এক দিন দূরে—দূরে,
অনন্তে অমরপুরে—
নিয়ে যাবে সে আমারে, করেছে আমায়,

সে আমার কাছে কাছে,
দিনরাত সদা আছে,
পরাণে বেঁধেছি পাছে ফেলে চলে যায়,
তার নাম 'মৃত্যু' আমি ভালবাসি তায়।

রবীন্দ্রনাথের 'ঝুলন' বা 'হৃদয়যমুনা' কবিতায় প্রেমের রহস্যের সহিত মৃত্যুর রহস্য এক হইয়া গিয়া যে ফলশ্রুতি দান করে, তাহা এখানে পাই না।

পঙ্কজিনী বসুর 'স্মৃতিকণা' (১৯০২) কাব্যের অন্তর্গত 'সূর্যমুখী' কবিতায় প্রেমের নিষ্ঠা, প্রেমিকের প্রতি চিত্তের একাগ্রতা ও গ্রহণোন্মুখতার অপূর্ব চিত্র পরিস্ফুট :

চাহ নাকো প্রতিদান,
নাই মান, অভিমান,
মন কথা কয় বুঝি আঁখি সনে থাকি ?
নীরব প্রণয় তব একি সূর্যমুখি ?
কেমন নির্লজ্জ মেয়ে ;
তবু তার পানে চেয়ে
প্রত্যাখ্যান, অপমান সকল উপেখি,
'জগতের হিত তরে
মোর প্রিয় প্রাণ ধরে
কেমনে আমার হবে'—তাহাই ভাব কি ?
স্বরগের প্রেমরাশি একি সূর্যমুখি ?
মন খোলা, প্রাণ খোলা,
আপনা জগৎ ভোলা,
সুখ দুঃখে সর্বকালে হয়ে পূর্বমুখী,
জানিনা কেমন করে
থেকে দূর দূরান্তরে
না পরশি, সাধ পূরে শুধুই নিরখি,
নিষ্কাম নিষ্ক্রিয় ব্রত একি সূর্যমুখী !

ইহার পর নাম করিতে হয় 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭)-খ্যাতা গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর। বাংলা কাব্যসাহিত্যে শোককাব্য হিসাবে 'অশ্রুকণা'র বিশিষ্ট স্থান আছে। এই কাব্যে স্বামীবিয়োগবিধুরা পত্নীর শোকের প্রকাশ ঘটিয়াছে। তথাপি প্রণয়ের উৎকৃষ্ট কাব্য হিসাবেও ইহাকে গ্রহণ করা চলে। গিরীন্দ্রমোহিনী প্রেমের আদর্শায়িত রূপের বন্দনা গাহিয়াছেন। প্রেমের মধ্যে যে সর্বত্যাগী, সংসারোত্তীর্ণ, পবিত্র আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে, কবি সে আহ্বানেই সাড়া দিয়াছেন। 'অশ্রু' কবিতাটি কবির প্রেমাদর্শের সুন্দর প্রকাশ :

ওরে প্রিয় অশ্রু-ধার,
প্রণয়-পূজার চির-সঙ্গিনী আমার !
পবিত্র প্রণয়-দেবে পূজা করিবারে,
তোর সম উপচার নাই এ সংসারে।......
প্রেম যবে মূর্তিমান ছিলেন আমার,
পূজেছি তাঁহায় দিয়ে প্রীতি-ফুল-হার।......
স্বর্গের দেবতা-প্রেম গেছেন যথায়,
সুকোমল কত হৃদি পূজিতেছে তাঁয়।
উদ্দেশে এখন তাঁর কবির পূজন,
কুসুম, কবিতা আর নাই প্রয়োজন।
পেয়েছি মনের মতন রতন আমার,
সুকোমল, পূতোজ্জ্বল বিধি অশ্রুধার !

প্রিয়তমের (স্বামীর) স্মৃতির উদ্দেশে কবি যে স্মৃতি-তর্পণ করিয়াছেন, তাহাই প্রেম-উপচার।

কবি এখানেই ক্ষান্ত হন নাই। 'অর্ঘ্য' (১৯০২) কাব্যে প্রেমের চলচ্চিত্ততা, রূপমোহ ও হৃদয়াবেগের শোভন প্রকাশ ঘটিয়াছে। 'প্রভেদ' কবিতায় কবি বলিয়াছেন,

আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,—
তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ ;
তুমি ভালবাস রূপগৌরব,
সুকোমল তনু শিরীষ-পেলব,
বিম্ব বরণ অধর-পল্লব,
নয়নের সুধামাখা বিষ,
আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,
তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ।

'বেলা যায়' কবিতায় প্রেমিকার বিরহখিন্না দয়িত-ব্যাকুলা রূপটি চমৎকার ফুটিয়াছে :

ওগো ছেড়ে দাও পথ এবারের মত
লইয়া আকুল বিনতি ;
আমি করিয়া শপথ বাহি দূর পথ
বহি বিরহের বেসাতি।......
হে পথিকবর, কোথা তব ঘর,
করুণ আঁখিতে কি ভাষা ?—
পথে শত ধূলি উড়ে যায় চলি
বুকে বহি মরু পিপাসা !

ওগো অনিমিষে, কি দেখিছ মুখে
চেয়ো না অমন করিয়া ;
আছে দুই খানি শ্রাবনের মেঘ
এই আঁখিকোণ ভরিয়া !

প্রেমের দুর্জ্ঞেয় অপরিমেয় রহস্যের প্রতি বিস্ময়মিশ্রিত বন্দনার ধারা এই পর্বে অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয়যমুনা' কবিতা ও বলেন্দ্রনাথের 'অন্তরবাসিনী' সনেটে যে উপমান ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার পুনর্ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় প্রিয়ম্বদা দেবীর 'রেণু' কাব্যের (১৯০০) অন্তর্গত 'বিরহ' সনেটটিতে।

মেঘ নামিয়াছে আজ ঘেরি চারিপাশে,
নব স্নিগ্ধ অন্ধকার, সজল বাতাস
ধরণীর আর্দ্র বক্ষে নিবিড় পরশে
রোমাঞ্চ জাগায়ে তুলি' উদ্দাম হরষে
ছোটে গর্বভরে ; বজ্র ডাকে বারে বারে
প্রদীপ্ত অনল-শিখা বিদ্যুৎ-প্রিয়ারে
আপন বক্ষের মাঝে, শ্যাম তরুগুলি
সুঠাম বঙ্কিম বাহু উর্ধ্ব পানে তুলি
আরও চুম্বন-পুষ্প দেখায় কাহারে !
পূর্ণা তরঙ্গিনী ধায় দূর পারাবারে
মিলন ব্যাকুল ; রুদ্ধ ঘরে একা বসি
অশ্রু আঁখি প্রাণে জাগে তব মুখশশী।
তবু একবার এস নয়ন সমুখে
বাহু-বন্ধে তনুখানি গাঁথি লহ বুকে !

'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত', 'বর্ষার দিনে', 'আকাঙ্ক্ষা' প্রভৃতি কবিতায় যে তত্ত্ব আছে, এখানে সে তত্ত্বই পুনর্বার উপস্থাপিত হইয়াছে,—বর্ষা মানুষের অন্তর্গূঢ় নিবিড় আকাঙ্ক্ষাকে ও বিরহকে জাগাইয়া তোলে।

প্রেমের আকর্ষণ যে দৈহিক উপভোগের উর্ধ্বে মিলনের আকর্ষণ, এই তত্ত্বটি শ্রীমতী বিনয়কুমারী ধরের 'নির্ঝর' কাব্যে (১৮৯১) আরেকবার সমর্থিত হইয়াছে। তাহার প্রমাণ 'দৃষ্টি' সনেটটি :

হৃদয়ের সাথে বুঝি হৃদয়ের কথা।
দোঁহারে টানিছে দোঁহে আপনার পানে,
জানাইতে মরমের চির আকুলতা
এসেছে হৃদয় দুটি ভাসিয়া নয়ানে !
গোপন প্রাণের দ্বার গেছে যেন খুলে,
দোঁহার লুকানো আশা দেখিছে দোঁহায়,

উথলিছে প্রেমসিন্ধু আঁখি উপকূলে,
ভরে উঠে দরশের হরষ জ্যোৎস্নায়।
কত না মধুর সাধ সুখের পিপাসা
জাগিছে অতৃপ্তি নিয়ে নয়নের কোণে ;
নীরব মনের কত সুকোমল ভাষা,
বুঝিতেছে পরস্পরে না বলে, না শুনে ;
প্রাণে বাঁধিতেছে প্রাণ গাঢ় আলিঙ্গনে,
চেয়ে শুধু অনিমেষে নয়নে নয়নে !

লজ্জাবতী বসুর 'যাচনা' কবিতাটী (১৯০২) আদর্শায়িত প্রেমের কোমল প্রকাশ :

দেবি ! চির অসম্পূর্ণ কাহিনীর মত
ব্যাকুল রাখিও পরাণি ;
অকূল নদীর তীর-রেখা মত
থেকো, আবেগে বহিব যখনি।—
যথা, ভাবের বীণাটি কবির গাথায়
জেনো তেমনি আমার নয়নে ;
প্রেমের প্রথম পুলক মতন
ওগো, চিরদিন এসো স্মরণে।

আর দুই-জনের কথা আলোচনা করিলে মহিলা-কবিদের প্রেমকবিতা-প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটে। এই দুইজন হইতেছেন : নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী ও সরোজকুমারী দেবী।

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফীর 'মর্মগাথা' (১৮৯৬) 'প্রেমগাথা' (১৮৯৮), ও 'অমিয় গাথা' (১৯০১)—এই তিন কাব্যগ্রন্থে প্রেমের নানা বিচিত্র বিলাস ও মানস-প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ আছে। নগেন্দ্রবালার প্রেমকবিতা বঙ্গনারীর স্বামিচরণে কবিতাপুষ্প-উপহার নহে ; ইহা যথার্থই প্রেমকবিতা ; দয়িতের প্রতি প্রেমিকার নানা আকর্ষণ বিকর্ষণের সুন্দর প্রকাশ।

'নীরবে' কবিতায় ('মর্মগাথা') বিরহিণীর ব্যাকুল আর্তি :

কি যে গো দারুণ ব্যথা
আমার এ বুকময়,
কি দারুণ ব্যথায় যে
পুড়িতেছে এ হৃদয়।
নীরবে হৃদয়ে আছে
হায় সে অনন্ত ব্যথা।
একটি দিনের তরে
বলিনি একটি কথা।

শুধু একটি সংকল্প :

মরমের কথা মোর
নীরবে মরমে রবে,
যখন পরাণ যাবে
মোর সাথে সাথী হবে।

'প্রেমগাথা' কবিতাগুলিতে প্রেমের বিচিত্র লঘু প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 'প্রেম' কবিতায় :

মনে করি ভুলেছি তোমায়,
মনে হয় কাছে এলে,
দেখিব না আঁখি মেলে,
দেখা হলে চলে যাব আনত মাথায়!......
আজু কেন টানে প্রাণমন ?
কোন মন্ত্র হেন আছে
শতদূর—করে কাছে
ভাঙা বীণা সপ্তমেতে বাজায় এমন!
(আমি জানি প্রেম সে গো, নহে অন্য জন)।

'হতাশের আক্ষেপ' কবিতায় আপাত-অস্বীকৃতির মাধ্যমে অনুরাগ প্রকাশ :

এত দুখ দিতে হয়
ভালবাসি বলিয়া ?
অবশ চিতের সনে,
যুঝিয়াছি প্রাণপণে
ফেলিতে মূরতি তব
হিয়া হতে মুছিয়া।......
আঁখিতে মমতা লয়ে,
ভালবাসা বুকেতে,
কেন আর দেখা দাও,
মাথা খাও সরে যাও।
যা হবার হবে মোর
তুমি রও সুখেতে।

'বিদায়োপহার' কবিতায় :

তুমি আমি মরে যাব
প্রেম ত মরণহীন
প্রেম বলে সেই দেশে
মিলিব রে এক দিন।

আজি এ বিদায়কালে
কিবা দিব উপহার।
লও শুধু দুই ফোঁটা
এই দগ্ধ অশ্রুধার।

কিন্তু 'অমিয়গাথা' কাব্যের কবিতাগুলিতে দেখি কবি সেখানে 'দগ্ধ অশ্রু' উপহার না দিয়া 'নয়নমদিরা' উপহার দিয়াছেন। 'প্রিয় সম্বোধনে' কবিতায় :

কি মদিরা ঝরে সখে! নয়নে তোমার!
হেরিলে পাগল হই,
আমি যেন আমি নই,
ত্রিজগত পলকেতে হয় একাকার!......
ভেবেছিনু মনে মনে,
দেখা হলে দুইজনে,
চোখে চোখে রব, বাধা মানিব না আর।
ব্যর্থ সে কল্পনা লেখা,
যেমন হইল দেখা,
রোধিল শরম আসি মরণের দ্বারে।
কি যেন ও চোখে ছিল,
সরবস্ব লুটে নিল।
নারিল সহিতে আঁখি ও আঁখির ভার।
হল না ক চেয়ে থাকা,
মিছা কল্পনারে ডাকা,
আজি শরমের কাছে প্রণয়ের হার।

প্রেমের শরম-জড়িত রূপটি এখানে ধরা পড়িয়াছে। মহিলা-কবিদের স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি দিবার প্রথা ত্যাগ করিয়া নগেন্দ্রবালা এই যে প্রত্যক্ষ বন্দনা করিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। 'চোর' কবিতায় কবি বলিয়াছেন :

আমি যে বেসেছি ভাল আমারি কি দোষ?
প্রাণভরা প্রেম লয়ে,
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে,
তুমি কি চাহনি সখা, মোর পরিতোষ?......
আমিই কি শুধু তোমা করেছি পাগল!
তুমি এ হৃদয়ে এসে,
মধুর—মধুর হেসে,
কর নি কি ক্ষুদ্রপ্রাণ উন্মত্ত বিভল? ......

তুমিও যা কর সখা আমি করি তাই,—
তবু ভালবাসি ব'লে
দোষ দাও নানা ছলে,
চোর হয়ে সাধু তুমি বলিহারি যাই!
ভাল বাসিয়াছি পেয়ে এই দোষ মোর,
রাজা হয়ে হৃদাসনে,
বসিয়াছ ফুল্লমনে,
চোর হয়ে রাজা হলে—ধন্য পাকা চোর!

প্রেমের পরিহাসনিপুণ তারটি কেবল নগেন্দ্রবালার করস্পর্শেই ঝঙ্কৃত হইয়াছে, অপর কোন মহিলা কবির এই বিদ্যা আয়ত্তে ছিল না।

সরোজকুমারী দেবী মহিলা কবিদের মধ্যে প্রেমকবিতার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার 'হাসি ও অশ্রু' (১৮৯৪) কাব্যটি নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র প্রেম আরেকবার এই কাব্য দেখা গেল। 'সোনার তরী' প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে। এই কাব্যও ঐ বৎসর প্রকাশিত হয়। 'সোনার তরী'তে প্রেমের আদর্শায়িত রূপ, তাহার অতিবাস্তব পরিণতি, প্রেমিকাকে জীবনাধিষ্ঠাত্রীরূপে চিত্রণ, প্রেমের রহস্যময়তা এবং বাস্তবসংসারে প্রেমলাভের ব্যর্থতা প্রকাশ পাইয়াছে; তাহা এখানেও আছে।

চুম্বনের উপর সরোজকুমারী যে দুইটি কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতেই এই লক্ষণ ধরা পড়িবে। এই কবিতা দুইটির সহিত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেনের চুম্বনবিষয়ক কবিতা ও 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটের মিল পাওয়া যাইবে না। এই দুটি কবিতা আদর্শায়িত প্রেমের অভিব্যক্তি। এখানে কবি বস্তুকে পরিহার করিয়া বিরহের ভাবটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। 'একটি চুম্বন' কবিতায় আছে:

চলে যায় পুন ফিরি এসে
হাতে তার ধরে নিজ করে।
থর থর কাঁপিল অধর
আঁখি কোণে দুটি অশ্রু ঝরে।......
কুসুমের মত গেল ঝরে
ধীরে ধীরে একটি চুম্বন,
অশ্রু জলে ফুটে উঠে হাসি
বরষাতে রবির কিরণ!

'দুটি চুম্বন' কবিতায় কবি বলিয়াছেন:

আজ আমি এসেছি আবার!

কি দিব তোমায় ভাই, কিছুই ভেবে না পাই,
লহ দুটি দীন উপহার।
ও রাঙা অধর দুটি, লাজ-বাঁধ গেছে টুটি,
কি মোহেতে মুগধ নয়ন ;
আপনারে গেছি ভুলে, চাও গো মুখানি তুলে
ধর সখি দুইটি চুম্বন !

'উপহার' কবিতায় কবি অনেক লজ্জা, ভয়, নিরাশা ও বেদনার বন্ধুর পথ উত্তীর্ণ হইয়া মিলন-উপত্যকায় পৌঁছিবার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন ;

সেদিনো কি আছিল এমনি !……
আনত ঘোমটা ছায়ে লুকায়ে গোপনে সেই,
একবার সলাজ চাহনি !
মিলিলে অাঁখিতে অাঁখি মরমেতে মরে যেন,
সরমেতে ফিরায় অমনি !……
ছিলনা ত কখনো এমনি !
আজিকে সর্বস্ব মোর তোমাতেই মিশাইয়া
ছুটিতেছি একই বাহিনী !
হাসি অশ্রু আজি মোর সকলি যে তোমাময়,
তোমাময় নিখিল সংসার,
মিলনের উপকূলে তোমারে পেয়েছি আজ
দূরেতে বিরহ পারাবার !

এই 'সমর্পণ' বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন :

দোঁহার পরাণ লয়ে যেন গো দুজনে
সমর্পণ করিল সে সন্ধ্যার বিজনে। ('সমর্পণ')

'হাসি ও অশ্রু' কাব্যটি এই পরাণ সমর্পণের কাহিনী। কবি সে কথা বারবার বলিয়াছেন :

আমি জীবনের উপকূলে শ্রান্ত এ পরাণ লয়ে,
গণিতেছি দীর্ঘশ্বাস আকাশের পানে চেয়ে !
('কোথায় সে দেশ ?')

অথবা,

সে কর পরশে তার পরাণের পারাবার,
হরষেতে উঠিল উছসি !
মুখে সরিল না কথা, রয়ে গেল হৃদে ব্যথা,
সে যে হায় চলে গেল হাসি।
('বৃথায়')

তাই শেষে আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা—'সাধনা'র ফল জীবন-অধিষ্ঠাত্রীর চরণে সমর্পণের আকাঙ্ক্ষা :

জেনেছি বুঝেছি দেবি বিফল সাধনা !
শিখিনি করিতে পূজা ও দুটি চরণ !
আজন্মের ঘোর তৃষা অতৃপ্ত বাসনা,
মিটিবে না কভু মোর থাকিতে জীবন !
গোপন মর্মের মাঝে তবু দিবানিশি,
কি রুদ্ধ শোণিত-স্রোত উছলিতে চায় ।
কি যে মোর অমা হের, চেয়ে দশদিশি,
কি করে আলোক মৃদু প্রবেশিবে তায় !

সুগভীর অন্ধকারে একেলা বিজনে
তবু দেবি ও সুন্দর মানসপ্রতিমা,
হেরিব সতত ইচ্ছা জ্ঞানে কি অজ্ঞানে,
অন্ধ আমি কোথা পাব অসীমের সীমা !
জানি মনে এ জনমে বিফল সাধনা,
মিটিবেনা তৃষা ভরা অতৃপ্ত বাসনা !

তবু দেবি আশাহীন নবীন আশায়,
গেঁথেছি যতনে এই ঝরা ফুলগুলি,
পরাইতে যাই আর সাহস ফুরায় ;
পরিবে না গলে তুমি, লবে না কি তুমি ?
না হয় রাখিয়া দিও চরণের ছায়,
মুহূর্ত বিফল আশা যদি মেটে হায় !

কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করিলাম এইজন্য যে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'সাধনা' কবিতাটির ('চিত্রা' কাব্য) সুরের সহিত আশ্চর্য মিল আছে :

দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি ;
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি ।......
তুমি যদি, দেবী, পলকে কেবল
কর কটাক্ষ স্নেহ সুকোমল ।
একটি বিন্দু ফেল আঁখিজল
করুণা মানি

সব হতে তবে সার্থক হবে
ব্যর্থ সাধনখানি॥

আর দুই প্রধান কবির কবিতা আলোচনা করিয়া আদর্শায়িত প্রেম-কবিতার প্রসঙ্গ শেষ করিব। নবীনচন্দ্র সেন ও অক্ষয়কুমার বড়াল—এই দুই কবি এই শ্রেণীর প্রেমকবিতা লিখিয়াছেন। নবীনচন্দ্র গতানুগতিক পথে আদর্শায়িত প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, আর অক্ষয়কুমার প্রেমের আশা ও নিরাশার নানা প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী' (১৮৭১ ও '৭৭) কাব্যে প্রেমিকের বিরহ ও বেদনার্তি, আনন্দ ও উল্লাসের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তবু এই প্রকাশ গতানুগতিক প্রকাশ। 'আকাঙ্ক্ষা', 'প্রতিমা-বিসর্জন', 'নিরাশ প্রণয়', 'হৃদয়-উচ্ছ্বাস', 'কি লিখিব', 'প্রেমোন্মাদিনী', 'কেন ভালবাসি?' প্রভৃতি কবিতায় প্রেমের প্রাথমিক রূপকর্মটি লক্ষ্য করা যায়। তবে সেগুলির আন্তরিকতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ থাকিয়া যায়। তাহার প্রমাণ,—

কোমল প্রণয়-বৃন্তে, কুসুম-যৌবনে,
ফুটিয়াছে যেই ফুল, সাধ ছিল মনে,
নিরখিয়া জুড়াইব তৃষিত নয়ন,—
দেখিয়াছি কিন্তু আশা হল না পুরণ। ('আকাঙ্ক্ষা')

গীতিকবিতা হিসাবে তাই এগুলি সার্থকতা লাভ করে নাই। মাত্র একটি কবিতা—'কেন ভালবাসি?' আন্তরিকতায় ও রূপসজ্জায় কতকটা সফলতা লাভ করিয়াছে। তবে কোনটাই একান্তভাবে ব্যক্তিধর্মী হইয়া উঠে নাই। এই কবিতাটিতে কবি বলিয়াছেন :

কি দিব উত্তর? আমি কেন ভালবাসি?
আজি পারাবার সম,
হায়, ভালবাসা মম,
কেন উপজিল সিন্ধু, এই অম্বুরাশি,
কে বলিবে? কে বলিবে কেন ভালবাসি?

তারপর প্রিয়তমাকে অনন্ত অতল সিন্ধু, সচন্দ্র শর্বরী, নিশীথিনী বলিয়া সম্বোধনান্তে কবি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন—

জীবন, যৌবন, আশা, কীর্তি, ধন, মান—
তৃণবৎ ঠেলি পায়
আসিনু উন্মাদপ্রায়
যার কাছে, হায়! তার মন বুঝিবারে,
সে কি জিজ্ঞাসিল কেন ভালবাসি তারে?

কবির এই জিজ্ঞাসা শেষে বেদনার্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে—

কেন ভালবাসি, প্রিয়ে, বলিব কেমনে,

কোথা আমি, কোথা তুমি
মধ্যে এই মরুভূমি
নির্মম সংসার—কিসে শুনিবে সুন্দর
হৃদয়ে হৃদয়ে যার সম্ভবে উত্তর!

এই কবিতাগুলিকে প্রেমের মনস্তত্ব উদ্ঘাটন-প্রয়াস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। আদর্শায়িত প্রেমকবিতার মহত্তর প্রকাশ নবীনচন্দ্রে নহে, আমাদের অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে।

এবিষয়ে অক্ষয়কুমার নিঃসন্দেহে উন্নত সৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'কনকাঞ্জলি' (১৮৮০) ও 'এষা' (১৯২২) কাব্য প্রেমের আদর্শায়িত রূপের মহত্তর বন্দনা। 'কনকাঞ্জলি'তে অক্ষয়কুমার যে স্বপ্নরাণীর আরতি করিয়াছেন 'এষা'য় তাহারই অন্বেষণে ও তিরোধানে বিলাপ করিয়াছেন। 'কনকাঞ্জলি'র কবিতাগুলিতে রূপকর্মের যে সূক্ষ্মতা ও নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায়, তাহা বারবারই বিহারীলালের ও রবীন্দ্রনাথের প্রেমকবিতার কথা মনে পড়াইয়া দেয়।

বিহারীলালের মন্ত্রশিষ্য অক্ষয়কুমারের কাব্যে বিহারীলালের ন্যায় সংকল্প-সৌন্দর্যের নিকট আত্মসমর্পণ এবং তজ্জনিত আনন্দ ও নৈরাশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'সারদামঙ্গল' কাব্যের প্রথমাংশের সহিত অক্ষয়কুমারের 'কনকাঞ্জলি' (১৮৮৫ : ১ম সং, ১৮৯৭ : ২য় সং) ও 'ভুল' (১৮৮৭) কাব্যের যথেষ্ট মিল আছে। "ভাবকল্পনার নিরুদ্বেগ আনন্দের সহিত বাস্তব-বেদনার নিবিড় অনুভূতি অক্ষয়কুমারের কবিচিত্তকে আন্দোলিত করিয়াছে—বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্বে কবিপ্রাণ দোলায়িত হইয়াছে।...অক্ষয়কুমার যে প্রেমের সাধনা করিয়াছেন তাহা বাস্তবে ধরা দেয় না, কিন্তু বাস্তবকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করিয়া হৃদয়কে বেদনাতুর করিয়া তোলে। কবি যে সৌন্দর্যের ধ্যান করিয়াছেন তাহা ছায়াসৌন্দর্য, কায়াযুক্ত মানবচিত্তের অনধিগম্য; সেই জন্য সৌন্দর্যের মানস মূর্তির ভাবনায় অনায়ত্ত অসীমতার অফুরন্ত আনন্দ আছে, কিন্তু দেহ ও প্রাণের পরিতৃপ্তি নাই। কারণ, ইহাকে রূপ ও রসের সীমানায় বিশিষ্ট বিগ্রহের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ধরা যায় না।" (ডঃ সুশীলকুমার দে, 'নানা নিবন্ধ', পৃ ২৬২-৬৩)।

তাই অক্ষয়কুমারের প্রেমকবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে অনির্দেশ ব্যাকুলতা, বেদনা ও অজানা দুঃখ।

অক্ষয়কুমারের প্রেম-সাধনা আদর্শায়িত প্রেমের সাধনা। 'কনকাঞ্জলি' ও 'ভুল' কাব্যগ্রন্থের প্রেমকবিতাগুলিতে লালসা নাই, আত্মবিসর্জন আছে; উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, সংযম আছে; সম্ভোগের তীব্রতা নাই, ধ্যানা-রতির শান্তি আছে। সঙ্কীর্ণ দেহকেন্দ্রিক ভোগকামনা কবির কাছে 'পঙ্কিল সরসী'। এই 'সরসী' হইতে কবি মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন।

দুস্তর সৌন্দর্য-সাগরে আন্দোলিত প্রেমের শুভ্র সৌন্দর্যলোকে কবি মুক্তি চান। সে মুক্তির দূতী 'শুভদা' নারী। তাই অক্ষয়কুমার নারী-বন্দনা করিয়াছেন। 'কনকাঞ্জলি' (তৃতীয় সংস্করণ) কাব্যের দুইটি কবিতায় ইহার সমর্থন মিলিবে।

স্থূল বস্তুকামনার ধূমাচ্ছিত পরিবেশ ত্যাগ করিয়া কবি প্রেমের নির্মল ঊষার আবির্ভাব প্রার্থনা করিয়াছেন :

জন্মিয়া অনন্ত মাঝে, বাড়িয়া অনন্ত মাঝে,
অনন্তের হয়ে অবতার—
তুচ্ছ সুখে দুঃখে আর আত্মঘাতী হই কেন,—
কেন্দ্র করি দেহ আপনার?
ধূমায়িত দীপশিখা দাও—দাও নিভাইয়া,
উঠুক উঠুক ঊষা হেসে।
পঙ্কিল সরসীকূলে রেখ না ডুবায়ে আর
যাই—যাই পারাবারে ভেসে!

('সম্ভাষণ', কনকাঞ্জলি)

স্থূল দেহোপভোগের কারাগার হইতে কবি মুক্তি চাহিয়াছেন :

এই ত প্রেমের বন্ধ,—
বাস্তবে স্বপনে দ্বন্দ্ব,
কবিতার চিরানন্দ কল্পিত নিরাশা!
খুলে দাও বাহু পাক,
অপূর্ণ—অপূর্ণ থাক ;
আজি যদি কেঁদে যাই,— কাল ফিরে আসা।
থাকুক পিপাসা।

এখানে 'কড়ি ও কোমলে'র 'বন্দী', 'মানসী' কাব্যের 'ভুলভাঙা', 'সংশয়ের আবেগ', 'নিষ্ফল প্রয়াস ও 'নিষ্ফল কামনা'র প্রতিধ্বনি শুনি।

জীবনসাধনার অপূর্ণ প্রয়াসের ব্যাকুলতা কবিকে বিষাদগ্রস্ত করিয়াছে :

কেহ পরিবে না যদি মালা,
মিছে কেন কাঁদি' ফুল তুলি।
কেহ যদি শুনিবে না গান,
মিছে দুখে আকুলি ব্যাকুলি।…
তাই ভাবি—তাই ভাবি সদা,
কি ভুলেতে আছি আমি ভুলি'।

('ভুল')

যৌবনস্বপ্নের ঘুমঘোরে তাই কবি বলিতেছেন,—

পড়ে আছি নদীকূলে শ্যাম দূর্বাদলে ;
কি যেন মদিরা পানে, কি যেন প্রেমের গানে
কি যেন নারীর রূপে ছেয়েছে সকলে !
পড়ে আছি নদীকূলে শ্যাম দূর্বাদলে । ('ভুল')

স্বপ্নের শেষে নির্মম জাগরণের আশংকায় কবির বেদনা,—

ফুটো না ফুটো না, রবি   থাক ঘোর-ঘোর ছবি ;
ধরা যেন কবি-স্বপ্ন মদির মধুর !
নাহি শোক, নাহি তাপ,   নাহি মোহ, নাহি পাপ
ফেটো না এ আবছা জাল,—প্রত্যক্ষ নিঠুর !
('ভুল')

নিঠুর প্রত্যক্ষ হইতে দূরে কল্পনার মেঘপুরে, স্বপ্নের ঘোরে আদর্শ সৌন্দর্যের ধ্যানলোকে তাই কবি ফিরিতে চান,—

জগতের দূরে—তোর মেঘপুরে নিয়ে যা আমায়।
তোর ছায়া মত স্বপ্ন-মায়া মত করে দে আমায় ! ('ভুল')

ব্যর্থ প্রয়াসের অবশ্যম্ভাবী নৈরাশ্য ও বিষাদে তাই কবির আক্ষেপ,—

বড় সাধ চেয়ে চেয়ে,   বড় সাধ পেয়ে পেয়ে
সুখে দুঃখে প্রেমে কল্পনায়। ('কনকাঞ্জলি')

প্রখর আত্ম-সচেতন আত্মকেন্দ্রিক অক্ষয়কুমারের কাব্যবেদনা 'তৃপ্তির নরকে জলি অতৃপ্তির খেদে'—এই চরণে ধ্বনিত হইয়াছে। স্বপ্ন-সহচরীকে বাস্তবের সীমানায় না ধরিতে পারার জন্য আজ কবিচিত্তে বেদনা জাগিয়াছে। বাস্তব হইতে পলাতক কবি আর এখন স্বপ্নে সুখ পান না ; স্বপ্নে আজ আর কবি সুখ পাইতেছেন না। বাস্তবে আদর্শ প্রেম ও সৌন্দর্যকে পাইবার প্রয়াসে বিফলতা অবশ্যম্ভাবী। তাই চির বিফলতার ক্রন্দন শুনিতে পাই,—

এ জীবনে পূরিত সকল,
সে যদি গো আসিত কেবল !
গানে বাকি সুর দিতে, ফুলে বাকি তুলে নিতে,
স্বপ্ন বাকি হইতে সফল—
সে যদি গো আসিত কেবল। ('শঙ্খ')

আজ আর আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই, অন্বেষণের শেষ নাই,—

কোথা তুমি, ভালবাসা,—যে তুমি সে তুমি দূরে !
গান ত হইল শেষ, কোথা তুমি সুর-রেশ ?
সুখ দুঃখ হ'ল শেষ, হ'ল শেষ কারে খুঁজে ?
('ভুল')

কল্পনার সঙ্গে আজ আর বাস্তবের যোগ নাই, আত্মতন্ত্র প্রেমের মধ্যে

ভাবাবেগ অপেক্ষা ভাবালুতা অধিক। এই অবস্থায় কবি ভালবাসাকে ভালবাসিয়াছেন, প্রেমাস্পদ উপলক্ষ্য মাত্র। যে চিন্ময়ী প্রেমের অনুসরণ কবি করিয়াছেন তাহা কায়ায় ধরা দেয় না, এই উপলব্ধি, এই স্বপ্নভঙ্গ, এই ব্যর্থতা আজ কবিপ্রাণে আক্ষেপ ও বেদনা জাগাইয়া তুলিয়াছে। আজ তাই অনায়ত্ত আদর্শ প্রেমের জন্য কবির ক্রন্দন,—

এত দিনে বুঝিলাম,—যখন কি হবে বুঝে—
অনন্তের মাঝে আমি ছুটিতেছি অন্ত খুঁজে!
যেখানে অনন্ত স্তব্ধ, খুঁজিতেছি সেথা শব্দ ;
যেখানে অনন্ত স্বপ্ন, খুঁজিতেছি সেথা কাজ।
নাহি সুখ, নাহি শ্রান্তি, খুঁজিতেছি সেথা ভ্রান্তি ;—
চড়িতেছি স্মৃতি-ভেলা অনন্ত খেলার মাঝ !
এত দিনে বুঝিলাম—কি হবে বুঝিয়া আজ।
('ভুল')

ভাবতান্ত্রিক প্রেমিক-কণ্ঠে আজ তাই হাহাকার বাজিয়া উঠে,—

সে স্বপ্ন কোথায় গেল,
জাগরণ কেন এল ?
জগতের ছাড়াছাড়ি হৃদয়ে ঘুচিতেছিল!
('কনকাঞ্জলি')

বাস্তব-বাত্যাবিক্ষুব্ধ হৃদয়-সমুদ্রে আজ দুরন্ত ঝড় উঠিয়াছে 'সযতন-স্বপনকর্ষণের' বিফলতায় কবি কাতর; 'অতনুকম্পিত-তনু' কল্পনা-বিলাসে অতৃপ্ত, চির-আলিঙ্গনের নিবিড় বন্ধনের জন্য কবি আজ উন্মুখ।

'কনকাঞ্জলি' কাব্যে বাস্তব ও স্বপ্নের দ্বন্দ্ব শেষে কঠিন বাস্তব ভূমিতে কবির উত্তরণ। বাস্তব-দুঃখ আজ তাই বরণীয় বলিয়া মনে হইয়াছে। মিলনের চঞ্চল সুখ বা আদর্শ প্রেমের ধ্যান অপেক্ষা বিরহের অচঞ্চল পাবক-পরশ তাঁহার কাম্য। সেই জন্য—

দহিয়া বিরহ দাহে হোক আরো শুদ্ধ প্রাণ,
প্রেমময়ি, পায় যাহে করিবারে অধিষ্ঠান।
কত যুগ দাও বলে—কিংবা জন্ম-পরে কত
কত দুঃখে জলে জলে হব তব মনোমত। ('কনকাঞ্জলি')

'শঙ্খে' এই সংগ্রাম শেষে কবি পাইয়াছেন শ্রান্তির কামনাহীন নির্বেদ। আদর্শান্বিত প্রেমের এখানেই ইতি।

বিহারীলালের 'নিশান্ত-সংগীতে' বর্ণনার যে সূক্ষ্মতা, উপমার যে কোমলতা, চিত্ররূপের যে সুষমা লক্ষ্য করা যায়, তাহা অক্ষয়কুমারের 'স্বপ্নরাণী' কবিতায় প্রকাশিত :

ঘুমন্ত চাঁদের বুক হতে,
ভেসে ভেসে জোছনার স্রোতে,
মুক্ত বাতায়ন দিয়া, ত্রাসে কম্পিত হিয়া,
আসি, প্রিয় তোমায় দেখিতে !......
আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায় ।
যাই—যাই, নাহি বল, চোখে ভরে আসে জল,
হৃদয় কাঁপিয়া উঠে সন্দেহে লজ্জায় ।
আর বার মনে হয়,— কেন লজ্জা, কেন ভয় ?
নয়নে লিখিয়া সেই অলক্ষ্য চুম্বনে,—
যে প্রেম ফুটে কভু নারীর বচনে ।
('কনকাঞ্জলি')

প্রেমের সব-ভুলানো উন্মত্ত হৃদয়াবেগের কী আশ্চর্য কাব্যরূপ 'হৃদয় সমুদ্র সম' কবিতাটিতে ধরা পড়িয়াছে ! এই সকল বর্ণনা পাঠের সময় একথাই মনে হয় আদর্শলোকের ধ্যানজ্যোতি দ্বারা ইহা মণ্ডিত হইয়া আছে—

হৃদয় সমুদ্র সম আকুলি উচ্ছ্বসি'
আছাড়ি পড়িছে আসি তব রূপকূলে !
হৃদয়—পাষাণ-দ্বার দাও—দাও খুলে !
চিরজন্ম লুটিব কি ও পদ পরশি' ?
অহর্দিন—অহুক্ষণ দুরাশায় শ্বসি'
বৃথায় পশিতে চাই ওই মর্ম-মূলে !
লক্ষ্যহীন-নেত্রে, নারী সাজি নানা ফুলে,
মরণ-লুণ্ঠন হের,—স্থির গর্বে বসি !

এ সেই কবিধ্যান ! মৃত্যুর সহিত প্রেমরহস্যের তুলনা ! রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয়-যমুনা' ও 'ঝুলন' এবং সুধীন্দ্রনাথের 'ভিখারী' কবিতার মতো এখানেও মৃত্যুরহস্যের সহিত প্রেম একাত্ম হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ আদর্শান্বিত প্রেমকবিতার ইহা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এই উপমাচিত্রের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়াছে 'শত নাগিনীর পাকে' কবিতাটিতে—প্রেমের অসহ্য আনন্দ এখানে শত নাগিনীর নিষ্ঠুর বন্ধনের মধ্যে মূর্ত হইয়াছে,—

শত নাগিনীর পাকে বাঁধ' বাহু দিয়া
পাকে পাকে ভেঙ্গে যাক্ এ মোর শরীর !
এ রুদ্ধ পঞ্জর হ'তে হৃদয় অধীর
পড়ুক ঝাঁপায়ে তব সর্বাঙ্গ-ব্যাপিয়া !
হেরিয়া পূর্ণিমা-শশী—টুটিয়া লুটিয়া
ক্ষুভিয়া প্লাবিয়া যথা সমুদ্র অস্থির ;

বসন্তে—বনান্তে যথা দুরন্ত সমীর
সারা ফুলবন দলি' নহে তৃপ্ত হিয়া।

তিনটি সুনির্বাচিত চিত্রের দ্বারা কবি প্রেমের অসহ্য আবেগকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কবি উপমা আহরণ করিয়াছেন প্রকৃতি হইতে। এখানেই তিনি স্বতন্ত্র।

এই অসহ্য প্রেমাবেগের চরম পরিণতি 'এষা' কাব্যে—সেখানে নিষ্ঠুর মৃত্যু আসিয়া কবি-প্রিয়াকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে—কবির প্রেম শোকের শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া লঠিয়াছে।

প্লেটোনিক প্রেমকবিতা

বাংলা সাহিত্যে বিশ্বসৃষ্টির রহস্যভেদকারী প্লেটোনিক বা কসমিক প্রেমকবিতার সাক্ষাৎ মিলে বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে।

প্রথমেই এই প্লেটোনিক বা কসমিক প্রেমের স্বরূপ আলোচনা করা যাক।

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা শেলীর কাব্য আলোচনা করিব। বস্তুতপক্ষে শেলীর কাব্যে প্লেটোনিক প্রেমের পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়াছে। তাই শেলীর প্রেমকাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করিলে এবং বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের উপর ইহার প্রভাব নিরূপণ করিতে পারিলে আমাদের কার্যসিদ্ধি হইবে।

প্লেটো তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Symposium-এ প্রেম সম্পর্কে গ্রীক দর্শনের সার অভিমত সংকলন করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রেম কেবল মানুষের জৈবিক সম্বন্ধ নহে, ইহা সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত এক কস্‌মিক নীতি। এই নীতি জীবনের মহত্তম ধ্যানের নীতি ; মানুষ আকস্মিকভাবে সেই সম্পর্কে জড়াইয়া পড়িয়াছে।

শেলীর কাব্য এক অসাধারণ আদর্শানুসন্ধানীর যাত্রাপথের কাহিনী। তিনি উপনিষদের স্রষ্টার ন্যায় বিশ্বের অণুপরমাণুতে 'অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান্' ঐশী লীলার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। এই অধ্যাত্মবোধ ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের কাব্যে শান্ত নিঃসংশয় উপলব্ধিতে স্থির দীপশিখার ন্যায় প্রোজ্জ্বল, শেলীর কাব্যে ইহা নানা ভাব-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া বিচিত্র বর্ণে বিচ্ছুরিত। শেলীর এই আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতারই অপর রূপ কসমিক্ প্রেমাদর্শের অনুসরণ।

প্লেটো তাঁহার আলোচনায় সোক্রাতেসের অভিমত উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, সৌন্দর্যের একটি বাস্তবাতিরিক্ত শক্তি ও মাহাত্ম্য আছে। মানুষ একদা সৌন্দর্যস্বর্গের অধিবাসী ছিল, আজ তাই সৌন্দর্যের প্রত্যক্ষ রূপ তাহার জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। শেলীর Alastor কাব্যের নায়ক এই আদর্শ সৌন্দর্যের চঞ্চল অপার্থিব অপসরণশীল জ্যোতি দর্শন

করিয়াছিল এবং ইহারই অনুসন্ধানে সে তাহার সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়াছিল। The Revolt of Islam কাব্যের নায়ক Laon নায়িকা Cythna-র বর্ণনা করিয়াছে এই ভাবে :

She did seem
Beside me, gathering beauty as she grew,
Like the bright shade of some immortal dream,
Which walks, when tempest sleeps the wave of life's dark stream.
(ii, 23)

গ্রীক দার্শনিক ফীডরাস্ প্রেমিক-প্রেমিকার উপর প্রেমের অসীম প্রভাব ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, প্রেম জীবনে সকল মহৎ কর্মে প্রেরণা দেয় ও মহৎ আদর্শে উজ্জীবিত করে; গ্রীক পুরাণের বীরবৃন্দ এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। শেলীও তাহাই করিয়াছেন।

'Rosalind and Helen' কাব্যের নায়ক Lionel সম্পর্কে শেলী বলিয়াছেন :

For love and life in him were twins,
Born at one birth.

গ্রীক দার্শনিক Aristophanes প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের উপর খুব জোর দিয়াছিলেন—এই মিলনকে তিনি একাত্মীভূত হইয়া যাওয়া বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'The Revolt of Islam' কাব্যে এই নিবিড় একাত্ম-মিলনের কথা আছে :

What is the strong control
Which leads the heart that dizzy steep to climb,
Where far over the world the vapours roll
Which blend two restless frames in one reposing soul ?
(vi, 35-36)

সোক্রাতেস্ প্রেমকে সকল জ্ঞানের প্রথম ধাপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রেমিক ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করিয়া পরম জ্ঞানের সাক্ষাৎ লাভ করে। The Revolt of Islam কাব্যে ইহারই অনুস্মৃতি :

In me communion with purest being
Kindled intenser zeal and made me wise
In knowledge, which is hers mine own mind seeing,
Left in the human world few mysteries.
(ii, 23, 32)

শেলীর অধ্যাত্মবোধ 'Prometheus Unbound'-এ বিশ্বব্যাপী নবসৃষ্টির

বীজশক্তি প্রেমের বিরাট রূপকে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই গীতিকাব্যের 'Hymn to Asia' নামক গানে আধ্যাত্মিক দেহাতীত অথচ দেহাশ্রয়ী প্রেমের নিগূঢ় অপরূপতা সাংকেতিক ভাস্বরতায় ফুটিয়াছে। প্লেটোর আদর্শ প্রেমের মূর্তিমতী প্রতিমা এশিয়া; সে সমগ্র পৃথিবীকে তাহার আলোকে উদ্ভাসিত ও উজ্জীবিত করে। প্রমিথীয়ুস-এর চরম সৌভাগ্য নিহিত আছে প্রেমের প্রতিমা এশিয়ার সহিত নিবিড় মিলনে। সে প্রেমের বর্ণনা:

Love, like the atmosphere
Of the sun's fire, filling the living world,
Burst from thee and illumined earth and and heaven
And the deep ocean and the sunless caves
And all that dwells within them : (Act II, Sc. 5)

গ্রীক দার্শনিক Eryximachus প্রেমের সর্বগামিতা ও প্রকৃতির সর্বত্র ইহার উপস্থিতি বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সকল ঋতুতে প্রেমের স্বাক্ষর আছে—প্রেমের পরশে সমগ্র প্রকৃতি নবযৌবন লাভ করে। প্রেমের এই কসমিক রূপের বর্ণনা Prometheus Unbound-এ আছে। 'The Sensitive Plant' কবিতায় প্রেমের এই প্রভাব ফুলের জীবনে পরিবর্তন আনিয়াছে:

The Naiad-like lily of the vale,
Whom youth makes so fair and passion so pale.

এই কবিতার নায়িকার সৌন্দর্য তাহার দেহজাত নহে, মানসিক আনন্দজাত,

Which, dilating, had moulded her mien and motion,
Like a sea-flower unfolded beneath the ocean.

প্লেটোনিক প্রেমের বাস্তব রূপায়ণ এই Sensitive Plant:

It loves, even like Love, its deep heart is full,
It desires what it has not, the beautiful.

'Epipsychidion' কাব্যে প্লেটোনিক প্রেমের চরম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ইহাতে যে ব্যাকুল অতৃপ্ত প্রেমের আবেগ নিজ জলন্ত প্রাণশক্তিতে ধূপের ন্যায় আদর্শলোকের উচ্চাকাশে উঠিয়া হাহাকারে ফাটিয়া পড়িয়াছে, তাহা বিভিন্ন নারীকে আশ্রয় করিয়া সার্থকতা লাভের বৃথা চেষ্টায় এই ধরা ছোঁয়ার অতীত, বিভ্রান্তকারী অধ্যাত্মবোধের সহিত সমধর্মী। দার্শনিক ফীড্রাসের আলোচনায় ইহার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে। এ কাব্যের নায়িকা এমিলিয়া যেন পৃথিবীর অন্ধকারের উপর ভাসমান পক্ষবিশিষ্ট আত্মা; সে অপর এক মহত্তর সুন্দরতর জগতের উজ্জলতর সৌন্দর্যের প্রতিমা। এই প্রতিমার বর্ণনা:

Veiling beneath that radiant and more wonderful world :
All that is insupportable in thee

Of light and love and immortality.

এমিলিয়া অনন্ত সৌন্দর্যের প্রতিমা। যে অদৃশ্য জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ মাঝে মাঝে চকিতে আমাদের স্পর্শ করিয়া পলাইয়া যায়, এমিলিয়া সেই অলৌকিক জগতের সকল সৌন্দর্যের ঘনীভূত প্রতিমা। এই প্রতিমা কবিকে উন্মত্ত করিয়াছে; চরম সৌন্দর্যের জ্যোতিদর্শনে উন্মত্ত কবিকে এই জগতের ঊর্ধ্বে লইয়া গিয়াছে। কবি এই প্রতিমার সহিত নিবিড় মিলন প্রার্থনা করিয়াছেন। শেলীর জীবনবোধ এই প্রতিমার অধ্যাত্মদীপ্তিতে ভাস্বর; তিনি এই অপসরণশীল, চঞ্চল, অস্থির জ্যোতির্ময়ী সৌন্দর্যের ধ্যানে বিভোর হইয়াছিলেন; শেলীর প্রেম এই অলৌকিক প্রেম।

বিহারীলালের প্রেমকবিতায় এই প্লেটোনিক প্রেমের সাক্ষাৎ মিলে। অবশ্য শেষদিকে এই প্লেটোনিক রূপটি সামনে উপস্থিত ছিল না, তাহা পিছন হইতে প্রেরণা জোগাইয়াছে—সামনে তখন বড় হইয়াছে ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত বন্দনা—সারদার ধ্যান।

বিহারীলাল যে প্রেমের গান গাহিলেন, তাহা বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতি সব-ভুলানো প্রেমের গান। সে গান অশরীরী সৌন্দর্যের ('airy nothing') গান; সে বীণাধ্বনি অপরিচিত ('The forms of things unknown'); সে সুর কল্পনা-কানন-বিহারী অশরীরী অঙ্গের সমীর-চুম্বন ('Aerial kisses of shapes that haunt thought's wildernesses')। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের সারদামঙ্গল-গান সম্পর্কেই বলিয়াছেন, "আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধার উৎসের মতো কোথাও উৎসারিত হয় নাই।" ('সাধনা', আষাঢ়, ১৩০১ বঙ্গাব্দ)।

'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) ও 'সাধের আসন' (১৮৮৮) কাব্যে আমরা বিহারীলালকে সৌন্দর্য ও প্রেমের মিষ্টিক কবি রূপে দেখি। শেলীর মতো তিনিও বিশ্বের সর্বত্র প্রেমের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন ও ইহার জয়ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু এই মিষ্টিক সাধনার কি কোনো প্রস্তুতি ছিল না? ইহা কি একেবারেই আকস্মিক? বস্তুতঃ তাহা নহে।

'সংগীতশতক' (১৮৬২) কাব্যে আদর্শায়িত প্রেমের বন্দনা কবি গাহিয়াছেন। প্রেমান্বেষণে কবি ব্যাকুল; তারপর প্রেমাগমে কবির আনন্দ-উল্লাস ও তাহা প্রাণপ্রেয়সীর আনন্দ-বন্দনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। তারপর প্রেমের নানা আকর্ষণ বিকর্ষণের আলোচনা কবি করিয়া শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, বাস্তব জগতে প্রেমের কোন লৌকিক প্রতিষ্ঠাভূমি নাই। বর্তমান অধ্যায়ের গোড়ার দিকে ইহা আলোচিত হইয়াছে।

তারপর 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭০) ও 'প্রেমপ্রবাহিণী' (১৮৭০) কাব্যে কবি নূতন পথে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রথমোক্ত কাব্যে সাহিত্যিক অনুবর্তন ত্যাগ

করিয়া, বিষয়-নির্বাচনে মৌলিকতা দেখাইয়া বিহারীলাল সাহসের সহিত বন্ধুবর্গ ও নিজ স্ত্রীর উদ্দেশ্যে ছন্দোবদ্ধ স্মৃতি-তর্পণ করিয়াছেন। 'প্রেমপ্রবাহিণী' কাব্যে বিহারীলাল প্রেমতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা প্রেমাদর্শের ধ্রুবতারার আলোকে আলোকিত। এই কাব্য পাঠে এই ধারণাই জন্মে যে, প্রেমের লৌকিক ও বিশেষ আধারগত সত্তার উর্দ্ধে যে একটি সার্বভৌম অধ্যাত্ম সত্তা আছে, তাহার অনুভূতি কবির মনে অস্পষ্টভাবে জাগিয়াছে। বাস্তবজগতে প্রেমের কোন লৌকিক প্রতিষ্ঠাভূমি নাই ও অন্তরলোকে ধ্যানসমাহিত চিত্তেই প্রেমের উপলব্ধি সম্ভব। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে এই প্রেমের আনন্দময় সত্তার অবস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চয়তার সুরেই এই কাব্যের সমাপ্তি :

ক্রমে ক্রমে নিবিতেছে লোক-কোলাহল,
ললিত বাঁশরীতান উঠিছে কেবল।
মন যেন মজিতেছে অমৃত-সাগরে,
দেহ যেন ফাটিতেছে সমাবেগভরে।
প্রাণ যেন উড়িতেছে সেই দিক পানে,
যথার্থ তৃপ্তির স্থান আছে যেই স্থানে!
অহো অহো, আহা আহা একি ভাগ্যোদয়,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আজি প্রেমানন্দময়। (পঞ্চম সর্গ)

ইহাই সারদামঙ্গলের প্লেটোনিক প্রেমের পূর্বাভাস।

'শরৎকাল' কাব্যে বিহারীলাল প্রেয়সীর যে বর্ণনা দিয়াছেন, সেখানেও এই পূর্বাভাস পাই। এই কাব্যের 'নিশান্ত-সংগীত' শুধুই দাম্পত্য-প্রেমের পূর্ণ সুখ-সম্ভোগ নয়; এ প্রেম বিশ্বনিখিলের সঙ্গে কবিহৃদয়কে যুক্ত করিয়াছে। মানবিক প্রেম এখানে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য-ধ্যানের সহায়ক হইয়াছে। নিদ্রিতা প্রেয়সীর বর্ণনা :

আহা এই মুখখানি—
প্রেম-মাখা মুখখানি—
ত্রিলোক-সৌন্দর্য আনি কে দিল আমায়!
কোথায় রাখিব বল,
ত্রিভুবনে নাই স্থল,
নয়ন মুদিতে নাহি চায়!

এ কাব্যেরই 'নিশীথ-সংগীতে' কবির দৃপ্ত ঘোষণা—

আর কিছু নাই সুখ,
ওই চাঁদ, এই মুখ,
যেন আমি জন্মান্তরে ফিরে তুই পাই;

যাই আমি সেইখানে,
যেন আমি খোলা প্রাণে
একমাত্র পবিত্র প্রেমের গান গাই।

কবি নারী-বন্দনা করিয়াছেন পার্থিব প্রেমের জন্য নহে। সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত যে স্বর্গীয় প্রেম, নারী তাহারই প্রতিমা :

আছে, বিশ্বজয়ি—শক্তিময়ী নারী এ ধরায়,
তাই নরে বিধি পায় ;
আমার, সেই-ই স্বর্গ চতুর্বর্গ ; ধারি কেবল প্রেমের ধার।
(বাউল বিংশতি, ৬)

"বাউল বিংশতি"র এই গানগুলিতে কবি প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন:

না জানি কোথায় কি ফুল ফোটে,
সৌরভে হৃদয় নাচিয়া ওঠে,
মত্ত হয়ে খোলা প্রাণে প্রেমের মহিমা গাই। (৮)

এই প্রেমের মূর্তিমতী প্রতিমা নারীকে সম্বোধন করিয়া কবি গাহিয়াছেন :

প্রেমের সাগরে ফুলতরণী,
চির-বিকসিত নলিনী !
সৌরভেতে স্বর্গ হাসে, আকাশে থেমে দাঁড়ায়—
দেখ্‌তে তোমায়, থেমে দাঁড়ায় দামিনী।
আননে চাঁদের আল,
চাঁচর কুন্তলজাল,
অন্তরে আনন্দ-জ্যোতি, নয়নে মন্দাকিনী—
হাসে নয়নে মন্দাকিনী।

কে তুমি সুষমা মেয়ে,
আছ মুখপানে চেয়ে,
আলো করে অন্তরাত্মা, আলো করে ধরণী ! (১২)

সুতরাং 'সারদামঙ্গল' গানের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি যে ছিল, তাহা আমাদের স্বীকার করিতেই হয়। এখন দেখা যাক, এই সারদা কে? ইঁহার প্রতি কবির কী ধরণের প্রেম? এই সরস্বতী-সারদা কি বিদ্যাদেবী, না, অপর কেহ?

"কবি যে সরস্বতীর বন্দনা করিতেছেন তিনি নানা আকারে নানা ভাবে নানা লোকের নিকটে উদিত হন। তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। তিনি সৌন্দর্যরূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এবং দয়া স্নেহ প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন। ইংরেজ কবি শেলী যে বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

Spirit of Beauty, that dost consecrate
With thine own hues all thou dost shine upon
Of human thought or form

যাহাকে বলিয়াছেন—

Thou messenger of sympathies,
That wax and wane in lover's eyes

সেই দেবীই বিহারীলালের সরস্বতী।" (রবীন্দ্রনাথ—'আধুনিক সাহিত্য')।

আদি কবি বাল্মীকির তপোবনে এক দিকে যেমন তিমিররাত্রি ভেদ করিয়া তরুণ উষার অভ্যুদয় হইল, তেমনি অপরদিকে নিষ্ঠুর হিংসাকে বিদীর্ণ করিয়া দেবী সারদা করুণাময়ী কাব্যজ্যোতিরূপে প্রকাশ পাইলেন। তিনি "জ্যোতির্ময়ী কন্যা", তিনি "যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে"; আবার তিনিই বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী।

ব্রহ্মার মানস-সরোবরে সারদাদেবী স্বর্ণপদ্মের উপর দাঁড়াইয়াছেন এবং তাঁহার অসংখ্য ছায়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহা সারদাদেবীর বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যমূর্তি।—

ব্রহ্মার মানসসরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীল জলে মনোহর স্বর্ণনলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমাযামিনী।
কোটি শশী উপহাসি
উথলে লাবণ্যরাশি,
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে—
আচম্বিতে অপরূপ
রূপসীর প্রতিরূপ
হাসি হাসি ভাসি উদয় অম্বরে।

ইহার সহিত তুলনীয় প্রেমপ্রতিমা এশিয়ার বর্ণনা:

Life of Life! thy lips enkindle
With their love the breath between them.
Lamp of Earth! wher'er thou movest
Its dim shapes are clad with brightness.
('Hymn to Asia', 'Prometheus Unbound')

এই সারদাদেবীর, এই Spirit of Beautyর নব-অভ্যুদিত করুণাময়ী বালিকা মূর্তি এবং সর্বব্যাপ্ত সুন্দরী ষোড়শীমূর্তির বর্ণনা করিয়া কবি গাহিয়া উঠিলেন—

তোমারে হৃদয়ে রাখি,
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু'ই ভালো লাগে—
গিরিমালা, কুঞ্জবন,
গৃহ, নাটনিকেতন,
যখন যেখানে যাই যাও আগে আগে।…
যত মনে অভিলাষ'
তত তুমি ভালবাস',
তত মনপ্রাণ ভ'রে আমি ভালবাসি।
ভক্তিভাবে একতানে
মজেছি তোমার ধ্যানে,
কমলার ধনমানে নহি অভিলাষী।

এই মানসীরূপিণী সাধনার ধনকে পরিপূর্ণরূপে লাভ করিবার জন্য কাতরতা প্রকাশ করিয়া কবি প্রথম সর্গ সমাপ্ত করিয়াছেন।

শেলীর Epipsychidion কাব্যের এমিলিয়া অনন্ত-সৌন্দর্যের প্রতিমা। তাহাকে লাভ করিবার জন্য উন্মত্ত কবি এই জগতের সীমানা ছাড়াইয়া ঊর্ধ্বলোকে অভিযান করিয়াছেন। 'সারদামঙ্গলে'র কবিও দেবী সারদার উদ্দেশে অভিযান করিয়াছেন।

"তাহার পর-সর্গ হইতে প্রেমিকের ব্যাকুলতা। কখনো অভিমান কখনো বিরহ, কখনো আনন্দ কখনো বেদনা, কখনো ভর্ৎসনা কখনো স্তব। দেবী কবির প্রণয়িনী-রূপে উদিত হইয়া বিচিত্র সুখদুঃখে শতধারে সংগীত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছেন। কবি কখনো তাঁহাকে হারাইতেছেন, কখনো তাঁহার অভয়রূপ কখনো তাঁহার সংহারমূর্তি দেখিতেছেন। কখনো তিনি অভিমানিনী, কখনো বিষাদিনী, কখনো আনন্দময়ী।' (রবীন্দ্রনাথ, 'আধুনিক সাহিত্য')। কখনো মুহূর্তের জন্য সংশয় আসিয়া বলে—

তবে কি সকলি ভুল?
নাই কি প্রেমের মূল—
বিচিত্র গগনমূল কল্পনালতার?
মন কেন রসে ভাসে,
প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার?

তখনই আবার গভীর আশ্বাসে প্রাণ আশ্বস্ত হয়—

এ ভুল প্রাণের ভুল!
মর্মে বিজড়িত মূল,

জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী ;
এ এক নেশার ভুল,
অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল,
স্বপনে বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী।

কখনো বা প্রেমোপভোগের আদর্শ চিত্র মানসপটে উদিত হয়—

কী এক ভাবেতে ভোর,
কী যেন নেশার ঘোর,
টলিয়ে ঢলিয়ে পড়ে নয়নে নয়ন—
গলে গলে বাহুলতা,
জড়িমাজড়িত কথা,
সোহাগে সোহাগে রাগে গল গল মন।
করে কর থরথর,
টলমল কলেবর,
গুরুগুরু দুরুদুরু বুকের ভিতর—
তরুণ অরুণ ঘটা
আননে আরক্ত ছটা,
অধরকমলদল কাঁপে থরথর।
প্রণয়পবিত্র কাম
সুখস্বর্গ মোক্ষধাম—
আজি কেন হেরি হেন মাতোয়ারা বেশ !

এইরূপ বিষাদ, বিরহ, সংশয়, উপভোগের পর কবি হিমালয়শিখরে প্রণয়িনী দেবীর সহিত আনন্দমিলনের চিত্র আঁকিয়া কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। যিনি বিশ্বের সৌন্দর্যলক্ষ্মী, যিনি জীবনের অধিষ্ঠাত্রী, কবি তাঁহারই বন্দনাগানে কাব্য শেষ করিয়াছেন,—

দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী,
ত্রিভুবন আলো করি,
দু'নয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়।
দেখিয়ে মেটে না সাধ,
কী জানি কী আছে স্বাদ,
কী জানি কী মাখা আছে ও শুভ-আননে !
কী এক বিমল ভাতি
প্রভাত করেছে রাতি
হাসিছে অমরাবতী নয়নকিরণে।
এমন সাধের ধনে
প্রতিবাদী জনে জনে—

দয়া মায়া নাই মনে, কেমন কঠোর।
আদরে গেঁথেছে বালা
হৃদয়কুসুম মালা,
কৃপাণে কাটিবে কে রে সেই ফুলডোর!
পুন কেন অশ্রুজল
বহ তুমি অবিরল,
চরণকমল আহা ধুয়াও দেবীর!
মানসসরসী-কোলে
সোনার নলিনী দোলে,
আনিয়ে পরাও গলে সমীর সুধীর।
বিহঙ্গম, খুলে প্রাণ
ধরো রে পঞ্চম তান,
সারদামঙ্গলগান গাও কুতূহলে।

'সারদামঙ্গল' কাব্য-সমাপ্তির পর কবি একটি ক্ষুদ্র পরিশেষ—'শান্তি' যোগ করিয়াছেন। বৃহত্তর জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আয়ত্তাধীন করার যে সমস্যা আছে, ব্যক্তিগত জীবনে কবি তাহার সমাধান করিয়াছেন দাম্পত্য-প্রেমে। তাই এখানে তিনি বলিয়াছেন,

প্রিয়ে, কি মধুর মনোহর মূরতি তোমার।
সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার!······
ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে রাখি
ভোর হয়ে বসে থাকি
নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার!—
তোমায় দেখি অনিবার।
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
হোক্ গে এ বসুমতী যার খুসী তার!

জীবনে প্রেমকেই কবি চরম বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। Epipsychidion কাব্যে শেলী এই নিবিড় মিলনের কথা বলিয়াছেন,

One hope within two wills, one will beneath
Two overshadowing minds, one life, one death,
One Heaven, one Hell, one immortality,
And one annihilation. (1.584-87)

বিহারীলালও বলিয়াছেন:

প্রেমের প্রসন্নমুখ, সারদার স্তোত্রগান,
এ জগতে এই দুই আছে জুড়াবার স্থান! ('সাধের আসন')

'সাধের আসন' কাব্যে কবি দেবী সারদার স্বরূপ আরো বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন,

আকাশ পাতাল তুমি
সকলি, কেবল—তুমি।
এক করে বরাভয়,—
বিশ্বের নিয়তোদয়;
নিরত প্রলয় হয় অন্য করতলে।
দশ দিকে পায় স্ফূর্তি,
তোমার মহান্ মূর্তি,
অনাদি অনন্ত কাল লোটে পদতলে!
প্রত্যক্ষে বিরাজমান,
সর্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা;
কবির যোগীর ধ্যান,
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
মানব-মনের তুমি উদার সুষমা।

'সাধের আসনে' কবি শেলীর প্রভাব ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনের অনুসরণে তিনি সারদার ধ্যান করিয়াছেন এবং নিম্নোক্ত শ্লোকটিরই উপরোক্ত কাব্যরূপ দিয়াছেন:

'যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।'

দেবী সারদা এই কাব্যে 'যোগেন্দ্রবালা' রূপে আবির্ভূতা। এই যোগেন্দ্রবালার রূপবর্ণনা:

অধরে ধরে না হাস,
আঁধার কেশের রাশ,
করুণ কিরণে আর্দ্র বিকসিত বিলোচন;
প্রফুল্ল কপোলে আসি
উথলে আনন্দ রাশি,
যোগানন্দময়ী-তনু, যোগীন্দ্রের ধ্যানধন।

তারপর কবি ইঁহাকে প্রেয়সীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং জীবনে তাঁহার প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন:

তোমার পবিত্র কায়া,
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া, ভালবেসে সুখী হই,

ভালবাসি নারী নরে,
ভালবাসি চরাচরে,
ভালবাসি আপনারে, মনের আনন্দে রই।
প্রেয়সী আমার!
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!

শেষে কবি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে,—

প্রেয়সীর ঢল ঢল বিকশিত আননে,
দেখি সে যোগেন্দ্রবালা যোগভোলা নয়নে!
প্রেমের প্রসন্ন মুখ, সারদার জোর গান,
এ জগতে এই দুই আছে জুড়াবার স্থান!

এই প্রেম প্লেটোনিক প্রেম। 'সারদামঙ্গল'-'সাধের আসনে' ইহারই জয়গান।

বিহারীলাল কেবল প্লেটোনিক প্রেমের কবি নহেন, তিনি মিষ্টিক কবিও বটেন। রবীন্দ্রনাথও তা'ই। এই দুই কবির আলোচ্যমান পর্যায়ের কাব্য-ধারাকে মিষ্টিক কাব্যধারা বলা চলে। রোমান্টিক কবিভাবনা হইতে ইঁহারা মিষ্টিক কবিভাবনার স্তরে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই মিষ্টিক কবিভাবনার স্বরূপ কি?

রোমান্টিক কবি জগৎ ও জীবনের মধ্যে এক অজানা রহস্যের সন্ধান পান ও 'আপন মনের মাধুরী' মিশাইয়া তাহা আস্বাদন করেন। রোমান্টিক কবি নারীর মধ্যে সেই অজানা রহস্য-সৌন্দর্য আবিষ্কারে ব্রতী হন। তখন জাগতিক সৌন্দর্য একটা অপরিচয়ের আনন্দের সহিত সংযুক্ত হইয়া গভীরতর সার্থকতায় মুক্তিলাভ করে। বিশ্বসৌন্দর্যের অন্তঃস্থলে অধিষ্ঠিতা সৌন্দর্যলক্ষ্মীর মূর্তিখানি দূর হইতে অস্পষ্টরূপে কবিকে মুগ্ধ করিতে থাকে। কবি স্পষ্ট করিয়া ইহাকে বোঝেন না। রোমান্টিক প্রেম এই অস্পষ্ট পরিচয়ের প্রেম।

মনের আনন্দময় রহস্যময়তা যখন কবিহৃদয়ের একটি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সংযুক্ত হয়, তখনই কবি রোমান্টিক জগৎ হইতে মিষ্টিক জগতে প্রবেশ করেন। রোমান্টিক কবির নিকট জীবন ও প্রকৃতির যে ইঙ্গিতময় উপাদানগুলি ছিল অস্পষ্ট ও কুহেলিকাময়, মিষ্টিক কবির নিকট সে সকল ইঙ্গিতই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিশ্ববিধানের অন্তরালে একটি বিরাট সত্তার সন্ধান দেয়। মিষ্টিক কবিতায়ও একটা রহস্যময়তা আছে, কিন্তু সে রহস্যময়তা অজানার আনন্দ হইতে উদ্ভূত নহে, সে রহস্যময়তা একটি অসীম সত্তার সম্বন্ধে সচেতনতা এবং তাহাকে উপলব্ধির প্রয়াসে প্রতিফলিত। সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর রূপের সুদূর আভাস পাইয়াই মিষ্টিক কবি তৃপ্ত হন না, জগতের সমস্ত সৌন্দর্য-প্রকাশের মধ্যে সেই

সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর স্পর্শের সন্ধান পান। এখন আর কবি রূপের পূজারী নহেন, তিনি বিশ্বসৌন্দর্যের সাধক।

বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যেই প্রথম মিষ্টিক কবিভাবনার পরিচয় পাওয়া গেল। সারদার প্রতি কবির যে প্রেম, তাহা মিষ্টিক প্রেম। রবীন্দ্রনাথে এই প্রেমের পূর্ণতর ও বিচিত্রতর প্রকাশ।

'কড়ি ও কোমলে'র পার্থিব প্রেমের স্তর হইতে 'মানসী'র আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার স্তরে কবির উত্তরণ. পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। 'মানসী' কাব্যে এই তত্ত্ব লাভ করি, 'মর্মের কামনা' যখন গাঢ়তম ও গভীরতম হয়, তখন আমরা বাস্তবকে যে বাস্তবাতীত অপরূপ মূর্তিতে দেখি, তাহাই 'মানসী'। 'সোনার তরী' কাব্যে কবি এক ধাপ অগ্রসর হইলেন। এখন হইতে কবিকে চালাইতেছে ও তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে অন্য এক অদৃশ্য মহৎ সত্তা। 'মানসসুন্দরী' কবিতায় এই শক্তির প্রতি কবির আনুগত্য প্রকাশ পাইয়াছে। প্রেমের আকর্ষণ যে মূলতঃ অতিবাস্তবের আকর্ষণ : কবির মনে এখানে এই উপলব্ধি হইয়াছে। কবি রোমান্টিক প্রেম হইতে মিষ্টিক প্রেমের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রেমের নূতন অধ্যাত্মগৌরব কবি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :

> ,—খেলাক্ষেত্র হতে
> কখন অন্তরলক্ষ্মী এসেছ অন্তরে,
> আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
> বসি আজ মহিষীর মতো।'

শুধু তা'ই নয়,—

> 'ছিলে খেলার সঙ্গিনী—
> এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
> জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।'

শেলীর Spirit of Beauty ও বিহারীলালের সারদার মতো মানসসুন্দরীও বিশ্বের সর্বত্রবিরাজিতা, নিখিল সৌন্দর্যের প্রতিমা। এই মানসসুন্দরীর প্রতি কবির ব্যাকুল জিজ্ঞাসা :

> 'সেই তুমি
> মূর্তিতে কি দিবে ধরা। এই মর্তভূমি
> পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে ?
> অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
> সর্ব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
> করিয়া হরণ, ধরণীর একধারে
> ধরিবে কি একখানি মধুর মূরতি।'

এই ব্যাকুলতাই প্রমাণ করে যে কবি এখনও মিষ্টিকের নিঃসংশয় উপলব্ধিতে

পৌছান নাই। 'চিত্রা' কাব্যে কবি 'সোনার তরী'-যুগের অস্পষ্ট আকুলতা হইতে প্রগাঢ় উপলব্ধির জগতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যে অলৌকিক রহস্যময় সৌন্দর্য 'সোনার তরী'তে কবিকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়াছিল, তাহা 'চিত্রা'য় বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। একদিকে ইহা বিশ্বের প্রবাহের মধ্যে বিচিত্র-রূপিণী 'চিত্রা' রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে, অপর দিকে ইহা কবির অন্তরে অন্তরতম হইয়া 'জীবনদেবতা' রূপে বিরাজ করিতেছে।

কবির মিষ্টিক চেতনা এখন পরিপূর্ণ হইয়াছে,—নিখিল বিশ্বের সকল সৌন্দর্যের মূলে রহিয়াছে যে চিরন্তন সৌন্দর্যলক্ষ্মী—সেই Spirit of Beauty-র পদপ্রান্তে কবি এখন প্রেমপুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বর্ণনা :

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুলকাননে,
দ্যুলোকভূলোকে বিলসিছ চলচরণে,
তুমি চঞ্চলগামিনী।......
অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।......
অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি.
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।

কবি তাঁহার সৌন্দর্যলক্ষ্মীর এই কসমিক রূপ ধ্যান করিয়াছেন এবং এই প্রতিমার প্রেমে পড়িয়াছেন। 'অন্তর্যামী' কবিতায় এই প্রতিমার প্রতি কবির ব্যাকুল প্রেমনিবেদন আরো স্পষ্ট, আরো উজ্জ্বল রঙে রেখায় চিত্রিত হইয়াছে :

রাখো কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
আমার অর্থ, তোমার তত্ত্ব
বলে দাও মোরে অয়ি।
আমি কি গো বীণাযন্ত্র তোমার,
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্ছনা ভরে গীতঝংকার
ধ্বনিছ মর্মমাঝে?
আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,—

কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে।

'জীবনদেবতা' কবিতায় কবির আবেদন ব্যাকুলতর হইয়াছে :

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।......
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে--
নূতন বিবাহে বাঁধিবে মোরে
নবীন জীবন ডোরে।

কবির তাই নবজন্ম হইয়াছে। প্রেমের মধ্যে কবি এক গভীরতর তাৎপর্য আবিষ্কার করিয়াছেন ; ইহা কেবল ব্যক্তিগত মধুর অনুভূতি নহে, বিশ্বচেতনার সহিত কবিচেতনার সংযোগসূত্র ও কবির জন্মজন্মান্তরের ঐক্যবিধায়ক, জীবনের পূর্ণতা ও জীবনবোধের প্রগাঢ়তা সম্পাদনকারী এক রহস্যময় শক্তি। এই সুগভীর তাৎপর্যবোধ যেখানেই নিঃসংশয় আত্মপ্রত্যয়ের সহিত বিধৃত হইয়াছে, সেইখানেই কবির শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিশ্রুতি লক্ষ্যগোচর হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

দেশপ্রেমের কবিতা

ইংরেজি ও বাংলা দেশপ্রেমের কবিতা

বাংলা দেশে ইংরাজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে যে কয়েকটি ভাবধারা আমাদের মনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—জাতীয়তাবোধ তাহাদের অন্যতম। আমরা ইহার পূর্বে কখনও এইভাবে দেশকে দেখি নাই বা ভালবাসি নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতামালার চয়ন "Nationalism" (১৯১৭) পুস্তকে এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'India has never had a real sense of nationalism. Even though from childhood I had been taught that idolatry of the Nation is almost better than reverence for God and humanity, I believe I have outgrown that teaching, aud it is my conviction that my countrymen will truly gain their India by fighting against the education which teaches them a country is greater than the ideals of humanity.' (পৃ: ১০২)। বিশ্বমানবতার উপর জাতীয়তাবোধের জয়লাভে একটি আফশোষের সুর এই বক্তৃতায় ধ্বনিত হইয়াছে, ইহা সত্য। কিন্তু একথাও অবশ্যস্বীকার্য যে, এই জাতীয়তাবোধ বাংলা তথা ভারতের আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায়ক হইয়াছিল।

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে দেশপ্রেমের প্রভাব আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন: "স্বাদেশিক ঐক্যের মাহাত্ম্য আমরা ইংরেজের কাছে শিখেছি। জেনেছি এর শক্তি, এর গৌরব। দেখেছি এই সম্পর্কে এদের প্রেম, আত্মত্যাগ জনহিতব্রত। ইংরেজের এই দৃষ্টান্ত আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। অধিকার করেছে আমাদের সাহিত্যকে। আজ আমরা দেশের নামে গৌরব স্থাপন করতে চাই মানুষের ইতিহাসে। এই-যে আমাদের দেশ আজ আমাদের মনকে টানছে, এর সঙ্গে সঙ্গেই জেগেছে আমাদের ভাষার প্রতি টান। মাতৃভাষা নামটা আজকাল আমরা ব্যবহার করে থাকি, এ নামও পেয়েছি আমাদের নতুন শিক্ষা থেকে।" ('বাংলাভাষা পরিচয়' পৃ ৩৬)।

বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয়তাবোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দেশপ্রেমের প্রথম দেখা পাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়; তারপর রঙ্গলালের'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে (১৮৫৮)। এই কাব্যেই রোমান্স-রসের উদ্বোধন হইল। বাংলা কাব্য ভারতের ইতিহাসের পথে যাত্রা শুরু করিল।

বাংলা দেশপ্রেমের কবিতা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ইংরেজি দেশপ্রেমের কবিতা আলোচনা করা প্রয়োজন, কারণ শেষোক্ত শ্রেণীর বহুল প্রভাব আমাদের দেশপ্রেমের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মুখপাত্র ইংরাজী সভ্যতা যে দেশপ্রেমের ধারক, তাহা আসলে উগ্র জাতীয়তাবোধ। উপরোক্ত গ্রন্থেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :The truth is that the spirit of conflict and conquest is at the origin and in the centre of Western nationalism. (পৃঃ ২১)।

ইংরাজের দেশপ্রেম ও আমাদের দেশপ্রেম—এই দুইয়ের মধ্যে একটি মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। স্বাধীন শক্তিমদমত্ত 'সাগরের রাণী' ইংলণ্ডের দেশপ্রেম স্বভাবতই আক্রমণোদ্যত ও গর্বভাবে পরিপূর্ণ। আর আমাদের প্রাক্-স্বাধীনতা-যুগের দেশপ্রেম পরাধীন দেশের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বেদনা অপমান হইতে মুক্তি লাভেরজন্যপ্রাণোৎসর্গকারী সাধনা। সেইজন্য ইংরেজ কবির বীণায় যখন সাগর অভিযানের দৃপ্ত আহ্বান বাজিয়া উঠে, তখন বাঙালি কবির বীণায় পরাধীনতার বেদনা ও গ্লানি হইতে মুক্তি লাভের জন্য, শতাব্দীব্যাপী জড়তা ও মোহনিদ্রা হইতে জাগরণের জন্য আবেদন ও প্রেরণার সুর ধ্বনিত হয়। এবং এই আবেদন সোজাসুজি জানাইবার উপায়ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে ছিল না। তাই রঙ্গলালকে রাজপুত-ইতিহাসের শৌর্যবীর্যমণ্ডিত অতীত ইতিহাসে পাদচারণ করিতে হইয়াছে এবং রোমান্স-রস উদ্বোধনের মধ্য দিয়া দেশপ্রেম প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

ইংরাজি দেশপ্রেমের কবিতা দার্ঢ্যপূর্ণ ও গৌরবমণ্ডিত। পরাধীনতার অসহ্য ক্লেশ ও হীনতা ইংরাজ কবিকে সহ্য করিতে হয় নাই, তাই তাঁহাকে জাতির মোহনিদ্রা ভাঙাইবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে হয় নাই। বরং দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে সকল সৈনিক নিকটে ও দূরে, দেশে ও বিদেশে প্রাণ দিয়াছে, তাহাদের বীরত্বের গৌরবগাথা ইংরাজ কবিরা প্রাণ ভরিয়া গাহিয়াছেন। সেক্‌সপীয়র, ড্রেটন, মিল্‌টন, বার্ন্‌স্, স্কট, টমাস ক্যাম্পবেল, টেনিসন, ডয়েল, হার্ডি, নিউবোল্ট, এবারক্রম্বি, গ্রেনফেল প্রমুখ কবিরা দেশের স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষার জন্য বীরত্বপূর্ণ আত্মোৎসর্গের কথাই ছন্দোবদ্ধ করিয়াছেন।

এবারক্রম্বি লিখিয়াছেন :

> These who desired to live, went out to death ;
> Dark underground their golden youth is lying.
> We live : and there is brightness in our breath
> They could not know—the splendour of their dying.

হার্ডির কবিতায় শুনি রণবিজয়ের কাহিনী :

In the wild October night-time, when the wind raved round the land,
And the Back-sea met the Front-sea, and our doors were blocked with sand,
And we heard the drub of Dead-man's
Bay,
Where bones of thousands are,
We knew not what the day had done for us
at Trafalgar,
Had done
Had done,
For us at Trafalgar !
('Boatman's Song' in "The Dynasts")

অষ্টাদশ শতাব্দে জেমস টমসন লিখিত "Rule, Britannia" কবিতাটি শক্তির দম্ভ ও গৌরব প্রকাশের পরিচয়স্থল। এই কবিতার ছত্রে ছত্রে 'সাগরের রাণী' ব্রিটানিয়ার বন্দনাচ্ছলে দেশপ্রেমের দার্ঢ্যপূর্ণ রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উপরোক্ত শ্রেণীর কবিতাগুলিকে রণোন্মুখ দেশপ্রেমের কবিতা বলা যায়। কিন্তু দেশপ্রেমের শান্ত সুরটিও উপেক্ষিত হয় নাই। লাভলেস্, মেস্‌ফিল্‌ড, ওয়র্ডসওয়র্থের কবিতায় এই সুরের পরিচয় রহিয়াছে।

মেস্‌ফিল্‌ড লিখিয়াছেন :

Then sadly rose and left the well-loved Downs,
And so by ship to sea, and knew no more
The fields of home, the byres, the market towns
Nor the dear outline of the English shore,
But knew the misery of the soaking trench
The freezing in the rigging, the despair
In the revolting second of the wrench
When the blind soul is flung upon the air.

এখানে নিজ পরিবার ও গৃহ ত্যাগ করিয়া অপরিচিত মরণসংকুল যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশে সৈনিকের যাত্রার করুণবিধুর রূপটি শান্ত সুরে ব্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু রণকোলাহল হইতে দূরে থাকিয়াও দেশপ্রেমের কবিতা ইংরেজিতে রচিত হইয়াছে। সেখানে মদগর্বিত অহঙ্কারী মনোভাবটি প্রাধান্য লাভ করে নাই। তাহার পরিবর্তে শান্ত সুরে বন্দনা গীত হইয়াছে। বাংলা কাব্যে এই শ্রেণীর দেশপ্রেমের কবিতা প্রচুর। মিল্‌টন, শেক্‌স্‌পীয়র, হেনলি প্রমুখের

কবিতায় এই সুরটি বর্তমান ; হেনলীর একটি কবিতায় স্বদেশভূমির অনুরাগ-সিক্ত অর্চনা :

What have I done for you,
England, my England ?
What is there I would not do,
England, my own ?

দেশপ্রেমের আরেকটি প্রকাশ নিজ গ্রাম, উপত্যকা, নদী, নগরীকে কেন্দ্র করিয়া রচিত কবিতানিচয়ে। এই আঞ্চলিক দেশপ্রেমের কবিতায় এমন একটি মোহাঞ্জন ও মায়া জড়িত আছে যে নিজ গ্রাম বা উপত্যকাকে মহান ও স্বর্গসুষমামণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। চসার, ড্রেটন, ব্রাউন, পোপ, বার্নস, রজার্স, ওঅর্ডসওঅর্থ, স্কট, ক্লেয়ার, ম্যাথু আর্নল্ড, ব্রান্ট, ডেভিডসন, বেলক্, এডোয়ার্ড টমাস, এবারক্রম্বির কবিতায় এই আঞ্চলিক দেশপ্রেমের সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়াছে। ডেভিডসনের কবিতা হইতে সামান্য উদাহরণেই তাহার পরিচয় পাই :

Night sank : like flakes of silver fire
The stars in one great shower came down ;
Shrill blew the wind ; and shrill the wire
Rang out from Stythe to Romney town.

দূরপ্রবাসে যুদ্ধরত সৈনিকের মনে দেশের জন্য যে ব্যাকুলতা, তাহার প্রকাশ আরেক শ্রেণীর কবিতায় লক্ষ্য করি। ব্রাউনিং, ফ্লেকার, ব্রুক, লেডউইগ, হজসন্, টেনান্ট উইলকিন্সন, সোর্লি, মারে প্রমুখের কবিতায় এই ব্যাকুলতা ধরা পড়িয়াছে। রুপার্ট ব্রুকের কবিতায় এই ব্যাকুলতার কী সকরুণ অভিব্যক্তি !

If I should die, think only this of me :
That there's some corner of a foreign field
That is for ever England. There shall be
In that rich earth a richer dust concealed,
A dust whom England bore, shaped, made aware,
Gave, once, her flowers to love, her ways to roam,
A body of England's, breathing English air,
Washed by the rivers, blest by suns of home.

ইংরেজ দেশপ্রেমের কবিতা কেবল দেশগৌরব কীর্তনে নহে, স্বদেশ-কৃত অন্যায়ের প্রতিবাদেও মুখর হইয়াছে। এই শ্রেণীর কবিতায় সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সামরিক অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে ও এই প্রতিবাদই দেশানুরাগের প্রবল অভিব্যক্তি রূপে দেখা দিয়াছে। মিল্টন্, শেলী, বায়রন্, ওয়াটসন, ব্রান্ট প্রমুখের কবিতায় ইহা লক্ষ্য করি। বায়রনের 'On the star

of the Legion of Honour' ও 'The Curse of Minerva,' শেলীর 'Lines to the Lord Chancellor' ও 'The Masque of Anarchy', ব্লান্টের 'A Day in Sussex,' ওয়াটসনের 'The Purple East' কবিতা ইহার পরিচয়স্থল।

আধুনিক বাংলা কাব্যে দেশপ্রেমের প্রথম ইঙ্গিত পাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেম সংকীর্ণ। বস্তুতঃ রঙ্গলালেই দেশ-প্রেমের কবিতার জন্ম হইল। বাংলা দেশপ্রেমমূলক কবিতায় ইংরেজি রণোন্মুখ দেশপ্রেমের কবিতা ও অতীত গৌরব স্মৃতি-উদ্বোধক কবিতার অনু-সরণ লক্ষ্য করা যায়। আঞ্চলিক দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি যতটা না ঘটিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বেশি হইয়াছে অতীত শৌর্যবীর্যগাথার পুনরালোচনা। বোধ করি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি এই অতীতের গৌরবস্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়া বর্তমানের বেদনা ও গ্লানি ভুলিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজি যুদ্ধ-গাথা—যাহা সৈনিকদের জীবনের মূল্যে রচিত—তাহা বাংলা কাব্যে দেখা যায় নাই; পুনশ্চ রণোন্মাদনার বিপরীত দিক যুদ্ধযাত্রী সৈনিকের নিজ গ্রাম ও দেশ পরিত্যাগের সকরুণ বিধুরতার সুরও শোনা যায় নাই; আবার সাম্রাজ্যগর্ব বা শক্তির দম্ভও লক্ষ্য করা যায় না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, পরাধীন দেশের কবির পক্ষে স্বাধীন দেশের কবির ন্যায় দেশপ্রেম অনুভব করা সম্ভব নয়; সেইজন্যই এই ধরণের কবিতা লেখা হয় নাই।

আধুনিক যুগেই বাঙালি কবি স্বদেশপ্রেমের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ইহার পূর্বে স্বদেশকে পৃথক ভাবে বন্দনা করা হয় নাই। বস্তুতঃ জন্মভূমিতে যে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার প্রয়োজন আছে, তাহা প্রাচীন যুগের বা মধ্যযুগের বাঙালি কবিতা অনুভব করেন নাই। এই স্বদেশপ্রীতি বিশেষভাবে আধুনিক যুগেই আবির্ভূত হইয়াছে। ইংরাজ শক্তির সহিত সংঘর্ষ ও পরাজয় এবং রাজনৈতিক ও দৈনন্দিন জীবনে হীনতাবোধই মাতৃভূমির সম্ভ্রম-গৌরব সম্পর্কে আমাদের সচেতন করিয়া তুলিয়াছে এবং কাব্যে পৃথক স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে।

বাংলা দেশপ্রেমমূলক কবিতায় সর্বত্রই স্বদেশকে জননী বলিয়া বন্দনা করা হইয়াছে। কবিরা মাতৃরূপে জন্মভূমির ধ্যান করিয়াছেন এবং কবিতায় এই জননীরই স্তুতি গাহিয়াছেন।

মা বলিতে কবিরা কেবল জন্মভূমিকেই গ্রহণ করেন নাই; মাতৃভাষাকেও মা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পুনশ্চ, নিজ জননীর বন্দনা শেষ পর্যন্ত দেশজননীর বন্দনায় পরিণত হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত মাতৃস্তব ও দেশমাতৃকার স্তব সমার্থক হইয়া গিয়াছে। এখানেই শেষ নহে। বাণী-বন্দনাও শেষ পর্যন্ত মাতৃবন্দনা হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং গর্ভধারিণী মাতা, মাতৃভাষা, দেবী সরস্বতী এবং

জন্মভূমি—সকলেই কল্পনাসর্বস্ব ভাববিভোর বাঙালি কবির চোখে এক রূপে দেখা দিয়াছেন। তাই এই সব কবিতার একত্র আলোচনাই সমীচীন। পুনশ্চ, কবিরা দেশমাতার বন্দনা করিতে গিয়া কেবল বঙ্গমাতার বন্দনা করেন নাই, ভারতমাতারও বন্দনা করিয়াছেন। একথা বলিলে অতিরঞ্জন হইবে না যে, বাঙালির মাতৃবন্দনা প্রাদেশিকতাদোষমুক্ত; ভারতমাতা-রূপেই দেশজননীর বন্দনা অধিক সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে।

স্বদেশপ্রেমের প্রকৃত তাৎপর্য যাহাই হউক, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার প্রকৃত বিরোধ ইংরাজের রাষ্ট্রশক্তির সহিত নহে, ইংরাজের সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিত। ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে কবির মাতৃভাষা ও স্বদেশী সমাজের প্রতি গভীর অনুরাগ।

রেনেসাঁসের প্রথম কূলপ্লাবী ঘরভাঙানো বন্যায় নূতনত্বের অন্ধ আকর্ষণে বাঙালির সমাজজীবনে যখন ভারসাম্য বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা অনুকরণের নেশায় যখন বাঙালি অস্থির প্রলাপ বকিতেছিল, তখন ব্যঙ্গকবিতার কশাঘাতে তিনি সেই মোহগ্রস্ত উন্মত্ত সমাজ-জীবনকে প্রকৃতিস্থ করিবার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন সংস্কার ও আচার ব্যবহার তাঁহার মনে একটি ধ্রুব আদর্শ গড়িয়া রাখিয়াছিল। সেই সনাতনী আদর্শের মানদণ্ডে বিচার করিয়া যেখানেই আদর্শচ্যুতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, সেইখানেই তিনি কশাঘাত করিয়াছেন। এই সংরক্ষণশীলতা সর্বত্রই সীমা রক্ষা করে নাই; মাঝে মাঝে উৎকট বাঙালিয়ানার জোরে কটূক্তি করিতেও ঈশ্বরচন্দ্র পশ্চাৎপদ হন নাই। "বিধবা-বিবাহ-আইন", "ছদ্ম-মিশনারী", "স্নানযাত্রা", "বড়দিন" প্রভৃতি কবিতায় এই তীব্র ব্যঙ্গ, সংরক্ষণী মনোভাব, বাঙালিয়ানা ও অনুকরণপ্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইংরাজ আচার-ব্যবহার ও নূতন ভাবধারার প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের বিরাগের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু ইংরাজ রাজশক্তির নিকট কবির আনুগত্য সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। শুধু আনুগত্য নহে, ইংরাজ সামরিক শক্তির জয়গান গাহিয়া এবং উনবিংশ শতাব্দীর শিখযুদ্ধ, আফঘান যুদ্ধ, সিপাহীবিদ্রোহ প্রভৃতি সমরে ইংরেজের প্রতিপক্ষের প্রতি অজস্র নিন্দা ও কটূক্তি বর্ষণ করিয়া তিনি প্রতিক্রিয়াশীল মনের পরিচয় দিয়াছেন। যুদ্ধবিষয়ক কবিতাগুলিতে ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন ও ইংরেজের জয়ে উৎফুল্ল হইয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে অন্তর্বিদ্রোহ দমন করিতে ইংরাজ-শক্তিকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। কোনো প্রকৃত দেশপ্রেমিক কবি যদি এই যুদ্ধগুলিকে তাঁহার কবিতার বিষয়রূপে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কবিতাগুলিতে সুরের পার্থক্য দেখা যাইত। ঈশ্বরচন্দ্র যদি সত্যই দেশ-প্রেমিক হইতেন, তাহা হইলে তিনি বিদ্রোহীদের পরাজয়ে উৎফুল্ল হইতেন

না এবং স্বাধীনতারক্ষার জন্ম প্রাণোৎসর্গকারী দেশব্রতীদের জয়গাথা রচনায় আত্মনিয়োগ করিতেন। ইংরাজ শক্তির জয়ে উল্লাস প্রকাশ করিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন :

রণভূমি ছেড়ে যায় যত চাপ দেড়ে।
গুলী গোলা অস্ত্র তোপ সব লয় কেড়ে ॥
মাথার পাগড়ী উড়ে পড়ে নদী কূলে।
বুদ্ধিলোপ দাড়ি-গোঁপ সব যায় ঝুলে ॥
চড়াচড় মারে চড় সিকায়ের দলে।
ধরফড় ক'রে ধড় পড়ে ধরাতলে ॥

('শিখযুদ্ধে ইংরাজের জয়')

'দিল্লীর যুদ্ধ' কবিতায় কবি লিখিয়াছেন :

পড়ুক বিপক্ষদল মনের অনলে
উড়ুক ব্রিটিশধ্বজা সমুদয় স্থলে ॥
ঝুড়ুক দুষ্টের মাথা যারে যথা পাবে।
ফুড়ুক ফুড়ুক করি গুড়ুক কে খাবে ?
ধুড়ুক ধুড়ুক ক'সে তোপ দিল দেগে।
ভুড়ুক ভুড়ুক সব ভয়ে গেল ভেগে ॥
সিংহনাদ শুনে গেল একে একে সরে।
ঘেউ ঘেউ ফেউ ফেউ কেঁউ কেঁউ করে ॥

এই কবিতার সূচনায় কবি আহ্বান জানাইতেছেন :

ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়।
মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিশের জয় ॥

সিপাহী-বিদ্রোহের নায়ক নানা সাহেব, তান্তিয়া টোপী, ঝান্সীর রাণী, বাজীরাও প্রমুখের বিরুদ্ধতা করিয়াই কবি ঈশ্বর গুপ্ত ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের নিন্দাও করিয়াছেন। 'কানপুরের যুদ্ধে জয়' কবিতায় ইংরাজ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা ও সিপাহীবিদ্রোহের নায়কদের গালি দিবার অদ্ভুত ক্ষমতা কবি দেখাইয়াছেন :

হাদে শুনি বাণী, ঝাঁসীর রাণী,
ঠোঁটকাটা কাকী।
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে নাকি ?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি,
নানা তার ঘরের ঢেঁকি, মাগী খেঁকী,
গোয়ালের দলে।
এত দিনে ধনে জনে, যাবে রসাতলে ॥
হয়ে শেষ নানার নানী,

হয়ে শেষ নানার নানী, মরে রানী,
দেখে বুক ফাটে
কোম্পানীর মুলুকে কি বর্গীগিরি খাটে ?

ঈশ্বর গুপ্তের প্রকৃত বিরোধ রাষ্ট্রকর্তা ইংরাজদের সহিত নহে, ইংরাজ-অনুকারী বিভ্রান্ত বাঙালির সহিত। পরাধীনতার গ্লানি তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই ; তাঁহার কবিতায় ইহা প্রকাশ পায় নাই। বস্তুতঃ দেশপ্রেমের—যাহা বিদেশী শক্তির সততই বিরোধী ও অধীনতাপাশ-মুক্ত হইতে সচেষ্ট—তাহার কোন পরিচয়ই ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে নাই।

স্বাধীনতার সচেতনতা ঈশ্বর গুপ্তের ছিল, কিন্তু তাহার ক্ষুধা ছিল না। তখন কাহারও ছিল না। রামমোহন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত কেহই ইংরেজ রাজত্বের বিরোধী ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রও ইংরেজ রাজত্বের সমর্থক ছিলেন দেশপ্রেমবশতঃই।

ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বে বাংলা কাব্যে দেশপ্রেমের এই ধরণের উক্তি লক্ষ্য করা যায় না :

স্বদেশের প্রেম যত সে-ই মাত্র অবগত
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাবতুলি ধ্যানে ধরে চিত্তপটে চিত্র করে
স্বদেশের সকল ব্যাপার ॥

এখানে একটি দেশানুরাগী চিত্তের পরিচয় পাই। প্রাচীন ভারতের স্বাধীনতা স্মরণে ঈশ্বর গুপ্তই লেখেন :

ইউরোপ আদি করি ব্রহ্ম আর চীন।
মাংস-বলে বাহু-বলে সবাই স্বাধীন ॥
ভারতে যখন ছিল ব্যবহার কীর।
বোদ্ধা ছিল যোদ্ধা ছিল সবে ছিল বীর ॥
ধন মান যশ ভাগ্য স্বাধীনতা-সুখ
সমুদয় ছিল, নাহি ছিল কোনো দুখ ॥

ঈশ্বর গুপ্তের অনুরাগ স্বাধীনতার জন্য নহে, স্বদেশীসমাজ ও মাতৃভাষার জন্য প্রকাশ পাইয়াছে।

মাতৃভাষার প্রতি প্রীতি দুইটি কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা 'মাতৃভাষা' ও 'ভাষা' নামক কবিতাদ্বয়ে। বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া 'স্বদেশের কুকুর'কে আদর করিবার জন্য তিনি বাঙালিকে আহ্বান জানাইয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বর গুপ্তের জাতীয়তাবোধ সমাজগত, রাষ্ট্রগত নহে। দেশীয় আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতির প্রতি কবির প্রবল অনুরাগ ছিল। সেক্ষেত্রে ঈশ্বরগুপ্ত দেশপ্রেমিক কবি।

বস্তুতঃ দেশপ্রেমের সার্থক উদ্বোধন হইল রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' কাব্যে (১৮৫৮)। বাংলা সাহিত্যে বীরযুগের সিংহদ্বার তিনিই প্রথম উন্মোচন করিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যকে পৃথিবীর রাজপথে উপস্থিত করিলেন। রোমান্স-রসের মধ্য দিয়া রঙ্গলাল জগতের ও দেশপ্রেমের সহিত বাঙালি পাঠকের পরিচয় করাইয়া দিলেন। রাজস্থানের শৌর্যবীর্যমণ্ডিত অতীত ইতিহাস-কাহিনীর প্রতি তিনি কূপমণ্ডূক বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। বঙ্গ-সরস্বতীর বীণায় তিনি নূতন তার সংযোজন করিলেন। এখানেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। রঙ্গলালের তুলনাস্থল হইতেছেন রোমান্টিক আখ্যায়িকার স্রষ্টা স্কট।

ইংরাজী কাব্যে স্কটের গৌরবগাথা যে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে রঙ্গলালের রোমান্স-গাথাও বাংলা কাব্যে সেই গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। স্কট মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে স্কটল্যাণ্ডের গোষ্ঠীজীবনের যুদ্ধবিগ্রহপূর্ণ উত্তেজনা-রোমাঞ্চিত জীবনের ছবি আঁকিয়াছেন। সে যুগে মানুষের জীবন-বীণা সর্বদাই উঁচু স্বরে বাঁধা থাকিত। এদেশে রঙ্গলালই ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রোমান্স-রসের উদ্বোধন করিয়া তিনি রাজ-পুত জাতির শৌর্যগাথা বর্ণনা করিলেন আমাদের, দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বোধিত করিলেন।

'পদ্মিনী-উপাখ্যান' কাব্যের ভূমিকায় কবি তাঁহার কাব্যরচনার কারণ সম্পর্কে যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহাতে ধারণা হয়, সৃষ্টির তাগিদ নহে, প্রকাশের ব্যাকুলতা নহে, দৈবপ্রেরণা নহে, রঙ্গলালের কাব্যরচনার প্রেরণা স্বতন্ত্র। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে জাগরণের যে সাড়া পড়িয়াছিল, সেই নবজাগ্রত দেশাত্মবোধই রঙ্গলালের কাব্যরচনার প্রধান প্রেরণাস্বরূপ কাজ করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রঙ্গলালের বিশুদ্ধ কাব্যপ্রেরণা ছিল না। জাতীয় জাগরণের অন্যতম উপায় হিসাবে কাব্যের উন্নতিসাধনে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন। ফলে 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' উঁচু দরের কাব্য হয় নাই—মাঝে মাঝে ইহা উচ্ছ্বাসবহুল বক্তৃতার সমষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, রঙ্গলালের কবিতায় একদিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতির মর্মান্তিক গ্লানি, আর একদিকে স্বাধীনতার মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে। তাই 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' চারণগীতি যতই উচ্ছ্বাসবহুল হউক, ইহার কাব্যমূল্য যতই অকিঞ্চিৎকর হউক, ইহার মধ্যে বাঙালির দেশপ্রেম প্রথম সার্থক প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ইংরাজ কবি Moore-এর "From Life without freedom, Oh! who would not fly" কবিতাটির প্রভাব এই চারণগীতির উপর পড়িয়াছে। 'কর্মদেবী' (১৮৬২) কাব্যেও অতীতগৌরবগাথা ও ব্যাকুলতা ধ্বনিত হইয়াছে। এই কাব্যের প্রথম সর্গেই কবি বিলাপ করিয়া বলিতেছেন :

হায় কবে দুঃখ যাবে, এ দশা বিলয় পাবে,
ফুটিবেক সুদিন-প্রসূন।
কবে পুনঃ বীর-রসে, জগত ভরিবে যশে,
ভারত ভাস্বর হবে পুনঃ ?

বাংলা সাহিত্যের একমাত্র ক্লাসিক মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্যে' (১৮৬১) এই দেশপ্রেমের সুর নিঃশংসয়িতরূপে ধরা পড়িয়াছে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক মহাকাব্যের অনুসরণে রচিত হইয়াছে। এই জাতীয় মহাকাব্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হইতেছে National spirit বা জাতীয় সুর এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' এই বিশিষ্ট লক্ষণে বিশেষিত। প্রাচ্য মহাকাব্যে এই আদর্শের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই 'জাতীয় সুর' পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে—দেশ ও জাতি একটা অখণ্ড ভাবাদর্শরূপে মহাকাব্যের চরিত্রগুলির চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। 'মেঘনাদবধে' এই 'জাতীয় সুর' নিভুর্ল পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। রাবণ ও মেঘনাদ শত্রুর বিরুদ্ধে জন্মভূমি রক্ষার মহৎ প্রতিজ্ঞায় প্রাণ উৎসর্গ করিতে চাহিয়াছে, আর ধর্মভীরু দেশত্যাগী বিভীষণের চরিত্রটি দেশ-দ্রোহীর কলঙ্কে মলিন হইয়াছে। রাবণ যে পাপই করুক না কেন, সে যে জন্মভূমিকে রক্ষার জন্য দাঁড়াইয়াছে, ও রামচন্দ্রের দূত দেশত্যাগী বিভীষণকে যে তিরস্কার করিয়াছে, তাহা সে যুগের স্বদেশমন্ত্রে উজ্জীবিত বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করিয়াছে। জাতীয়তাবোধের এই সুর সমগ্র কাব্যটিতে অনুরণিত হইয়াছে।

এখানেই মধুসূদনের দেশপ্রেম ক্ষান্ত হয় নাই। 'বঙ্গভূমির প্রতি' ও চতুর্দশপদী কবিতাবলীর অন্তর্গত 'ভারতভূমি', 'বঙ্গভাষা' : এই তিনটি ক্ষুদ্র কবিতায় মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগের পরিচয় বর্তমান। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের (১৮৫৯) প্রস্তাবনায় মধুসূদন বলিয়াছেন :

শুন গো ভারত ভূমি,
কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুমঘোর।
হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়॥

এই নবজাগরণের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়াই স্বদেশপ্রেমী মধুসূদনের চিত্তটি পাঠকের নিকট উদ্ভাসিত হইয়াছে।

এইভাবে রঙ্গলাল এবং মধুসূদনের হাতে দেশপ্রেমের কবিতার শুভ সূচনা হইল। ইহার পর সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রজীবনে দেশ যত অগ্রসর হইয়াছে, দেশপ্রেমের কবিতাও তত বিকাশ লাভ করিয়াছে।

শিক্ষার উত্তরোত্তর বিস্তার, ইতিহাসের জ্ঞান, সমাজ আন্দোলন, সাময়িক পত্রের সুপ্রসার, দেশে নীলবিদ্রোহ ও উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষ, ইংরেজ শাসকের পীড়ন ও শাসনতন্ত্র হইতে ভারতীয়দের দূরে রাখার প্রয়াস, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ ইত্যাদির মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে এক জাতীয়তা-বোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধের অভ্যুদয় ও ক্রমপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে বাঙালি সেদিন অবশিষ্ট ভারতকে পথ দেখাইয়াছিল।

বাঙালির দেশানুরাগ সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবাহিত করিয়া দিবার কৃতিত্ব অনেকটাই 'হিন্দুমেলা' দাবি করিতে পারে। এই 'মেলা' রাজনারায়ণ বসুর প্রস্তাবিত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছাসঞ্চারিণী সভা'র আদর্শে গঠিত হইয়াছিল (দ্রঃ রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পৃ ১০৮)। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। দেশীয় শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন, দেশীয় ব্যায়ামাদির পুনঃপ্রচলন, দেশীয় ভাবের পুনরুদ্বোধন—এই সবই ছিল হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন: "ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।" এই হিন্দুমেলাকে উপলক্ষ্য করিয়া সাহিত্যে একটি নূতন ধারার সূত্রপাত হয়, তাহার বিষয়বস্তু স্বদেশ। হিন্দুমেলার বিভিন্ন অধিবেশনে দেশের স্তবগান গীত ও দেশানুরাগের কবিতা পঠিত হয়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হিন্দুমেলার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'গাও ভারতের জয়' গীত হইয়াছিল ('জীবনস্মৃতি' দ্রষ্টব্য)।

রঙ্গলাল-মধুসূদনের কাব্যে দেশপ্রেমের যে বিকাশ দেখা গিয়াছে, তাহা মহাকাব্যের আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। স্বতন্ত্র মর্যাদায় দেশপ্রেমের গান রচিত হইয়াছে হিন্দুমেলার যুগে। হিন্দুমেলার পূর্বে দেশপ্রীতি ছিল কাব্যানুভূতির উপাদান। হিন্দুমেলায় তাহা দেখা দিল স্বতন্ত্র উপলব্ধিরূপে এবং তাহার প্রকাশ হইল দেশসেবার কর্মপ্রেরণায়। গীতিকবিতার উপজীব্য হিসাবে দেশপ্রেমের ব্যবহার দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দচন্দ্র দাস, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, অক্ষয় বড়াল, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, হেমচন্দ্র, কামিনী রায় এবং আরো পরে দ্বিজেন্দ্রলাল, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, বিজয়চন্দ্র, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদের রচনায়। গীতিকবিতার মানদণ্ডে বিচার করিলে সকল কবিতাকে সার্থক বলা যায় না। কারণ সর্বত্র ভাবের সমুন্নতি ও গীতিরসের বিশুদ্ধিকরণ ঘটে নাই।

দেশপ্রেমের কবিতার শ্রেণিবিভাগ

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও পরবর্তী শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত দেশপ্রেমের কবিতার কয়েকটি শ্রেণিবিভাগ করা সম্ভবপর।

(১) কবিরা বঙ্গভূমিকে মাতৃরূপে বন্দনা করিয়াছেন। মধুসূদনের 'বঙ্গভূমির প্রতি', সুরমাসুন্দরী ঘোষের 'বঙ্গজননী,' অক্ষয় বড়ালের 'বঙ্গভূমি,' প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'বঙ্গভূমি', 'বাঙ্গালীর মা', নিত্যকৃষ্ণ বসুর 'বঙ্গলক্ষ্মী' ও দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' কবিতায় এই মাতৃধ্যানের সার্থক প্রকাশ ঘটিয়াছে।

(২) সেদিনের বাঙালি কবিরা দেশমাতাকে কেবল বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, অখণ্ড ভারতবর্ষের অধিষ্ঠাত্রীদেবী ভারতমাতা রূপেও কল্পনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ সেদিনের দেশাত্মবোধ সর্বপ্রকার প্রাদেশিকতা ও সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত ছিল। নিম্নলিখিত কবিতাগুচ্ছে তাহার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়ঃ মধুসূদনের 'ভারতভূমি', হেমচন্দ্রের 'রাখিবন্ধন', দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারত আমার', বঙ্কিমচন্দ্রের অমর সংগীত 'বন্দেমাতরম্', অতুলপ্রসাদের 'ভারতলক্ষ্মী', সত্যেন্দ্রনাথের 'গাও ভারতের জয়,' সরলা দেবীচৌধুরাণীর 'নমো হিন্দুস্থান', 'ভারতজননী,' হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'ভারতরাণী', বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'উদ্বোধন' প্রভৃতি কবিতায় এই অখণ্ড দেশাত্মবোধ রূপ পাইয়াছে।

(৩) আর এক শ্রেণীর কবিতা বিলাপপ্রধান। বোধকরি পরাধীন মোহাবদ্ধ নিশ্চেষ্ট হতমান ভারতবাসীকে পুনঃ জাগ্রত করার জন্যই অতীত গৌরবের বর্ণোজ্জ্বল চিত্র অংকন করা হইয়াছে ও বর্তমান দুরবস্থার পটভূমিতে বিলাপ করা হইয়াছে।

হেমচন্দ্রের 'ভারতবিলাপ', 'ভারতসংগীত', কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'সেই ত রয়েছে মা তুমি, রাজকৃষ্ণ রায়ের 'শূন্যকৌটা,' আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'ভারতশ্মশান মাঝে,' গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'ভারতবিলাপ,' 'যমুনালহরী', রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা', গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'মৃত্যুশয্যায়', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'করো না অপমান' প্রভৃতি কবিতায় ভারতের অতীত গৌরবের জন্য বিলাপ করা হইয়াছে।

(৪) অপর এক শ্রেণীর কবিতা উৎসাহ ও প্রেরণাদায়ক। দেশের সেবায় জীবন বলিদানের উচ্চাদর্শ এই কবিতাগুলিতে রূপ পাইয়াছে। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'যায় যেন জীবন চলে', 'স্বদেশের ধূলি', রজনীকান্ত সেনের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়', মৃণালিনী সেনের 'নূতন রাগিণী,' গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'ঋণশোধ', 'আদেশবাণী', দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভারতললনা', বিজয় মজুমদারের 'আহ্বান', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'শতকণ্ঠে কর গান,'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'ওঠ, জাগ', 'চল্‌রে চল সবে', অতুলপ্রসাদের 'বল-বল বল বল সবে', 'হও ধরমেতে ধীর' প্রভৃতি কবিতায় কর্তব্যসাধন ও আত্মোৎসর্গের বলিষ্ঠ আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে।

(৫) আর এক শ্রেণীর কবিতায় মাতৃভূমির চিন্ময়ী রূপের ধ্যান করা হইয়াছে। জন্মভূমির বিশুদ্ধ ভাবরূপটি এই শ্রেণীর কবিতায় ধরা পড়িয়াছে।

রজনীকান্ত সেনের 'ব্যাকুলতা', গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'জন্মভূমি', যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'দেশভক্তি', হেমচন্দ্রের 'জন্মভূমি', মনোমোহন বসুর 'জন্মভূমি', প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'উপহার', 'উদ্বোধন', দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব', 'কাঁদিবে কি স্নেহময়ি,' 'কেন মা তোমারি', সরলা দেবী চৌধুরাণীর 'জয় যুগ আলোকময়', গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'মাতৃস্তোত্র', কামিনী রায়ের 'মাতৃপূজা', কামিনীকুমার ভট্টাচার্যের 'জননী' প্রভৃতি কবিতায় বিশুদ্ধ ভাবময় মাতৃধ্যান প্রকাশ পাইয়াছে। এই সকল কবিতায় দেশমাতার জন্য কবি-হৃদয়ের ব্যাকুলতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহার সুন্দর পরিচয় গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'জন্মভূমি' কবিতা :

> যদিও ব্যাকুল প্রাণ ব্যাধি-যন্ত্রণায়,
> তোমার ভবিষ্য-বেশ
> করে চিত্তে মোহাবেশ,
> মিশিব তোমারি বুকে তব মৃত্তিকায়,
> ভয় কি, যাই মা তবে—বিদায়, বিদায় !

(৬) মাতৃভাষার বন্দনা গাহিয়াছেন কয়েকজন কবি। মাতৃভাষার সেবাই দেশমাতার সেবা : এই ভাবটি এই শ্রেণীর কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের 'ভাষা', 'মাতৃভাষা', মধুসূদনের 'বঙ্গভাষা', দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গভাষা', প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'বঙ্গভাষা', 'গীতিকা' নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সরস্বতীপূজা', মানকুমারী বসুর 'বাণীবন্দনা,' অতুলপ্রসাদের 'বাংলা ভাষা' এই শ্রেণীর কবিতা। এই শ্রেণীর মাতৃভাষাপ্রেম তথা দেশপ্রেমের প্রথম পরিচয় পাই রামনিধি গুপ্তের গানে—

> নানান্ দেশের নানান্ ভাষা,
> বিনা স্বদেশীয় ভাষা
> পূরে কি আশা
> কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর ?
> ধারাজল বিনে কভু
> ঘুচে কি তৃষা ?

দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গভাষা' কবিতায় এই শ্রেণীর মনোভাব সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে :

জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে
চাহিনা অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি
অমল কমল-চরণে স্থান !

(৭) আর এক শ্রেণীর কবিতায় স্বাধীনতা পুনরর্জনের আহ্বান যতটা না শোনা গিয়াছে, তদপেক্ষা বেশি শোনা গিয়াছে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পরাধীনতা ও দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদে অপমান ও গ্লানির জন্য হাহাকার। মনোমোহন বসুর 'দিনের দিন্ সবে দীন', গোবিন্দ দাসের 'স্বদেশ', ভূষণ দাসের 'মাতৃপূজা', মনোমোহন রায়ের 'উন্নতি', কামিনীকুমার ভট্টাচার্যের 'শাসন-সংযত কণ্ঠ', 'সোনার স্বপনমোহে' কবিতা এই শ্রেণীর উদাহরণ। নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে এই বেদনাবোধ স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'স্বদেশ' :

যে ক্ষেতে শস্য ভরা তোমার ত নয় একটি ছড়া
তোমার হলে তাদের দেশে চালান কেন হয় ?
তুমি পাও না একটি মুষ্টি, মরেছে তোমার সপ্ত গোষ্ঠী,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎভরা জয়।
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়,
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে ? এদেশ তোমার নয়।

কামিনীকুমার ভট্টাচার্যের 'সোনার স্বপন মোহ' :

ওরা মোদের দৈন্যে করি' পরিহাস, কেড়ে নিতে চায় মুখের গ্রাস ;
তবু যুক্ত করে ওদের দুয়ারে কেন নিত্য নিষ্ফল যাচনা ?

মনোমোহন বসুর 'দিনের দিন্ সবে দীন' :

তাঁতি কর্মকার করে হাহাকার, সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর, হ'লো দেশের কি দুর্দিন !...
ছুঁই সুতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে ; দীয়াশালাই কাটি, তাও আসে পোতে ;
প্রদীপটি জ্বালিতে যেতে, শুতে, যেতে কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন !

এই সকল কবিতায় অর্থনৈতিক পরাধীনতার চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ শোষিত ভারতের দুরবস্থার চিত্রটি কবিরা সহানুভূতির সহিত চিত্রিত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমের কবিতা বহু লিখিয়াছেন। তাঁহার দেশপ্রেমের কবিতায় দেশমাতৃকার চিন্ময়ী রূপটি আরো প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। 'জনগণমনঅধিনায়ক' কবিতায় ভারতভাগ্যবিধাতার বন্দনা করা হইয়াছে ; দুঃখ, বেদনা, হতাশা হইতে মুক্তির বলিষ্ঠতর আহ্বান তাঁহার কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছেন, 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, তা বলে ভাবনা করা

চলবে না', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।'

গভীর প্রীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে'। সকলকে ডাক দিয়া কবি বলিয়াছেন—

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
কত দিনের সাধন ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে,
(আজি) ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয়রে মাকে।

কবি বিনয়ের সঙ্গে আশা করিয়াছেন,

যদিও জননি, যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা একটি সন্তান
জাগি উঠে শুনি এ বীণা-তান!

কবির এ আশা সফল হইয়াছিল। কবির বজ্র আহ্বান প্রতি হৃদয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল—

দিন আগত ঐ,—
ভারত তবু কই?
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশো কঠিন-ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদ-ভার হানো অশনি পাতে।
ছায়া-ভয়-চকিত মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,—
জাগ্রত ভগবান হে ॥

কবির এই আবেদন ব্যর্থ হয় নাই—স্বদেশী যুগে রাখিবন্ধনের মধ্য দিয়া সেদিন সমগ্র বাংলা দেশ জাগ্রত হইয়াছিল।

তৎকালীন দেশপ্রেমের কবিদের মনোভাব ছিল আত্ম-উদ্বোধনের ও আত্মবিশ্বাসের। ইহারই প্রেরণায় সেদিন অসংখ্য স্বদেশী গান ও কবিতা রচিত হইয়াছিল। তৎকালীন মনোভাবের সার্থক প্রকাশ ঘটিয়াছে রবীন্দ্রনাথের এই কথায়:

"মনে রাখিতে হইবে আজ স্বদেশের স্বদেশীয়তা আমাদের কাছে যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, ইহা রাজার কোনো প্রসাদ বা অপ্রসাদে নির্ভর করে না; কোন আইন পাশ হউক বা না হউক, বিলাতের লোক আমাদের করুণোক্তিতে কর্ণপাত করুক বা না করুক, আমার স্বদেশ আমার চিরন্তন স্বদেশ, আমার পিতৃপিতামহের স্বদেশ, আমার সন্তান সন্ততির স্বদেশ, আমার প্রাণদাতা, শক্তিদাতা, সম্পদ্‌দাতা স্বদেশ। কোনো মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিও না, কাহারও মুখের কথায় ইহাকে বিকাইতে পারিব না, একবার যে হস্তে ইহার

স্পর্শ উপলব্ধি করিয়াছি, সে হস্তকে ভিক্ষাপাত্র বহনে আর নিযুক্ত করিব না, সে হস্ত মাতৃসেবার জন্য সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিলাম! আজ আমরা প্রস্তুত হইয়াছি—যে পথ কঠিন, যে পথ কণ্টকসংকুল সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আজ যাত্রারম্ভে এখনও মেঘের গর্জন শোনা যায় নাই বলিয়া, সমস্তটাকে যেন খেলো বলিয়া মনে না করি। যদি বিদ্যুৎ চকিত হইতে থাকে, বজ্রধ্বনিত হইয়া উঠে, তবে তোমরা ফিরিয়ো না, ফিরিয়ো না; দুর্যোগের রক্তচক্ষুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জগৎ সমক্ষে অপমানিত করিও না।" এই অভীঃমন্ত্রে সেদিন বাংলা দেশ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল; দেশপ্রেমের কবিতা ও গান তাহারই পুজোপচার।

পঞ্চম অধ্যায়

গার্হস্থ্যজীবনের কবিতা

গার্হস্থ্যজীবনের কবিতার পটভূমি

বিহারীলাল-সুরেন্দ্রনাথে বাংলা গীতিকবিতার যে বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাহা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথে আসিয়া পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এই গীতিকবিতা বিচিত্র নূতন বিষয় অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল। ইংরেজী কাব্যের প্রসাদে সেদিনের কাব্যরসিক বাঙালি নূতন ও বিচিত্র রস আস্বাদ করিয়াছিল। দেশপ্রেম, ধর্মব্যাকুলতা, তত্ত্বমূলক বিষয়, যুক্তিমূলক আলোচনা, প্রকৃতি বর্ণন, প্রেম—প্রভৃতি নানা বিচিত্র ক্ষেত্রে বাঙালি কবিমন উৎসারিত হইয়াছিল। প্রেম ও প্রকৃতি-বর্ণনের ক্ষেত্রে সকল সম্ভাবিত চরিতার্থতায় বাংলা গীতিকবিতা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম, তত্ত্ব, যুক্তিমূলক কবিতাও মাঝে মাঝে গীতিকাব্যরসে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া মাতৃপ্রেম ও দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে অবলম্বন করিয়া গীতিকবিতার প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলি নিঃসন্দেহে নূতন। এগুলি ছাড়াও আর একটি দিকে বাংলা গীতিকবিতা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা হইতেছে গার্হস্থ্যচিত্রমূলক গীতিকবিতা। ঠিক এই জাতের গীতিকবিতা ঊনবিংশ শতাব্দীর পরে আর বিশেষ লেখা হয় নাই। বিগত শতাব্দীর শেষ চার দশকেই এই গার্হস্থ্যচিত্রমূলক গীতিকবিতা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বৎসরে যে রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের আবির্ভাব ঘটে, তাঁহাদের হাতে এই শ্রেণীর কবিতা শেষ স্বীকৃতি লাভ করে। যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন, পরিমলকুমার ও কিরণধনের কবিতায় গার্হস্থ্যজীবনের ছবি দেখা যায়। সাম্প্রতিককালে যাতায়াতের অভাবে কাব্যসংসারের এই পথের রেখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজী কাব্যপাঠায়ত্ত বাঙালি কাব্যরসিক জীবনের সবক্ষেত্রেই বিপুলত্বের ও বৈচিত্র্যের প্রকাশ দেখিয়াছিল, তখন জীবনের অতি তুচ্ছ বিষয়ও অপরূপ মহিমামণ্ডিত হইয়াছিল। তাই সেদিনের গার্হস্থ্যচিত্রের সৌন্দর্য সেই নব-উন্মোচিত বিস্ময় ও আনন্দের চোখে ধরা পড়িয়াছিল। সেদিন বাঙালি গার্হস্থ্যজীবন সুখ শান্তি ও আনন্দের নীড় হিসাবে রূপায়িত হইয়াছিল। সেই সুখস্বপ্নের পিছনে ছিল সামাজিক সংস্থিতি ও মানসিক আনন্দবোধ। এই সংস্থিতি, আনন্দবোধ প্রথম আবিষ্কারের কৌতূহল ও বিস্ময় পরবর্তী যুগে আর দেখা যায় নাই, ফলে এই ধরণের গীতি-কবিতা পরে আর কখনও লেখা হয় নাই।

গার্হস্থ্যচিত্রমূলক গীতিকবিতা রচনায় কেবল যে মহিলা কবিরাই আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, তাহা নহে ; সে দিনের খ্যাতনামা কবিরাও অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, রমণীমোহন ঘোষ, নিত্যকৃষ্ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি কবিরা এই শ্রেণীর কবিতায় বাঙালির শান্তিনীড়ের এক একটি মনোরম আলেখ্য অংকন করিয়াছেন। সেখানে বাৎসল্য রসের সহিত মানবতাবোধের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সহানুভূতি কেবল নিজ পুত্রকন্যাগ্রীর প্রতি আপতিত নহে ; ভিখারিনী মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইতেও আগ্রহের অভাব নাই। গৃহহারাকে আশ্রয়-দানে ও অন্নদানে গার্হস্থ্যধর্মের সার্থকতা, এ সত্য সেদিনের কবিরা বিস্মৃত হন নাই। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই সকল কবিতা কি বৈষ্ণব গীতি-কবিতার বাৎসল্য রসের অনুযায়ী নহে ? এসকল কবিতা যে একান্তভাবে আধুনিক যুগেরই, তাহার প্রমাণ কি ? এসকল কবিতা পাঠ করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এখানে কোন অলৌকিকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় নাই, নিতান্তই গ্রাম্যজীবন, ঘরের কথা ও সন্তানাদির প্রতি স্নেহ বর্ণিত হইয়াছে। কেবল বাৎসল্য রসেই ইহা সীমাবদ্ধ নহে। গার্হস্থ্যজীবনের প্রতিমা যে বধূ তাহার প্রতি কবিদের শ্রদ্ধা ও স্নেহ এখানে লক্ষ্য করা গিয়াছে। বাঙালি জীবনে সেদিন নিজ গৃহই ছিল মূল আকর্ষণ, এই সত্যই এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে প্রতিভাত হইয়াছে। আলোচ্যমান কবিতাগুলির রচনাশিল্পে এমন একটী সৌকুমার্য ও শালীনতা আছে যাহা ইহার অন্তর্নিহিত শান্ত রসকেই প্রকাশ করে।

গার্হস্থ্য কবিতার শ্রেণিবিভাগ

গার্হস্থ্যচিত্রমূলক যে গীতিকবিতা আমরা ঊনবিংশ শতাব্দে পাই, মোটা-মুটি চার শ্রেণীতে সেগুলিকে ভাগ করা চলে। (১) বাঙালির শান্তির নীড় সংসারের চিত্র ; (২) মায়ের প্রতি সন্তানের ভালবাসা ; (৩) সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসা—ঘরে ও বাহিরে ; (৪) শিশুহৃষ্ট জগতের ও শিশুর আকাঙ্ক্ষার চিত্র।

প্রথমেই পাই বাঙালির শান্তির নীড় সংসারের চিত্র। একদা যে সংসার বাঙালির জীবনের মূল আকর্ষণ রূপে বর্তমান ছিল, তাহা আজ আর ফিরিয়া আসিবে না। কয়েকটি কবিতায় এই লুপ্ত আকর্ষণের দরদী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'নলিনী' পত্রিকায় 'সন্ধ্যার প্রদীপ' নামে একটি কবিতা প্রকাশ করেন। ইহাই প্রাচীনতম গার্হস্থ্যকবিতা।

সন্ধ্যার প্রদীপালোকে যে কয়টি দৃশ্য কবির নিপুণ লেখনীতে উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মহার্ঘ চিত্র হইয়াছে জননী ও শিশুর চিত্রটি—

বদনের কাছে বাতি জননী ঢুলায়,
খল খল হাসে শিশু তায়
আভায় আভায় মিশে শোভায় শোভায়,
হেরে মাতা স্নেহের মেশায় ;
আগারে বালক মেলা,
ছায়া ধরাধরি খেলা,
হেরে প্রবীণেরা হাসে, গণে না আপন,
ছায়া ধরা খেলাতেই কাটালে জীবন।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'গার্হস্থ্য চিত্র' কবিতাটি ('অশ্রুকণা' কাব্য) জননী-শিশুর চিত্রগৌরবে সমৃদ্ধ। পুষ্পসুবাসিত জ্যোৎস্না-রজনীতে আঙিনায় শিশুকে ঘুম পাড়ানোয় রত জননীর চিত্র অংকনে কবি নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন :

প্রশান্ত মুখের 'পরে কালো কেশ উড়ে পড়ে,
অলসেতে আঁখি ঢুলুঢুলু!
মৃদু মৃদু ধীর হাতে, আঘাতি শিশুর সাথে,
গায় ঘুম-পাড়ানিয়া গান।.........
শিয়রেতে জেগে শশী, যেন সে সৌন্দর্যরাশি,
নেহারিছে মগ্ন হয়ে ভাবে।

তারপর এই স্বর্গীয় দৃশের গৌরব ঘোষণা :

ছেলে ডাকে 'আয় চাঁদ', মা বলিছে 'আয় চাঁদ',
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে!
মা নাই ঘরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার,
যত কিছু সব তার মিছে!
চাঁদে চাঁদে হাসাহাসি, চাঁদ চাঁদে মেশামেশি
স্বর্গে মর্তে প্রভেদ কি আছে!

'গ্রাম্য ছবি' কবিতায় কবি বাংলার গ্রামের শান্ত সংসারের চিত্র আঁকিয়াছেন।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী তাঁহার 'গীতিকা' কাব্যে 'সেকাল ও একাল' শীর্ষক সনেটে এই লুপ্ত গার্হস্থ্যচিত্রের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আধুনিক যুগের শিক্ষিত কবির মনে গত গৌরবের ও শান্ত ভালবাসার জন্য যে বেদনা, তাহাই ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে ;

অন্তঃপুরে দিদিমার শুভ সিংহাসন
কে নিল কাড়িয়া কবে! আছে কি এখন?
মাদুর বিছায়ে শত অঙ্গনে অঙ্গনে
দিদিমা আছেন বসি সহাস্য আননে ;

সন্ধ্যাবেলা ঘিরে তাঁরে বালিকা বালক
রূপকথা শুনিতেছে, আঁখি অপলক ;
চলিতেছে কৌতূহল, অদ্ভুত কল্পনা
কত প্রশ্ন কত ব্যাখ্যা, সরল জল্পনা !
দিদিমার স্নিগ্ধ কোল, ধৈর্য-ক্ষমাময় ।
লালন করিত আগে শিশুর হৃদয় ;
শৈশবের দিনগুলি স্নেহের ছায়ায়
অবাধে ফুটিতে পেত স্বাধীন শোভায় ।
এখন লয়েছে সেই সোনার আসন
কঠোর কর্তব্য আর শাণিত শাসন ।

তারপর পাই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা—মায়ের প্রতি সন্তানের ভালবাসা। আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তে বসিয়া রামপ্রসাদ সেন এই বিষয়ে অসংখ্য গান গাহিয়াছিলেন। সেখানে তিনি জগজ্জননী মাতার নিকট আব্দার, অভিমান জানাইয়া স্নেহ আদায় করিয়াছিলেন। 'মা' 'মা' রবে রামপ্রসাদ বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার গানে ভবানীর জগজ্জননী রূপটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে, সন্তানের স্নেহাভিমান প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

তবু সন্তানের মুখে চাইলে না মা,
আমায় দয়া কোরলে না মা,
পাষাণে প্রাণ বাঁধলি উমা, মায়ের ধর্ম এই কি মা ?

রামপ্রসাদের অনুসরণে কবিওয়ালারাও এই মাতৃবন্দনা করিয়াছিলেন।

আধুনিক কালে বিশুদ্ধ ধর্মানুরাগী কবি বিশেষ দেখা যায় না। তাই বিশ্ব-মাতাকে নিজ জননীরূপে কল্পনা করার ভাবদৃষ্টি গত শতাব্দীর কবিদের ছিল না। তথাপি মায়ের প্রতি সন্তানের টান—যাহা বাঙালির জীবনের মর্মকথা—তাহার পরিচয় একেবারে বিরল নহে। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নির্বাসিতের বিলাপ' কাব্যের (১৮৬৮) তৃতীয় কাণ্ডে নির্বাসিত ব্যক্তি শান্ত গৃহসংসারের জন্য— মা, পত্নী, সন্তানের জন্য—বিলাপ করিয়াছে। মাতৃবিলাপ করিয়া নির্বাসিত বলিতেছে :

হায় মা ! রহিলে কোথা ; এই রসাতলে
যাই ; জনম মত সাগরের জলে ;
নমস্কার, নমস্কার ! দেও মা ! বিদায়,
অভাগা তনয় তব যমালয়ে যায় ।
জননি ! তোমার ভালে এ হেন যাতনা
লিখেছিল পোড়া বিধি মনের বাসনা

রহিল মা ! মনে মনে ; যাই মা এখন
মনে রেখ দয়াময়ি ! জন্মের মতন।
তোমার মহৎ ঋণ রহিল সমান,
তিলমাত্র না শুধিনু আমি কুসন্তান !
লইয়া সে গুরু ঋণ যমালয়ে যাই,
তোমাকে জননী যেন লোকান্তরে পাই।

মায়ের প্রতি সন্তানের দুরন্ত আকর্ষণ অবলম্বনে অনেকেই কবিতা লিখিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'মা' (অপূর্ব নৈবেদ্য) রজনীকান্ত সেনের 'নবমীর সন্ধ্যা' (আনন্দময়ী), 'ব্যাকুলতা' (অভয়),'মা' (বাণী), মানকুমারী বসুর 'মাতৃহারা' (বিভূতি) প্রভৃতি কবিতা বিখ্যাত।

রজনীকান্ত সেনের 'মা' কবিতাটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করা গেল। মাতৃপ্রীতি যে বিশুদ্ধ গীতিরস উৎসারিত করে, ইহা তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণঃ

স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছলছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখি রে !
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা,
এনেছে, অশরণ লাগিরে !
শ্রান্ত অবিরত যামিনী-জাগরণে,
অবশ কৃশ তনু মলিন অনশনে ;
আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ সুখে,
তপ্ত তনু মম, করুণা-ভরা বুকে
টানিয়া লয় তুলি ; যাতনা-তাপ ভুলি,
বদন-পানে চেয়ে থাকি রে !
করুণে বরষিছে মধুর সান্ত্বনা,
শান্ত করি মম গভীর যন্ত্রণা ;
স্নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আঁখিজল,
ব্যথিত মস্তক চুম্বে অবিরল,
চরণ-ধূলি সাথে, আশীষ রাখে মাথে,
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগি রে !
আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি'
শিয়রে দিল দেখা পুণ্য স্নেহরাশি,
বক্ষে ধরি' চির পীযূষ-নির্ঝর,
নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর ;
নমো নমো নমঃ, জননি দেবি মম !
অচলা মতি পদে মাগি রে !

তৃতীয় শ্রেণীর যে গার্হস্থ্য-কবিতা পাই তাহা সন্তানের প্রতি মায়ের

ভালবাসার চিত্র। এই ভালবাসা, এই বাৎসল্য কেবল আপন গৃহের শিশুকেই স্পর্শ করে নাই বাহিরের অনাথ শিশুর প্রতিও বর্ষিত হইয়াছে। বাৎসল্যরসের কবিতা বৈষ্ণবসাহিত্যে ও শাক্ত সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। শিশু কৃষ্ণের জন্য মা যশোদার ব্যাকুলতা ও পতিগৃহবাসিনী দুর্গার জন্য মেনকার বেদনা এই রসের মূল অবলম্বন। এই বাৎসল্য রসের পদ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বাঙালিকে আকর্ষণ করিয়াছে। আজো আমরা ইহার আবেদন অস্বীকার করিতে পারি না। তাই উনবিংশ শতাব্দে আধুনিক গীতিকবিদের রচনাতেও বারবার 'ননী-চোরা কানাই পদক্ষেপ করিয়াছে। আমাদের গৃহের শিশুকে আমরা সেই 'কানাই' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অপূর্ব নৈবেদ্য' কাব্যে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে।

বাঙালির সংসারে নবজাতক বা শিশুর যে একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে তাহা এই শ্রেণীর কবিতাপাঠে উপলব্ধি করা যায়।

মানকুমারী বসুর 'অভ্যর্থনা' কবিতাটি (কাব্যকুসুমাঞ্জলি : ১৮৯৩) নব জাতকের প্রতি কবির অভ্যর্থনা :

পথ ভুলে এ মর-জগতে
এলি যদি যাদু! আয় আয়!
হৃদয়ের সোহাগ-মমতা
দিব তোরে সহস্র ধারায়!

'অতিথি' কবিতায় (কনকাঞ্জলি : ১৮৯৬) কোনও সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুতে কবি বিলাপ করিয়াছেন :

তুমিই আসিবে, তুমিই হাসিবে,
এ আনন্দ-ধামে আনন্দ বাড়িবে,
রাঙা পা দু'খানি যেখানে রাখিবে
কুসুম ফুটিবে কুসুম পরে!
কিন্তু, হা! কল্পিত সে সুখ-কামনা
মনেই রহিল—কাজে তা হল না
ভেঙে দিল ঘুম নিঠুর চেতনা!
দেখিলাম, তুমি যেতেছ দূরে ;
সেই রবি পুন পশ্চিমে হেলিল,
উষার সে আলো আঁধারে মেলিল,
বীণা বাঁশী সব বেসুরা বাজিল,
হায়! তুমি গেলে অজানা পুরে!

রমণীমোহন ঘোষ 'দেবশিশু' কবিতায় ('দীপশিখা') শিশুর স্বর্গীয় সৌন্দর্যের

নিকট তস্করের নতি স্বীকার বর্ণনা করিয়াছেন। শিশুর স্বর্ণাভরণ চুরি করিতে আসিয়া শিশুর হাসিতে তস্করের হৃদয়ে বেদনা জাগিল, তখন—

সযতনে চোর কোলে লয়ে তারে
ধূলি মুছি দিল ধীরে,
যেখানে যা ছিল— রতনে ভূষণে
সাজাইয়া দিল ফিরে।
কোথা গেল তার অর্থ লালসা,
কোথা গেল পাপে মতি,
মুগ্ধ নয়নে রহিল চাহিয়া
গৌর শিশুর প্রতি।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'শিশুর হাসি' কবিতায় ('বিবিধ কবিতা' : ১৮৯৩) শিশুর স্বর্গীয় হাসির বন্দনা করিয়াছেন :

কি মধু মাখানো, বিধি, হাসিটি অমন দিয়াছ শিশুর মুখে!
স্বর্গেতে আছে কি ফুল
মর্তে যায় নাহি তুল,
তারি মধু দিয়ে, কি হে, করিলে সৃজন ?……
শিশুর হাসির কাছে,
সবি পড়ে থাকে পাছে,
যেখানে যখনি দেখি তখনি জুড়াই !……
আয় আয় আয়, শিশু, অধরে ফুটায়ে
অই স্বরগের উষা,
অই অমরের ভূষা
তুলিয়া হৃদয়ে—দে রে মানবে ভুলায়ে।
হে বিধি নিয়াছ সব, করেছ উদাসী
এক হৃদয়ের আলো
উহারে করো না কালো,
অতুলনা দীপ ওটি—নিও না ও হাসি!

এই সংসারে শিশুর হাসিকে কবি সর্বোচ্চ মূল্য দিতে চাহিয়াছেন। কেবল শিশুর হাসি নহে শিশুর অভিমানও বাঙালি কবির নিকট স্বর্গীয় সুষমা সৃষ্টি করিয়াছে। প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'অবোধ ব্যথা' কবিতাটি ('গীতিকা' কাব্য) ইহার পরিচায়ক :

সাত বৎসরের ছেলে, এতক্ষণে তার
শত ক্ষুদ্র অত্যাচার সহা হ'ত ভার।
আজি শূন্যে সকরুণ আঁখি-তারা তুলি
সে রয়েছে কোণে গিয়ে খেলাধূলো ভুলি।

হেরি সকৌতুক স্নেহ জাগিল অন্তরে ;
ছোট দুটি হাতে ধরে' সুধিনু আদরে—
কি হয়েছে তোর ?—গুমরি, গুমরি, পরে,
কম্পমান ওষ্ঠটুকু জানাল কাতরে—
তার বোন—মাসীমারও মেয়ে বটে সে ;
একলাটি ফেলে কিনা চলে গেল দেশে !
শুনিনু, উঠিল যেন কাঁদিয়া বাতাসে
শিশুর অবোধ ব্যথা উদাস আকাশে ;
ভাবিনু, সে কোন্ দূরে আরেকটি হিয়া
এমনি বেদনাভরে পড়িছে নুইয়া !

এই কবিতা পাঠে স্বতই রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' (সোনার তরী) কবিতার সেই 'চারি বৎসরের কন্যাটির' কথা মনে পড়ে।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'ভয়ে ভয়ে' কবিতাটি (অশ্রুকণা : ১৮৮৭) এই অভিমানের আরেকটি সুন্দর চিত্র :

ভয়ে ভয়ে কেন, বাছা, যাস্ ফিরে ফিরে ?
কচি কচি ঠোঁট দুটি কেন কাঁপে ধীরে ?
বিষাদ-গম্ভীর মুখ,
দেখে কি কাঁপিছে বুক ?
—ঢল ঢল আঁখিযুগ ছল ছল নীরে !
আসিতে সাহস নাই,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে চাই,
ডাকিলেই এস ধাই, আজ কেন চেয়ে রে !
আমার স্নেহের লতা,
তুমি কি বুঝেছ ব্যথা !
কাঁপিছে অধরপাতা, অভিমানী মেয়ে রে !
মুচেছি মা, আঁখিজলে ;
ভয় কি, মা, আয় কোলে !
ডাকি দেখ 'মা মা' বলে আয় বুকে, রাণি রে !
—আয় বুকে অবশিষ্ট সুখহাসি খানি রে !

বাকি কবিতাগুলিতে দেখি শিশুর স্নেহাকর্ষণের অদ্ভুত ক্ষমতা বর্ণিত হইয়াছে। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 'চোর' কবিতায় (শিখা : ১৮৯৬) বলিয়াছেন :

কোথা হ'তে এলি তুই ওরে ওরে ওরে চোর ;
সর্বস্ব লইলি হরি যাহা কিছু ছিল মোর।

কোলের উপরে বসে'
হৃদয় লইলি চুষে—
বুকেতে কাটিয়া সিঁধ, এমনি সাহস তোর ;
কোথা হতে এলিরে তুঁদে ক্ষুদে সিঁধেল চোর।

দেবেন্দ্রনাথ সেন অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 'ডাকাত' কবিতা টিতে (অপূর্ব শিশুমঙ্গল) :

মহা আস্ফালন করি গৃহে যবে আইল ডাকাত,
কপাট খুলিয়া দিনু,—দিনু তারে ধনরত্নরাশি
যত ছিল, কিন্তু সে গো হাসি হাসি আসি অকস্মাৎ
বুকে উঠি দুটি বাহু প্রসারিয়া,—গলে দিল ফাঁসি!

'শিশুর স্তন্যপান' কবিতায় দেবেন্দ্রনাথ পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন স্তন্যপানরত শিশুর চিত্রটিকে—এ চিত্র অতুলনীয়—

লোকে বলে অতুলনা কালিদাসী উপমা—
নিক্তিতে ওজন করে,
দেখ দেখি ভাল করে,
বোঝা যাক কার কত উপমার গরিমা।

তারপর এই চিত্রের বর্ণনা :

চুপ্! চুপ্! চুপে এসে, ঐখানে থাক বসে,—
জননী-উৎসঙ্গে শিশু দুগ্ধ খায় নীরবে ;
গৃহখানি গেছে ভরি পারিজাত সৌরভে!
অনুপম, অপরূপ! দেখিছ না? চুপ! চুপ!
দেখিছেন দেব সব এই দৃশ্য নীরবে!
এক স্তন হস্তে ধরি অন্য স্তন মুখে পুরি,
চক্ষু বুজি!—ভৃঙ্গ যেন কমলের আসবে!
ফুল্ল বুক!—রাজা যেন বৈভবের গরবে!
আত্মহারা!—প্রজাপতি যেন পুষ্প-গরভে!
তুমিও গো চুপে এসে, এইখানে থাক বসে—
একটি প্রহর ধরি দৃশ্য দেখ নীরবে!—
ভাতিছে স্বর্গের আলো ওই দেখ পূরবে!

এই অনুপম দৃশ্য অংকনের পর কবি এই সিদ্ধান্তই করিলেন :

বলিহারি, বলিহারি,
মোর পাল্লা হল ভারি,
খর্ব-গর্ব হয়ে গেল সর্ব-কবি-মহিমা।

দেবেন্দ্রনাথের গার্হস্থ্যজীবনের কবিতা এখানে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গার্হস্থ্যজীবনচিত্রভিত্তিক কবিতার সন্ধান পাই 'মন্দ্র'

(১৯০২) ও 'আলেখ্য' (১৯০৭) কাব্যে। 'আলেখ্য'র তৃতীয় চিত্র 'নূতন মাতা' ও 'মন্ত্র'-এর 'আগন্তুক' ও 'জীবনপথের নবীনপথের প্রান্ত' কবিতায় দেখি বাঙালি সংসারে কবি রসের উৎস আবিষ্কার করিয়াছেন ও একান্ত অনুরাগে-শ্রদ্ধায়-বেদনায় সে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এ ত গেল বাঙালি সংসারের ক্ষুদ্র রাজা শিশুর প্রতি বাৎসল্যের কবিতা। বাঙালি কবির এই বাৎসল্য কিন্তু ঘরের বাহিরেও গিয়াছে। কামিনী রায়ের 'চাহিবে না ফিরে?' (আলো ও ছায়া : ১৮৮৯), 'ডেকে আন্' (ঐ), মানকুমারী বসুর 'ভিখারিনী মেয়ে' (কাব্যকুসুমাঞ্জলি : ১৮০৩) প্রমুখ কবিতায় সংসারে যাহারা স্নেহের কাঙাল, তাহাদের প্রতি কবির সমবেদনা ও বাৎসল্যের ধারা উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। মানকুমারী বসুর 'ভিখারিনী মেয়ে' কবিতার আহ্বান পাঠকচিত্তকে স্পর্শ করে :

কচি মুখে এ বিষাদ-গান,
শুনে কার কাঁদে না পরাণ?
আয় তোরা ভাই বোন, সবে মিলে যাই,
দুখিনীর আঁখিজল যতনে মুছাই ;
আমাদের মানুষের প্রাণ
কেন হবে নিরেট পাষাণ?
চল! তোরা ওর হাত ধরে,
ডেকে আনি আমাদের ঘরে ;
এজগতে কেউ ওর আপনার নাই,
কেউ হব বোন মোরা কেউ হব ভাই ;
তা হলে ও বেদনা ভুলিবে,
তা হলে বা পুলকে হাসিবে!

এই কবিতা পাঠে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'কাঙালিনী' কবিতাটি ; সেখানে এই একই ভাবের বেদনামধুর প্রকাশ।

চতুর্থ যে শ্রেণীর কবিতা আছে, তাহা শিশুসৃষ্ট জগতের চিত্র ও শিশুর আশা-আকাঙ্ক্ষার কাব্যরূপ। কুসুমকুমারী দাশের কবিতা এই শ্রেণীর। তাঁহার 'দাদার চিঠি', 'খোকার বিড়ালছানা' কবিতা দুইটি "মুকুল" পত্রিকায় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কবিতা দুইটিতে শিশুর ভাষাকে জীবন্ত-রূপ দেওয়া হইয়াছে। 'দাদার চিঠি' কবিতায় কলিকাতা-আগত এক কিশোর তাহার বাড়িতে ভাইবোনদের চিঠি লিখিতেছে ; ইহার মধ্য দিয়া কৈশোর-সঙ্গীসঙ্গিনীদের জন্য তাহার বেদনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'খোকার বিড়ালছানা' কবিতাটিতে শিশুর সহিত ইতর প্রাণীর যে একটী সুন্দর স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, তাহারই মনোমুগ্ধকর চিত্র কবি আঁকিয়াছেন :

সোনার ছেলে খোকামণি, তিনটি বিড়াল তার,
একদণ্ড নাহি তাদের করবে চোখের আড়।
খেতে শুতে সকল সময় থাকবে তারা কাছে,
না হলে কি খোকনমণির খাওয়া দাওয়া আছে?
এত আদর পেয়ে বেড়াল ছানাগুলি,
দাদা, দিদি, মাসি, পিসি সকল গেছে ভুলি।
সোনামুখী, সোহাগিনী, চাঁদের কণা বলে'
ডাকে খোকা, ছানাগুলি যায় আদরে গলে—
'সোনামুখী' সবার বড় খোকার কোলে বসে
'সোহাগিনী' ছোট যেটি বসে মাথার পাশে,
মাঝখানেতে মানে মানে বসে 'চাঁদের কণা'
একে একে সবাই কোলে করবে আনাগোনা॥

রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা আলোচনার আগে এ সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব অভিমতটি জানা প্রয়োজন। ছেলেভুলানো ছড়া আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: 'এক্ষণে বঙ্গগৃহের যিনি সম্রাট, যিনি বয়সে ক্ষুদ্রতম অথচ প্রতাপে প্রবলতম সেই মহামহিম খোকা-খুকু বা খুকুনের কথাটা বলা বাকি আছে। প্রাচীন ঋগ্‌বেদ ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণের স্তবগান উপলক্ষ্যে রচিত আর মাতৃহৃদয়ের যুগলদেবতা খোকা এবং পুঁটুর স্তব হইতে ছড়ার উৎপত্তি। প্রাচীনতা হিসাবে কোনটাই ন্যূন নহে। কারণ, ছড়ার পুরাতনত্ব ঐতিহাসিক পুরাতনত্ব নহে, তাহা সহজেই পুরাতন। তাহা আপনার সরলতাগুণে মানবরচনার সর্বপ্রথম। সে এই উনবিংশ শতাব্দীর বাষ্পলেশশূন্য তীব্র মধ্যাহ্নরৌদ্রের মধ্যেও মানবহৃদয়ের নবীন অরুণোদয়রাগ রক্ষা করিয়া আছে।

'এই চিরপুরাতন নববেদের মধ্যে যে স্নেহগাথা যে শিশুস্তবগুলি রহিয়াছে তাহার বৈচিত্র সৌন্দর্য এবং আনন্দ উচ্ছ্বাসের আর সীমা নাই। মুগ্ধহৃদয়া বন্দনাকারিণীগণ নব নব স্নেহের ছাঁচে ঢালিয়া এক খুকুদেবতার কত মূর্তিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—সে কখনো পাখি, কখনো চাঁদ, কখনো মানিক, কখনো ফুলের বন।'('লোকসাহিত্য', পৃঃ ৪২)। বাৎসল্যরসের কবিতার ইহাই যথার্থ ভূমিকা।

রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬), 'সোনার তরী' (১৮৯৪) ও 'চৈতালি' (১৮৯৮) কাব্যে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শিশু-কবিতার সন্ধান পাই। পরে 'শিশু' কাব্যে (১৯০৩) শিশু-মনস্তত্ত্বের অপূর্ব বিশ্লেষণ ও শিশুর আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক চিত্রণ লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথের চোখে শিশু মানবক মাত্র নহে, তাহার জীবনেই অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ পাইয়াছে। জননীহৃদয়ের অসীম আকুতি শিশুকে পাইয়া সার্থক হইয়াছে; বিশ্বের সকল মাধুর্য, বিশ্বাতীত

সৌন্দর্য শিশুর দেহে মনে জীবনে উচ্ছলিয়া উঠিতেছে। শিশু আমাদের হৃদয়ে অসীমের রহস্যের ও মাধুর্যের অনুভূতি আনিয়া দেয়, 'শিশু' কাব্যের ইহাই মূল তত্ত্ব। কুসুমকুমারী দাশ বা দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতায় তাহারই প্রথম ইঙ্গিত।

গার্হস্থ্যচিত্রের অপর উদাহরণ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আলেখ্য' (১৯০৬) কাব্য। গার্হস্থ্য প্রীতিমধুর বলিষ্ঠ উদারতা ও স্নেহাতুর ব্যাকুলতা এই কাব্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। স্নেহময়ী পত্নী পুত্র ও কন্যাকে লইয়া এই মর্ত-ভূমিতে যে স্বর্গ রচিত হইয়াছে এবং পত্নীবিয়োগে সেই স্বর্গে আকস্মিক বজ্রপাত হইয়াছে, 'আলেখ্য'র কবিতাগুচ্ছ তাহারই পরিচায়ক। দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয়-বত্তার আশ্রয়ভূমি যে এই প্রীতিমধুর সংসার, 'আলেখ্য' পাঠে তাহাতে আর সংশয় থাকে না। বধূচিত্র ('নববধূ', মন্দ্র), ভাই-বোনের স্নেহবিবাদচিত্র ('আলেখ্য'র দ্বিতীয় চিত্র), বিপত্নীক চিত্র ('আলেখ্য'র পঞ্চম ও অষ্টাদশচিত্র), শিশুচিত্র ('আলেখ্য'র প্রথম ও ষষ্ঠ চিত্র) এই প্রীতি ও সমবেদনার বর্ণালিসম্পাতে উজ্জ্বল ও করুণ মধুর রূপ লাভ করিয়াছে। 'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ : ১৮৯৩) কাব্যের বাৎসল্য রসের চিত্রগুলিতে স্নেহের সহিত কৌতুকের সুন্দর মিলন ঘটিয়াছে। 'এ কি রে তার ছেলেখেলা, বাকি তার কি সাধে', 'আয়রে আমার সুধার কণা, আয়রে ননীর ছবি' কবিতাদুইটি ইহার পরিচয়স্থল।

অক্ষয়কুমার বড়ালের 'শঙ্খ' (১৯১০) কয়েকটি গার্হস্থ্যচিত্র আছে। বাঙালির গৃহনিষ্ঠ প্রেমের কথাই এগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। সন্তানের প্রতি জনক-জননীর ভালবাসা চিত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল-দেবেন্দ্রনাথের মতো অক্ষয়কুমারও সমান উদ্যোগী ছিলেন।

'সদ্যোজাত কন্যা' কবিতাটির সূচনা কী সুন্দর !

কে তুই রে সুধারাশি পড়িলি ঝাঁপায়ে
প্রেয়সীর কোলে !
সমুদ্র আকুল-হিয়া কোটি বাহু আস্ফালিয়া
তোরে কি ডাকিতেছিল কল্লোলে কল্লোলে ?···
কোথা ছিল এত দিন ? ছিলি কি লুকায়ে
শারদ জ্যোৎস্নায় ?
কোথা ছিলি এত দিন ? ছিলি কি বসন্তে লীন ?
ছিলি কি বরষা-প্রাতে নিদাঘ-সন্ধ্যায় ?

'মাতৃহীন', 'আদর', 'পূজার পর', 'মাণিক', 'শিশুহারা', কবিতাগুলি এই অপত্যস্নেহের প্রকাশ। 'বিপত্নীক', 'কন্যার বিবাহে', 'বালবিধবা' প্রভৃতি কবিতায় বাঙালি সংসারের উজ্জ্বল করুণ চিত্র আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রকৃতি-কবিতা

প্রকৃতি-কবিতার প্রাচীন ও আধুনিক পটভূমি

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতির যে রূপ আমরা দেখিতে পাই তাহা সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণ প্রচেষ্টার ফল। একে ত প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবিদের আদর্শ রচিত অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেই প্রকৃতি গতানুগতিক হইয়া উঠিয়াছিল, প্রাচীন বাংলা কাব্যে আবার তাহারই অন্ধ অনুসরণ করা হইত। অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কতকগুলি চিরাচরিত রীতি ও বহুব্যবহৃত ভঙ্গিতে প্রকৃতির অবতারণা করা হইত। প্রকৃতি বর্ণনা এবং গতানুগতিক উপমা-উপাদানের সাহায্যে রূপবর্ণনাও বিভিন্ন কবির স্বকীয়তার স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, ফলে তাহাদের আর স্বাভাবিক দীপ্তি ছিল না। শ্রীফল-পয়োধর, রম্ভাউরু, তিলফুলনাসা, পদ্মলোচন, বিম্বাধর ইত্যাদি গতানুগতিক ভাবোপমার প্রাকৃতিক উপাদানের আতিশয্যে নারীরূপ বর্ণনা অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মত প্রাচীন বাংলা কাব্যও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

সুতরাং প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কবিরা কোন কৃতিত্ব দাবি করিতে পারেন বলিয়া মনে করি না। তাহা ছাড়া একেবারে গোড়া হইতেই ধর্মকে সাহিত্য রচনার মূল প্রেরণা ও উদ্দেশ্য করিয়া তোলায় কাব্যে প্রাকৃতিক উপাদানকে প্রাধান্য দিবার সুযোগও বাংলাসাহিত্যে খুব বেশী ছিল না। কবিদের মন ছিল অধ্যাত্ম-অনুভূতি-বা ভীতি-শাসিত মন। তাই রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রই সে-যুগের অনেক কবির প্রকৃতির পরিচয়ের একমাত্র নিদর্শন।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে 'বারমাসিয়া'র মধ্য দিয়া নায়িকার সারা বৎসরের সুখদুঃখের বর্ণনা করা হইত। 'বারমাসিয়া'কে আসলে একটি গতানুগতিক প্রথায় নায়িকার সুখ দুঃখ বর্ণনার উপায় হিসাবেই কবিরা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ হইতে প্রতি মাস ধরিয়া এই বর্ণনা করা হইত। এই বর্ণনায় প্রকৃতির রূপচিত্রণ-আকাঙ্ক্ষা কিছুই ছিল না, ছিল নাগরিকার সুখ বা দুঃখ দুর্দশার প্রাণহীন বর্ণনা। একমাত্র কবিকঙ্কণ-রচিত ফুল্লরার বারমাস্যাই জীবন্ত বর্ণনা।

অবশ্য বৈষ্ণব গীতিকবিতায় প্রকৃতিদৃশ্য সন্নিবেশের সুযোগ ও অবকাশ অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল, কিন্তু সেখানেও সেগুলি উপস্থিত হইত নায়ক অথবা

নায়িকার সুখদুঃখের নিয়ামক রূপে। বৈষ্ণব কবিতা আসলে একটি বিশেষ ধর্মসাধনার সাধক মহাজন কবিদের পদাবলী। এখানে কবিমন অধ্যাত্ম-অনুভূতির দ্বারা নিয়তই শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত। কবিপ্রাণের প্রত্যেক প্রকাশ এখানে নিষেধের দ্বারা বারিত ছিল। প্রকৃতির রূপপরিবর্তন প্রেমমুগ্ধা রাধার অন্তরে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই কবিদের উপজীব্য—প্রকৃতি এখানে অপ্রধান। বৈষ্ণব কবিতায় রাধাকৃষ্ণের চিরমিলনবিরহের গান রচনাতেই বৈষ্ণব কবিরা সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই রাধাকৃষ্ণ-প্রেমোপাখ্যানের আবরণ ভেদ করিয়া কবিহৃদয়ের ব্যাকুলতা, আর্তি ও বেদনা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্যই "আজিও কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটিরে"। কিন্তু এই ব্যাকুলতা একটি বৃহৎ গোষ্ঠির ব্যাকুলতা, ব্যক্তিগত পরিচয় এখানে ক্ষীণ। এই গোষ্ঠীমনোভাবই প্রাচীন গীতিকাব্যকে আধুনিক ব্যক্তিপ্রধান গীতিকাব্য হইতে পৃথক করিয়াছে। ফলে প্রাচীন গীতিকাব্যের কবি পাঠকদের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে পারেন নাই। ধর্মানুশাসন, গোষ্ঠীমনোভাব এবং রূপকাখ্যানের আবরণ কবি ও পাঠকের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই জন্যই আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিপ্রধান জীবনে প্রকৃতি-সহচরীর স্পর্শের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় আধুনিক কবি পাঠকের কাছে যতটা অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে পারেন, প্রাচীন কবিদের সে সুযোগ খুবই কম ছিল।

তথাপি বাংলা বৈষ্ণবকবিতায় প্রকৃতির উপস্থিতি মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে। প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের যে গভীর সম্পর্কের কথা রামায়ণ-শকুন্তলা-মেঘদূত-উত্তররামচরিতে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ও প্রাকৃত সাহিত্যে গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হইয়াছে। ইহারই অনুসরণে প্রাদেশিক সাহিত্যে—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে—প্রকৃতির পরিচয় ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে। বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বর্ণনার জন্য একটী প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন। যমুনাতীর, কদম্বমূল, শ্যামল কুঞ্জ এবং বর্ষা বসন্তের পটভূমিতে দুইটি কিশোর নায়ক-নায়িকার বিচিত্র প্রেমলীলাবর্ণনায় তাই অনেকটা সরসতা ও সজীবতা লক্ষ্য করা যায়। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পূর্বরাগ, মিলন, অভিসারের পদে প্রকৃতির চিত্ররূপ মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। যখন পদকর্তা বলেন 'ওঁহি অতি বাদর দূরতর দোল', তখন দোদুল্যমান বৃষ্টিধারার রূপটি আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে; যখন 'মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি', তখন প্রকৃতির আর্তি পাঠকমনকে কিছুটা স্পর্শ করে।

ইতঃপূর্বে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বহিঃপ্রকৃতি উদ্দীপন-বিভাবের কাজ

করিয়া আসিয়াছে—বর্ষা নায়ক-নায়িকার (প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের) বিরহ-ব্যথাকে নিবিড় করিয়াছে, বসন্ত তাহাদের মিলনেচ্ছাকে তীব্রতর করিয়াছে। এই ভাবে প্রকৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নায়কনায়িকার চিত্তে স্থায়ী বা সঞ্চারী ভাবোদ্দীপনে সহায়তা করিয়া কাব্যে গৌণস্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নিসর্গ পটভূমি মাত্র, ইহার বেশি কিছু নহে।

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় সর্বপ্রথম কাব্যের রাজদরবারে নিসর্গের স্বতন্ত্র আসন নির্দিষ্ট হইল। নিসর্গ যে মানবমনকে কেবল পুলকিত ও অশ্রুসজল করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, তাহা নহে ; নিসর্গের নিজস্ব একটি রূপমহিমা আছে —সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। বর্ষায়, শরতে, শীতে, হেমন্তে, গ্রীষ্মে, বসন্তে নিসর্গের বিচিত্র রূপ বাংলাসাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের এই নিসর্গ-কবিতার গুরুত্ব কতটুকু? নিসর্গকেই প্রধান বর্ণনীয় বিষয় করিয়া, তাহাকে নির্বাসন হইতে উদ্ধার করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাহার জন্য কাব্যের রাজদরবারে একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এই নূতন রীতির প্রবর্তনাই ঈশ্বরচন্দ্রের মৌলিকতা ও কৃতিত্ব। ইহার বেশি কিছু নহে। ঈশ্বরচন্দ্রের নিসর্গ-দর্শন বলিয়া কোন স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। নিসর্গ বর্ণনায় কবির কোন সূক্ষ্মদর্শিতা বা বিশেষ চেতনা ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্রের "ঋতু-বর্ণন" পর্যায়ের কবিতায় ঋতু গৌণ, মানবের উপর ঋতুর প্রভাবই মুখ্য। এগুলি পড়িলে এ-ধারণা জন্মে না যে নিসর্গের রহস্যলীলা বর্ণনাই এই সকল কবিতায় প্রেরণারূপে কাজ করিয়াছে, পরন্তু দারুণ গ্রীষ্মে ও প্রচণ্ড শীতে মানুষের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে যে বিশৃঙ্খলতা, যে অবস্থা-বিপর্যয়, যে আচরণ-অসঙ্গতি প্রকাশ পায়, সেইগুলি লইয়া একটু লঘু হাস্যরসের অবতারণা করাই যেন কবির অভিপ্রায় ছিল বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রকৃতিই এইরূপ, যেখানে মানুষের 'হয়রানি', 'নাকানি-চুবানি', সেইখানেই তিনি কৌতুক রসের সন্ধান পান। এই "ঋতু-বর্ণনে"ও সেই কৌতুক রস পরিবেশন ভিন্ন গভীরতর কোন উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয় না। আসল কথা ঈশ্বরচন্দ্রের নিসর্গ কবিতা Objective বা বস্তুলীন, তাঁহার কল্পনা একান্তই বস্তুধর্মী। (অথচ সার্থক নিসর্গ কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে Subjectiviy বা আত্মলীনতা—সেখানে ব্যঞ্জনাধর্মী কবিকল্পনাই প্রধান)। এগুলিতে নিসর্গের প্রতি ব্যাবহারিক দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়।

একটিমাত্র ঋতুর বর্ণনাতেই এই বক্তব্যের পরিপোষণা হইবে। ঈশ্বরচন্দ্রের 'গ্রীষ্ম' কবিতায় গ্রীষ্মের প্রবল প্রতাপের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। দারুণ গ্রীষ্মের এমনই প্রতাপ যে,—

বাঘ হ'ল রাগহত তাগ নাই তার।
শীকার স্বীকার নাই শীকারে বিকার॥
ভাব দেখে বোধ হয় হইয়াছে মৃগী।
তার কাছে শুয়ে আছে মৃগ আর মৃগী॥

এই ত পশুদের উপর গ্রীষ্মের প্রভাব; মানুষের উপর ইহার প্রভাব আরও ভয়াবহ। পুরোহিত পূজার আসনে বসিয়া মন্ত্র ভুলিয়া যায় এবং 'কোষা ধ'রে ঢক্ ঢক্ জল ঢালে গলে।' ইহাদের অবস্থা ত তবু কল্পনা করা যায়, কিন্তু—

একেবারে মারা যায় যত চাপ দেড়ে।
হাঁস ফাঁস করে যত প্যাজ খেকো নেড়ে॥
বিশেষতঃ পাকা দাড়ি পেটমোটা ভুঁড়ে।
রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে নেড়া মাথা ফুড়ে॥

মেয়েদের অবস্থা মারাত্মক —

সধবা হইল যেন বিধবার প্রায়।
কেহ আর অলঙ্কার নাহি রাখে গায়॥
সদাই চঞ্চল মন বস্ত্র খুলে থাকে।
ইচ্ছা করে অঞ্চলেরে অঞ্চলে না রাখে॥

তাই ঈশ্বর গুপ্তের নিসর্গ-কবিতার কোনো গুরুত্ব নাই। এই-সব বর্ণনা যথার্থ কবিতা নহে, পদ্য মাত্র।

ঈশ্বরগুপ্তের পর দেখা দিলেন রঙ্গলাল ও মধুসূদন। প্রকৃতি-চিত্রণে রঙ্গলাল এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রমাণস্বরূপ বলিতে পারি, 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে নিদাঘ-ঋতু-বর্ণনা ঈশ্বর গুপ্তের গ্রীষ্ম-বর্ষা-বর্ণনা অপেক্ষা উচ্চতর বর্ণনা। ইহার মধ্যে গভীর রসসঞ্চার দেখা যায়।

বহুমুখী প্রতিভাশালী মধুসূদন প্রকৃতি-কবিতার ক্ষেত্রেও আপন স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন যে বৈষ্ণব আদর্শের পদরচনা করিয়াছেন, তাহা বাহ্য-অনুসারী। তিনি বৈষ্ণব কবিদের মনোগত রসাবেগটি কাজে লাগাইয়াছেন নবতর আঙ্গিকরীতিতে। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের একটি বিশেষত্ব স্বতন্ত্র উল্লেখ দাবি করে। মধুসূদনের সৃষ্ট দিব্যোন্মাদ-ভাবিতা রাধিকা সখীহীনা. প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান রাধিকার সখীস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ করিয়া তিনি প্রেমোচ্ছ্বাস, আক্ষেপ, বিরহানুভূতি ইত্যাদি ব্যক্ত করিয়াছেন। পুনশ্চ, মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা ও সরমার কথোপকথনের (চতুর্থ সর্গ) মধ্যেও আরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে সীতার সখীত্বের আভাস আছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃতিতে ব্যক্তিত্ব-আরোপ আলংকারিক রীতিতেই পরিসমাপ্ত, কালিদাসের শকুন্তলা-মেঘদূত প্রভৃতি

কাব্যে মানুষের সহিত প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যের মতো গভীরতা এই কাব্যগুলিতে নাই। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপনে মধুসূদনের নায়িকারা কালিদাসের নায়িকাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছেন।

বর্ষার প্রথম মেঘ একটী বিরহী চিত্তে মিলন-আকাঙ্ক্ষায় কী গভীর বেদনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাই হইল কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। মেঘকে দৌত্যকার্যে নিয়োগ এবং তাহার গমনপথের সঙ্গে নিখিলকে আনন্দ-বেদনার সম্বন্ধে যুক্ত করিয়া দিবার পিছনে মানবমনের সহিত প্রকৃতির সমানুভূতির ও অন্তরঙ্গতার মনোভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। কাহিনী কিছুটা অগ্রসর হইতে না হইতেই বিরহী যক্ষকে কবি বলিয়া চিনিতে আমাদের ভ্রম হয় না। প্রাকৃতিক উপাদান এখানে মানুষের মতোই চেতনার অধিকারী এবং সমবেদনাপূর্ণ। ঠিক এই সমানুভূতি ও অন্তরঙ্গতা মেঘনাদবধ-কাব্যের সীতা ও আরণ্য প্রকৃতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

একটী ক্ষেত্রে মধুসূদনের কিঞ্চিৎ সফলতা লক্ষ্য করা যায়—তাহা প্রকৃতির রুদ্ররূপ বর্ণনায়। গম্ভীর শব্দ সমাবেশে এবং ছন্দের ধ্বনিরোলে মাঝে মাঝে প্রকৃতির ভীষণ রূপটী মধুসূদনের কাব্যে ধরা পড়িয়াছে।

কিন্তু বহুব্যবহারে এই পটভূমির সজীবতাও ম্লান হইয়া আসিল। অষ্টাদশ শতাব্দে বৈষ্ণবপদরচনা কেবল অন্ধ প্রথানুগত্যে পর্যবসিত হইল। এই শতাব্দের শেষে বৈষ্ণবপদ প্রেরণা-নিঃশেষিত হইয়া স্বাভাবিক মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইল।

উনবিংশ শতাব্দের প্রথমার্ধে কবিগান ও টপ্পা রচয়িতারা আধ্যাত্মিক প্রেমের পরিবর্তে পার্থিব প্রেমকে উপজীব্য করিয়া গীত রচনা করিয়াছিলেন। নরনারীর প্রেমাবেগ প্রকাশে তাঁহারা যে মৌলিকতা ও সজীবতা দেখাইয়াছিলেন, প্রকৃতি-চিত্রণে তাহার কিছুই দেখা যায় নাই। ফলে তাঁহাদের গানেও বৈষ্ণবকবিতার পটভূমি মুদ্রাদোষের মত হইয়া উঠিয়াছিল।

সুতরাং একথা বলা যায়, প্রাগাধুনিক বাংলাকাব্যে প্রকৃতি প্রধানত পটভূমিরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; ইহার মধ্যে বৈষ্ণব কবিরাই কিছুটা সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত কাব্যের বশ্যতা ও ধর্মানুগত্যের জন্য বৈষ্ণব কবিরা প্রকৃতিকে যোগ্যস্থান দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর ইংরাজ-শাসনের অভ্যুদয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবজাগরণ ও সাহিত্যের নবজন্ম হইল। নূতন ভাবধারার সহিত পরিচয় এবং গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় বাংলাকাব্যে একটা নূতনত্বের আভাস লক্ষ্য করা গেল।

ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা কাব্যে বহু নূতনত্বের আমদানি করেন—সমসাময়িক ঘটনার উপর কবিতা, যুদ্ধবিষয়ক কবিতা, ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয় অবলম্বনে কবিতা,

রঙ্গপ্রিয়তা, যুক্তিপ্রাধান্য, সমাজচেতনা, ইতিহাসবোধ—এই সবই ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায়। এইরূপ আরেকটি নূতনত্ব তিনি বাংলা কাব্যে আমদানি করেন—তাহা হইল নিসর্গ-বর্ণনায় নিসর্গ একমাত্র উপজীব্য; কোন নায়কনায়িকাকে অবলম্বন করিয়া নহে, সোজাসুজি প্রত্যক্ষ নিসর্গ-বর্ণনা।

মধুসূদন যেখানে প্রকৃতি-কবিতা রচনায় সফল, সেখানে তাঁহার সাধনা অসম্পূর্ণ। তাহা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬)। এই কাব্যের কোনো কোনো কবিতায় প্রকৃতি প্রাণময়ী শুধু নহে, ধ্যানময়ী এবং অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষে চেতনাময়ী। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারি তিনটি সনেট: 'দেব-দোল' (এখানে রূপে অরূপ-দর্শনের আভাস আছে), 'বটবৃক্ষ' (রবীন্দ্রনাথের 'বনবাণী' কাব্যের সূচনা এখানে মিলে), 'বিজয়াদশমী' (শাক্ত কবিতার প্রাণবাণী এখানে অধিকতর বেদনায় রোমাঞ্চিত)। মধুসূদন যদি আরো কয়েক বৎসর বাঁচিতেন ও সাহিত্যচর্চা করিতেন, তবে চতুর্দশপদীর গীত-মূর্ছনা ধীরে ধীরে তাঁহাকে আরো গভীরে লইয়া যাইত। অন্তর্মুখী কবিপ্রাণের পরিচয় 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', তাই এখানে প্রকৃতি কোথাও কোথাও আত্মময়ীর দিব্যমহিমায় উজ্জ্বল। আধুনিক নিসর্গচেতনা বাংলা কাব্যে প্রথম চতুর্দশপদী কবিতাবলীতেই দেখা গেল। দ্যুলোক ও ভূলোকে নব নব রহস্যসন্ধান ও মানবতাবাদের দ্বারা নিসর্গকে অনুরঞ্জিত করার প্রয়াস প্রথম এখানেই লক্ষ্য করা যায়। 'শনি,' 'উদ্যানে পুষ্করিণী', 'নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দিরে', 'সাগরে তরি', 'তারা', 'পৃথিবী', 'বটবৃক্ষ' সনেটগুচ্ছ তাহার পরিচয়স্থল।

অবশ্য এ-কথা স্বীকার্য যে, মধুসূদনের প্রকৃতি-কবিতা সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। মধুসূদন পর্যন্ত বাংলা কাব্যে নিসর্গচেতনা ভাবনিষ্ঠতার সৌন্দর্যে বিশেষ দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। হেমচন্দ্র বিহারীলালের কবিতায় নিসর্গ-চেতনা পূর্ণ রূপ পাইল; কবির নিসর্গ-দর্শন এই প্রথম দেখা গেল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনটি মূল্যবান কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়—হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী', বিহারীলালের 'নিসর্গ-সন্দর্শন' ও 'বঙ্গসুন্দরী'। এই তিন কাব্যে নিসর্গ-চেতনা প্রথম ধরা দিল।

অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ প্রকৃতির মধ্যে রহস্য সন্ধানের নিরন্তর প্রচেষ্টা, অপরিচয়ের রহস্য মিশাইয়া প্রকৃতিকে উপভোগের ব্যাকুলতা, মানব ও প্রকৃতির মাঝে দূরত্বের আবিষ্কার ও তাহা উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়াস, রোমান্টিক অস্পষ্টতার মধ্য দিয়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত, অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া প্রকৃতি সুন্দরীর সহিত পরিচয় স্থাপন—ইহা বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গি।

ইংরেজী কাব্যের মাধ্যমে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় লাভ করি ও ইহাকে গ্রহণ করি। প্রকৃতি-কবিতার ক্ষেত্রে বাংলা কাব্য তাই পাশ্চাত্ত্যের নিকট ঋণী। এখানে ভারতীয় কবিসংস্কার কাজে লাগে নাই।

প্রাচীন ভারতীয় রসশাস্ত্র নিসর্গরস বলিয়া বিশেষ কোনো রসকে স্বীকার করিত না। নিখিল বিশ্বের নানা প্রকাশের মধ্যে প্রকৃতি একটি,—ভারতীয় দর্শনের এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন ভারতীয় কবিদের প্রাক্তন- সংস্কার রূপে বিদ্যমান ছিল। তাই তাঁহারা প্রকৃতির রহস্যসন্ধানের জন্য ব্যাকুল হন নাই।

প্রখ্যাত আলংকারিক আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন:

"নাস্ত্যেব তদ্‌বস্তু যদ্ অভিমত-রসাঙ্গতাং নীয়মানং ন প্রগুণী ভবতি। অচেতনা অপি হি ভাবা যথাযথম্ উচিত-রস-ভাবতয়া চেতন-বৃত্তান্ত-যোজনয়া বা ন সন্ত্যেব তে যে যান্তি না রসাঙ্গতাম্।" (ধ্বন্যালোক, ৩।৪৩, বৃত্তি)।—অর্থাৎ "এমন বস্তুই নাই যাহাতে অভিলষিত রসের স্পর্শ দিলে প্রকৃষ্ট গুণশালী না হয়। অচেতন বিষয়সমূহও যথাযথরূপে সমুচিত রস-ভাব দ্বারা অথবা চেতন বৃত্তান্ত-যোজনা দ্বারা শোভিত হইলে এমন হইতে পারে না যাহাতে রসাঙ্গতা না পায়।"

আনন্দবর্ধন নিজ যুক্তির সমর্থনে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন:

"ভাবান্ অচেতনান্ অপি চেতনবৎ চেতনান্ অচেতনবৎ। ব্যবহারয়তি যথেষ্টং সুকবিঃ কাব্যে স্বতন্ত্রতয়া॥" —(ধ্বন্যালোক, ৩।৪৩, বৃত্তি)

—অর্থাৎ "সুকবি কাব্যে স্বতন্ত্র হইয়া নিজ ইচ্ছানুযায়ী অচেতন বিষয়-সমূহকে চেতনের ন্যায় এবং চেতন বিষয়সমূহকে অচেতনের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।"

আনন্দবর্ধনের এই অভিমত আধুনিক কবিদের নিকট গ্রহণীয় নহে এই কারণে যে, ইহাতে পাশ্চাত্ত্য প্রকৃতিদৃষ্টিতে প্রকৃতির মধ্যে যে অপরিমেয় রহস্য ও অজানার দূরত্ব আছে, তাহাকে স্বীকার করা হয় নাই। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আধুনিক বাংলা কাব্য প্রাচীন ভারতীয় কাব্য বা ঐতিহ্যের নিকট ঋণী নহে।

আধুনিক প্রকৃতি-কবিতার সূচনা

পূর্বেই বলিয়াছি, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী', বিহারীলালের 'নিসর্গসন্দর্শন' ও 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্য প্রকাশিত হয়। এই তিন গ্রন্থে প্রকৃতির প্রতি বাঙালি কবির স্বতন্ত্র নূতন দৃষ্টি দেখা যায়। ইহারও পূর্বে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিহারীলালের 'সংগীতশতক' প্রকাশিত হয়। 'সংগীতশতকে'ই এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম পরিচয় পাই। বিহারীলালের বাল্যবন্ধু আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার পৌষ ১৩২০ সংখ্যায় লেখেন "সংগীত-শতকের মধ্যে এমন অনেক গান আছে যাহার নিসর্গ-বর্ণনা এত চমৎকার যে ভাবুক ব্যক্তিমাত্রেই উল্লাসে পুলকিত হইবেন।" 'সংগীতশতক'

পাঠ করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির সহিত আলাপ করেন; তদবধি ঠাকুর-পরিবারের সহিত কবির একটি অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। (দ্রঃ রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি)।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে—যখন মধুসূদনের একচ্ছত্র প্রতাপ—তখন প্রকৃতি সম্বন্ধে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনে একান্ত আত্মলীন গীতিকবিতা রচনা কম কৃতিত্ব নহে।

সংগীতশতকের ৯৯ সংখ্যক কবিতায় কবি বলিতেছেন—

প্রণয় করেছি আমি
প্রকৃতি-রমণী সনে
যাহার লাবণ্যচ্ছটা
মোহিত করেছে মনে;
মুখ—পূর্ণ সুধাকর
কেশজাল—জলধর
অধর—পল্লব নব
রঞ্জিত যেন রঞ্জনে;
সমুজ্জল তারাগণ
শোভে হীরক ভূষণ
শ্বেত ঘন সুবসন
উড়ে পড়ে সমীরণে;
বায়ুর প্রতি হিল্লোলে
লতাগুলি হেলে দোলে
কৌতুকিনী কুতূহলে
নাচে চঞ্চল চরণে;
হেলিয়ে স্তবক-ভরে
মরি কত লীলা করে,
পয়োধরভার ভরে
ঢলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে;
প্রফুল্ল কুসুমরাশি
অধরে উজ্জল হাসি
বাজায় মধুর বাঁশী
অলির সুধা-গুঞ্জনে;
কমল-নয়নে চায়
আহা কি মাধুরী তায়!
মুনিমন মোহ যায়
হেরিলে স্থির নয়নে;

পাখীর ললিত তান
প্রাণপ্রিয়া গায় গান
উদাস করয়ে প্রাণ
সুধা বরষে শ্রবণে ;
যখন যথায় যাই
প্রকৃতি তো ছাড়া নাই
ছায়াসমা প্রিয়তমা
সদা আছে সনে সনে !
তেমন সরল প্রাণ
দেখিনি কারো কখন
মৃদু মধু হাসি, যেন
লেগে রয়েছে আননে !
হেরিয়ে তাহার মুখ
অন্তরে পরম সুখ
নাহি জানি কোন দুখ
সদা তার সুসেবনে ;
ক্ষুধার সুস্বাদু ফল
তৃষার শীতল জল
যখন যা প্রয়োজন
যোগায় অতি যতনে ;
সাধের বসন্তকালে
চাঁদের হাসির তলে
নিদ্রা আকর্ষণ হ'লে
দুলায় ধীরে ব্যজনে ;
যাহাতে না হই দুখী,
যাহাতে হইব সুখী
সর্বদাই বিধুমুখী
আছে তার অন্বেষণে ,
(যথা যার ভালবাসা
পাছু পাছু ধায় আশা)
ইহার কামনা নাই
ভালবাসে অকারণে !
একান্ত সঁপেছে মন
সমভাব অনুক্ষণ
এত করিয়ে যতন

করিবে কি অন্য জনে ?
যেমন রূপ লোভন
তেমনি গুণশোভন
এমন অমূল্য ধন
কি আছে আর ত্রিভুবনে ॥

কবিতাটি দীর্ঘ হইলেও সম্পূর্ণ উদ্ধার করিলাম এই জন্য যে ইহাতে বিহারীলালের প্রকৃতি-দর্শনের মূল কোথায়, তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই কবিতায় প্রকৃতির জন্য কবি মনের অস্পষ্ট রোমান্টিক ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

'প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি-রমণী সনে, যাহার লাবণ্যচ্ছটা মোহিত করেছে মনে'—ইহা বিশুদ্ধ পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গি। সমাসোক্তি অলংকারের মাধ্যমে প্রকৃতিকে নিয়ত-সঙ্গিনী বিধুমুখী প্রণয়িনী রূপে কল্পনাও পাশ্চাত্ত্য কল্পনা। বিহারীলালের কৃতিত্ব এই যে, তিনি পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গি আপনার করিয়া লইয়াছেন। 'সংগীতশতকে'র আরো অনেক কবিতাতেই এই রোমান্টিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য অংকনে কবি নিখুঁত তুলিকা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার প্রমাণ ৩,৭,১১,১৬,২৩,২৯, ৩৪, ৫৫, ৬৬, ৯৩, ৯৯, ১০৯ সংখ্যক কবিতা। প্রকৃতির শান্ত ও রুদ্র—উভয় রূপই কবি চিত্রণ করিয়াছেন। কবি এখনও পুরাপুরি ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। 'অহো কি প্রকাণ্ড কাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার! অমেয় অনন্ত ব্যোম অসীম বিস্তার' ইত্যাদি কবিতায় এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইহাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে প্রকৃতির প্রতি কবির সমানুভূতি ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি।

'নিসর্গসন্দর্শন' কাব্যে (১৮৭০) প্রকৃতির শান্ত ও রুদ্ররূপের বিচিত্র সৌন্দর্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস করা হইয়াছে। সমুদ্রদর্শন, নভোমণ্ডল, ঝটিকা-সম্ভোগ প্রভৃতি কবিতায় কবির অনুভূতি গভীরভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছে এমন লক্ষণ পাওয়া যায় না। সংগীত-শতকে প্রকৃতির সহিত মানবের ও মানবপ্রেমের একটি সূক্ষ্ম সম্পর্কের আভাস দেওয়া হইয়াছে। নিসর্গ-সন্দর্শন কাব্যে দেখি বিষয়ের গভীরে প্রবেশ ক্ষমতা এখনো কবির আয়ত্ত হয় নাই। তবে সমুদ্রই হউক আর ঝটিকাই হউক—প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে রহস্য ও বিস্ময় আবিষ্কারের একটি প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। আর এই রহস্য ও বিস্ময় রোমান্টিসিজম্-এর মূল কথা।

এই কাব্য রচনায় কবি ইংরাজী কাব্যের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপচিত্রণ প্রাথমিক স্তরের প্রকৃতিকবিতা; এক্ষেত্রে বিহারীলাল শেলী ও বায়রন-এর নিকট হাত পাতিয়াছেন। কবি কাব্যের

সূচনাতেই শেলীর "Stanzas written in Dejection near Naples" হইতে এই দুই চরণ উদ্ধার করিয়াছেন—

Alas ! I have nor hope nor health.
Nor peace within nor calm around.

শেলীর ঐ কবিতা এবং 'নিসর্গ-সন্দর্শন'কাব্য উভয় ক্ষেত্রেই জগতের সাংসারিক নিষ্ঠুরতার তুলনায় প্রকৃতির শান্ত ও রুদ্র রূপকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে এবং হতাশা ও বেদনায় সান্ত্বনাদায়িকা রূপে প্রকৃতি দেখা দিয়াছেন। অবশ্য বিহারীলাল শেষ পর্যন্ত অধ্যাত্মজগতে শান্তির সন্ধান করিয়াছেন।

সমুদ্রের বাহ্যিক রূপ দেখিয়া কবি বিস্মিত হইয়াছেন—সমুদ্রের 'অসীম-আকাশ-প্রায় নীল জলরাশি', 'তুলার বস্তার মত ফেনা রাশি রাশি',সমুদ্রতীরের প্রবল সমীরণ, তরঙ্গের দোলায় দোদুল্যমান পোতশ্রেণী, সমুদ্র-তীরলগ্ন দ্বীপ-মালা প্রভৃতি বস্তুমূলক বহু বিষয় কবির মানসাকাশে শরতের লঘু মেঘখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। সমুদ্রদর্শনজনিত প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কবি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়াই বস্তুপুঞ্জ দেখা দিয়াছে। তবে মাঝে মাঝে উপমা-সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, সমুদ্র-তরঙ্গে দোদুল্যমান জাহাজ-গুলিকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন—

হাসিমুখী পরী সব আলুথালু বেণী
নাচন্ত ঘোড়ায় চ'ড়ে যেন ছুটে যায়।

পুনশ্চ,

রাশি রাশি সাদা মেঘ নীলাম্বরে ভাসি,
ঝড়ের সঙ্গেতে যেন ছুটিয়া বেড়ায়।

পুনশ্চ,

যখন পূর্ণিমা আসি হাসি হাসি মুখে,
উথল হৃদয়'পরে দেয় আলিঙ্গন ;
তখন তোমার আর সীমা নাই সুখে,
আহ্লাদে নাচিতে থাক ক্ষেপার মতন।

উদ্বেল সমুদ্রের সহিত পূর্ণিমার সম্পর্কটি এখানে বিহারীলের কবিকল্পনায় চমৎকার রূপ পাইয়াছে। অবশ্য এই উপমা সংস্কৃত কাব্য হইতে গৃহীত।

'সমুদ্র-দর্শন' (দ্বিতীয় সর্গ) অংশটি পুরীতে সমুদ্র দর্শনের পর লেখা হইয়াছিল, একথা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলিয়াছেন। আসলে যতটা না প্রত্যক্ষ অনুভূতির জোরে তদপেক্ষা অধিক ইংরাজী কাব্যের অনুকরণে লেখা হইয়াছিল।

বায়রন্-এর Childe Harold কাব্যের চতুর্থ সর্গের 'Ocean' অংশের হুবহু অনুসরণ এই সমুদ্র বর্ণনায় লক্ষ্য করা যায়।

এই সর্গে বিহারীলাল বলিয়াছেন :

আপনার মনে ওহে উদার সাগর !
গড়ায়ে গড়ায়ে তুমি চলেছ সদাই,
প্রাণীদের কলরবে পোরা চরাচর,
কিন্তু তব কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। (স্তবক ৮)
দাঁড়ায়ে তোমার তটে হে মহাজলধি,
গাহিতে তোমার গান, এল এ কি গান ;
যে জ্বালা অন্তর মাঝে জ্বলে নিরবধি,
কথায় কথায় প্রায় হয় দীপ্যমান। (২৮)
গড়াও গড়াও তুমি আপনার মনে !
কাজ নাই শুনে এই গীত খেদময় ;
তোমার উদাররূপ হেরিয়ে নয়নে,
জুড়াক ও অভাগার তাপিত হৃদয় !
কিন্তু তব ভ্রূক্ষেপের ভর নাহি সয় ;
একমাত্র অবজ্ঞার কটাক্ষ ইঙ্গিতে,
একেবারে ত্রিভুবনে হেরে শূন্যময়,
কাত হয়ে শুয়ে পড়ে জাহাজ সহিতে। (৩৩)
দুই একবার মাত্র ভুড়্‌ভুড়্‌ করে,
মুহূর্তে মিলায়ে যায় বুদ্বুদের প্রায় :
মাটির পুতুল চোড়ে ভেলার উপরে,
জনমের মত হায় রসাতলে যায়। (৩৫)
কিন্তু সেই সর্বজয়ী মহাবল কাল,
যার নামে চরাচর কাঁপে থরহরি ;
আপনার জয়চিহ্ন যুঝে চিরকাল
দাগিতে পারেনি তব ললাট উপরি। (৩৭)

বায়রন্ Child Harold-এর চতুর্থ সর্গে বলিয়াছেন—

Roll on, thou deep and dark blue Oceon—roll !
Ten thousand fleets sweep over thee in vain ;
Man marks the earth with ruin—his control
Stops with the shore ; upon the watery plain
The wrecks are all the dead, nor doth remain
A shadow of man's revage, save his own
When for a moment, like a drop of rain,
He sinks into they depths with bubbling groan,
Without a grave, unknell'd, uncoffin'd and unknown.
[Stanza : CLXXIX]

Thy shores are empires, changed in all save thee—
Assyria, Greece, Rome, Carthage, what are they ?
Thy waters washed them power while they were free,
And many a tyrant since, their shores obey
The stranger, slave, or savage, their decay
Has dried up realms to desert :—not so thou ;
Uuchangeable, save to thy wild waves' play,
Time writes no wrinkle on thine azure brow
Such as creation's dawn beheld, thou rollest now.

[Stanza : CLXXXII]

সুতরাং বিহারীলালের এই সমুদ্রবর্ণনায় মৌলিকত্ব নাই।

'নভোমণ্ডল' (চতুর্থ সর্গ) অংশে বিশ্বনিহিত আনন্দের অংশ গ্রহণের ইচ্ছা কবি প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন :

হালিগাথা ছায়াপথ, গোচ্ছা সেলিহার,
তোমার বিশাল বক্ষে সেজেছে উচিত,
যেন এক নিরমল নির্ঝরের ধার,
সুবিস্তৃত উপত্যকা-বক্ষে প্রবাহিত।
শূন্যে শূন্যে মেঘমালে নাচিয়ে বেড়ায়,
চঞ্চল চপলমালা তব নৃত্যকারী,
যেন মানসরোবর—লহরী লীলায়,
উল্লাসে সন্তরে সব অলকা সুন্দরী।

এ কেবল চিত্র, ইহাতে কোন সংগীত নাই ; কবির নিজস্ব অনুভূতির সহিত এই চিত্রের পরিণয় সাধিত হয় নাই।

'নিসর্গ-সন্দর্শন' (১৮৭০) কাব্যের গুরুত্ব এই যে, প্রকৃতি-চিত্রণের প্রাথমিক স্তর কবি উত্তীর্ণ হইতে চাহিয়াছেন, আবেগের তীব্রতা এ কাব্যে লক্ষ্য করা যায়, অনুভূতির গভীরতা অবশ্য এখনো আসে নাই। কাব্যে বিহারী-লালের স্বকীয় প্রকাশভঙ্গিটি অস্ফুট ভাবে ধরা পরিয়াছে, বিহারীলাল নিজস্ব প্রকাশ-মাধ্যম প্রায় খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

পরবর্তী 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যেই (১৮৭০) বিহারীলাল নিজস্ব প্রকাশমাধ্যম আয়ত্ত করিয়াছেন। এই কাব্যের প্রথম স্তবকেই—

সর্বদাই হু হু করে মন
বিশ্ব যেন মরুর মতন।
চারিদিকে ঝালাপালা
উঃ! কি জলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।

এই বর্ণনায় সারদামঙ্গলের কবির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। যে-লেখনী 'সারদামঙ্গল' লিখিয়াছিল, সেই কুসুমপেলব লেখনীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। 'বঙ্গসুন্দরী'তে দেখা গেল ভাষায়-উপমায়-প্রকাশরীতিতে কবির পূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছে। শুধু অধিকার নয়, ইহার উপর কবি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়াছেন। 'বঙ্গসুন্দরী' বিহারীলালের প্রথম সার্থক সৃষ্টি।

এই কাব্যের 'উপহার' অংশই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অংশে বিহারীলালের রোমন্টিক কবিভাবনা অতি চমৎকার ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই প্রথম বাংলা কাব্যে রোমান্টিক কবিভাবনার পূর্ণ প্রকাশ ঘটিল। প্রকৃতিবর্ণনায় সরসতা, প্রত্যক্ষতা ও সংস্কারমুক্তি বিহারীলালের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্য এই কাব্যে পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

রোমান্টিক কবিভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল বর্ত্তমানের কুশ্রী দীনতা হইতে, বাস্তবের প্রত্যক্ষ রূঢ়তা হইতে মুক্তি লইয়া মানস-জগতে আত্ম-নিমজ্জন। যাহা অতি-নিকট, অতি-প্রত্যক্ষ, তাহা রোমান্টিক কবিকে পীড়িত করে। তাই তিনি বাস্তবকেও কল্পনার ইন্দ্রধনুরাগে রঞ্জিত করিয়া লন। এই কাব্যের 'উপহার' অংশে বাস্তব হইতে অপসরণের ইচ্ছা ও মানস আত্মনিমজ্জনের বাসনা প্রকাশিত হইয়াছে—

কভু ভাবি ত্যজে এই দেশ,
যাই কোন এ হেন প্রদেশ,
যথায় নগর গ্রাম,
নহে মানুষের ধাম,
পড়ে আছে ভগ্ন-অবশেষ।
কভু ভাবি কোন ঝরণার
উপলে বন্ধুর যার ধার ;
প্রচণ্ড প্রপাত-ধ্বনি,
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দ্দিকে হতেছে বিস্তার,—
গিয়ে তার তীর তরু-তলে,
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে,
ডুবাইয়ে এ শরীর,
শব সম রব স্থির,
কান দিয়ে জল-কলকলে।

এই অংশে কবি কেবল যে বর্তমান হইতে বিদায় লইয়া কল্পলোকে কল্পনা-ঘেরা স্বপ্নরাজ্যে আত্মগোপন করিতে চান, তাহা নহে। বহির্বিশ্বে নিজেকে

বিলাইয়া দিয়া বৈচিত্র্যের অনুভূতিলাভ করিবার জন্যও কবিচিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নাম ধাম সকল লুকাই,
চাষীদের মাঝে রয়ে
চাষীদের মত হয়ে,
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।
বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী,
শাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি,
সরল চাষার সনে.
প্রমোদপ্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে শর্বরী।

প্রকৃতি-সম্ভোগের এই অভিলাষের সহিত রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কবিতায় ব্যক্ত অভিলাষের সাদৃশ্য আবিষ্কার করা কঠিন নহে।

আধুনিকতার অভিশাপ হইতে কবি দূরে থাকিতে চাহিয়াছেন। তথাপি রোমান্টিক কবিভাবনায় বিষাদের সুর লাগিয়াছে।

বৃথা হেন কত ভাবি মনে,
বিনোদিনী কল্পনার সনে,
জুড়াইতে এ অনল,
মৃত্যু ভিন্ন অন্য জল,
বুঝি আর নাই এ ভুবনে!
হায় রে সে মজার স্বপন
কোথা উবে গিয়েছে এমন,
মোহিনী মায়ায় যার,
সবে ছিল আপনার,
যবে সবে নূতন যৌবন!
ওহে যুবা সরল সুজন,
আছ বড় মজায় এখন;
হয় হয় প্রায় ভোর,
ছোটে ছোটে ঘুমঘোর;
উঠ এই করিতে ক্রন্দন!

কিন্তু প্রকৃতির সহিত নূতন অন্তরঙ্গতা স্থাপনের পর তীব্র অনুভূতি ও হৃদয়াবেগের কাব্যময় বর্ণনার স্রোতে এই রোমান্টিক বিষাদও ভাসিয়া গিয়াছে। কবি প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,

সুধাময় প্রণয় তোমার,
জুড়াবার স্থান হে আমার ;
তব স্নিগ্ধ কলেবরে,
আলিঙ্গন দিলে পরে,
উলে যায় হৃদয়ের ভার।

যখন তোমার কাছে যাই,
যেন তাই স্বর্গ হাতে পাই,
অতুল আনন্দভরে,
মুখে কত কথা সরে,
আমি যেন সেই আর নাই।

নূতন রসেতে রসে মন,
দেখি ফের নূতন স্বপন,
পরিয়ে নূতন বেশ,
চরাচর সাজে বেশ,
সব হেরি মনের মতন।

এই "নূতন রস" প্রকৃতি-রস। বিহারীলাল এই রস উপভোগ করিয়া বাংলা কাব্যের নূতন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন ও পাঠকসমাজের নিকট এই রসোৎসবের নিমন্ত্রণলিপি পাঠাইলেন। 'বঙ্গসুন্দরী'তে রোমান্টিক কবিকল্পনার বপ্রক্রীড়া—মুহূর্তে মুহূর্তে নবরূপায়ণ—চিত্র হইতে চিত্রান্তরে স্বচ্ছন্দ বিহার। আনন্দ ও বিষাদের সুরে 'বঙ্গসুন্দরী'র পরিবেশ আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

'বঙ্গসুন্দরী'তে প্রকৃতিসৌন্দর্যসম্ভোগের জন্য কবির বাস্তব হইতে পলায়ন, মানস আত্মনিমজ্জন, প্রকৃতির সহিত একাত্মতায় উল্লাস ও বেদনা ও শেষ পর্যন্ত স্বপ্নাবিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। 'সারদামঙ্গল' (১৮৬৯) কাব্যে নিখিল সৌন্দর্যের রোমান্টিক বর্ণনা। এই কাব্যের প্রথম সর্গে চিত্রিত উষা বিহারীলালের সমগ্র কাব্যে সর্বাপেক্ষা সুঅঙ্কিত চিত্র। এই সৌন্দর্য চিত্রণে সংযম, সাংকেতিকতা, সূক্ষ্মতা লক্ষ্য করা যায়। কবির প্রকৃতি সম্পর্কে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি এখানে মিষ্টিক ভঙ্গিতে পরিণত হইয়াছে। নিসর্গ চিত্র অঙ্কনে বরাবরই বিহারীলাল কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বর্ণতূলিকার সংযম ও সূক্ষ্ম রেখাপাতে সাংকেতিকতার ইশারা প্রতিনিয়তই 'সারদামঙ্গল' কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। 'সাধের আসনে' (১৮৮৮) কবি বিশ্বসৌন্দর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর অন্বেষণ সমাপ্ত করিয়াছেন। কবি শেষ পর্যন্ত বুঝিয়াছেন, রহস্যময়তাই সৌন্দর্যের প্রাণ। এখানেই তাঁহার রহস্যানুসন্ধান সমাপ্ত হইয়াছে।

এই অন্বেষণের যাত্রাপথে কবি যে সকল নিসর্গ চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা রোমান্টিক কবিভাবনার উচ্চমার্গের ধ্যানলব্ধ রূপায়ন।

নিসর্গচিত্রের শিল্পী হিসাবে বিহারীলাল 'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসনে' আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিয়াছেন। মানবকল্পনার সমুদ্রতল হইতে উদ্ভূত সৌন্দর্যলক্ষ্মী সরস্বতীকে কবি নিখিলবিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে কল্পনা করিয়াছেন। তাই সারদামঙ্গলের সূচনায় যে উষার বর্ণনা, তাহা নিত্যনৈমিত্তিক উষা নহে; তাহা মানবের কবিত্বশক্তির উন্মেষের প্রতীক, তাই সে অনির্দিষ্ট, রহস্যের আলোছায়ায় ভরা। 'সারদামঙ্গলে' তাই মানবসৌন্দর্যের সহিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। এই উষা বর্ণনায় স্পষ্ট গভীর রেখার চিত্র নাই; আছে অস্পষ্ট আভাষ; এ চিত্র জ্যোতিঃপূর্ণ। 'সাধের আসন' কাব্যে 'যোগেন্দ্রবালা'র চিত্রাঙ্কনেও এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে। বিহারীলাল এই দুরূহ চিত্রাঙ্কনেও বিরল সাফল্য লাভ করিয়াছেন এবং নিসর্গ-চিত্রকার হিসাবে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই চিত্রাঙ্কনে ভাবের সহিত ভাষার গভীর অন্তরঙ্গতা লক্ষ্য করা যায়। দেবী সারদার রূপবর্ণনায় কবি প্রচলিত বর্ণনারীতি ত্যাগ করিয়া নূতন পথ গ্রহণ করিয়াছেন—আভাসে, ইঙ্গিতে, সূক্ষ্ম তুলির টানে, দুরূহ রেখাচিত্রণে কবি সারদার একটি জ্যোতিঃপূর্ণ চিত্রের অস্পষ্ট আভাষ দিয়াছেন। প্রকৃতি-বর্ণনায় কবি একটি মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানেই এই দুরূহ রীতি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বিহারীলাল প্রকৃতিকে একটা বিস্ময় এবং অর্ধপরিচয়ের রহস্যের সহিত যুক্ত করিয়া তাহাকে রোমান্টিক সরসতা দান করিয়াছেন। এই রোমান্টিক অনুভূতিতেই বিহারীলালের কাব্যজীবনের সাধনা শেষ হইয়া যায় নাই। 'সারদামঙ্গলে'র রোমান্টিক অনুভূতি 'সাধের আসনে' মিষ্টিক অনুভূতিতে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতির যে ইঙ্গিতগুলি কবিকে রহস্যময় বিস্ময়ের আনন্দ যোগাইত, সেগুলির পশ্চাতে তিনি এক অসীম সত্তার সন্ধান লাভ করিয়াছেন। জানা-অজানার, পরিচয়-অপরিচয়ের সকল রহস্য সেই অসীমের রহস্যের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গভীরতর সার্থকতায় মুক্তি লাভ করিয়াছে। এই অসীম সত্তাকে কবি 'সারদা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। অন্য কথায়, ইনিই নিখিলবিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদা। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য কবি ওঅর্ডসওঅর্থের উপলব্ধ প্রকৃতির কেন্দ্রস্থলের রহস্যময় সত্তার ন্যায় বিহারী-লালের সারদা কেবল কল্যাণী ও শান্তিময়ীই নন; ইনি সৌন্দর্যরূপে আমাদের মুগ্ধ করেন, প্রেমরূপে পবিত্র করেন, মঙ্গলরূপে বিধৃত করেন এবং জ্ঞানরূপে আমাদের হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিয়া তোলেন। এইখানে কেবল পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গিই একমাত্র অবলম্বন নহে। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির অধিকার বলে

সৌন্দর্য, আনন্দ ও জ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতির রহস্যটিকে কবি যুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

'সাধের আসন' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে একটি প্রকৃতিচিত্র উদ্ধার করিতেছি। ইহা হইতে বিহারীলালের ছায়াময় সাংকেতিক সূক্ষ্ম বর্ণ-তূলিকা ব্যবহারনৈপুণ্য প্রমাণিত হইবে। চিত্রটি গোধূলির।

সুশান্ত গোধূলি-বেলা!
ননীর পুতুলগুলি ভুলিয়াছে খেলাদেলা।
চেয়ে দেখ কুতূহলে
সূর্য যায় অস্তাচলে,—
কেমন প্রশান্ত মূর্তি, কোথায় চলিয়া গেল!
লাল নীল মেঘে মাখা,
কিরণের শেষ রেখা
আর নাহি জায় দেখা, আঁধার হইয়া এল।……
তিমিরে করিয়া স্নান
নিমগন দিনমান;
সীমন্তে সাঁজের তারা, মন্থরগামিনী,
বিরাম-আরামময়ী আসিছেন যামিনী॥

বিহারীলাল তাঁহার কাব্যজীবনের শেষ পর্বে আর একটি কাব্য রচনা করেন, তাহা 'শরৎকাল'। ইহা কয়েকটি নিসর্গ-চিত্রের সমষ্টি। মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা ও নিশীথের চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়া কবি তাঁহার প্রেমাবেগকে মুক্তি দিয়াছেন। এখানে সারদামঙ্গল-সাধের আসনের মতো অস্পষ্ট চিত্রাভাস নাই, আছে নিসর্গের শান্তরূপের বিস্তারিত বর্ণনা। 'মধ্যাহ্ন সংগীত' কবিতায় শান্ত নিস্তব্ধ উদার মধ্যাহ্নের যে চিত্র কবি আঁকিয়াছেন, তাহা সোনার তরী-চিত্রা-পর্বের নিসর্গ চিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'যেতে নাহি দিব', 'সুখ' প্রমুখ কবিতায় চিত্ররূপের সহিত ভাবরূপের দুরূহ সম্মিলন হইয়াছে; এখানেও তাহাই। অলস মধ্যাহ্নের উদার বিধুর রূপ ও করুণ সুর দুইই 'মধ্যাহ্ন-সংগীতে' বাঁধা পড়িয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই ধরণের নিসর্গ চিত্র বিহারীলালের সমগ্র রচনাতেই বিরল। 'সন্ধ্যাসংগীত' কবিতায় দেখি প্রকৃতি উপভোগের মধ্যেও একটি বেদনা আছে (রবীন্দ্রনাথে ইহার পূর্ণ বিকাশ ঘটে)—

চাহিতে আকাশ পানে
কি যেন বাজিছে প্রাণে,
কাঁদিয়া উঠিছে যেন তারা সমুদয়। (শরৎকাল)

ইহার সহিত তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের—

শান্ত হও, ধীরে কও কথা। ওরে মন
নত করো শির। দিবা হল সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী।.........
ক্রমে ঘনতর হয়ে নামে অন্ধকার,
গাঢ়তর নীরবতা—বিশ্বপরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হতে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন, ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর,
শূন্যপানে—"আরো কোথা! আরো কত দূর!"
('সন্ধ্যা'—চিত্রা)

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' প্রকাশিত হয়। প্রাক্-সারদামঙ্গল যুগে এই সংকলনটির মূল্য নিতান্ত কম নহে। হেমচন্দ্র মূলতঃ আখ্যায়িকা-কাব্যের কবি হইলেও গীতিকবিতা রচনার একটি প্রবণতা তাঁহার বরাবরই ছিল। নিসর্গ চিত্রণের ঝোঁকও তাঁহার ছিল। 'বীরবাহু' (১৮৬৪) কাব্যের ন্যায় আখ্যায়িকাকাব্যেও নিসর্গ চিত্রণে কবি অনেকটা শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন।

রোমান্টিক নিসর্গ কবিতার জন্য হেমচন্দ্রের তিনটি কবিতা-সংকলন দেখা প্রয়োজন।

(১) কবিতাবলী—প্রথম খণ্ড (১৮৭০), দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮০)
(২) বিবিধ কবিতা (১৮৯৩)
(৩) চিত্তবিকাশ কাব্য (১৮৯৮)

বাংলা গীতিকবিতার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র একটি নূতন সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইংরাজ কবিদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে হেমচন্দ্র একথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রাকৃতিক দৃশ্যকে আপনার মনের ভাবের সংস্পর্শে সজীব করিয়া তুলিতে পারিলে আধুনিক পাশ্চাত্য গীতিকবিতার সুরটিও তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। ঈশ্বর গুপ্ত চোখ খুলিয়া প্রত্যক্ষ বস্তুরূপে প্রকৃতিকে দেখিয়াছিলেন; আবেগ ও সরসতা না থাকায় সে দেখা শেষ পর্যন্ত বস্তুপুঞ্জের তালিকা ও ব্যাবহারিক জগতের সুবিধা-অসুবিধার এক দীর্ঘ বিরক্তিকর তালিকায় পর্যবসিত হইয়াছিল, একথা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। হেমচন্দ্রের প্রচেষ্টা ছিল প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের দিকে তাকাইয়া আপনার মনের ভাবকে উজ্জীবিত করিয়া তোলা। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন প্রকৃতির সহিত মানবমনের একটি যোগসূত্র আছে। 'কবিতাবলী'র অন্তর্গত 'যমুনাতটে' কবিতায় এই ভাবটি প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবকটি উদ্ধার করিলাম।

কে আছে এ ভূমণ্ডলে, যখন পরাণ
　　জীবন-পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,
যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্মশান
　　ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রায় অন্বেষণে,
তখন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী,
　　শান্ত নিশানাথ-জ্যোতিঃ বিমল আকাশে,
প্রশস্ত নদীর তট, পর্বত উপরি,
　　কার না তাপিত মন জুড়ায় বাতাসে।
কি সুখ যে হেনকালে, গৃহ ছাড়ি বনে গেলে,
সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে হুতাশে!

(দ্বিতীয় স্তবক)

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
　　বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন,
　　কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী?
কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলে
　　শমন করিয়া চুরি নিয়াছে যাহায়?
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জলে।
　　প্রাণের দোসর ভাই, প্রিয়ার ব্যথায়?
কেন বা উৎসবে মাতি থাকি কভু দিবা রাতি
　　আবার নির্জনে কেন কাঁদি পুনরায়?

(চতুর্থ স্তবক)

প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের সম্বন্ধ এরূপ স্পষ্ট করিয়া বাংলা কাব্যে ইহার পূর্বে বিহারীলাল ছাড়া আর কোথাও বলা হয় নাই। এই সম্বন্ধের সত্যতা হেমচন্দ্রের কবিমনে ধরা পড়িয়াছিল। তাই প্রকৃতির স্পর্শের মধ্যে ব্যথিত মনের সান্ত্বনাও তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন (দ্বিতীয় স্তবক দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু হেমচন্দ্রের প্রকৃতি-অনুভূতির যথেষ্ট গভীরতা ছিল না (অন্ততঃ বিহারীলালের মত নহে)। ফলে অনেক সময় প্রকৃতির সঙ্গে নিজের ভাব মিশাইতে গিয়া কবি শুধু ব্যর্থতার বোঝা বহিয়াছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে আপনার অন্তর্লোকে অভিসার তাঁহার প্রায়ই বিফল হইয়াছে। বাহির হইতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে তাঁহার মনোভাব জুড়িয়া দিয়াছেন মাত্র, অন্তরে অন্তরে মিলন হয় নাই। কবির সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিই ইহার কারণ।

‘কমল-বিলাসী,’ ‘অশোকতরু,’ ‘চাতকপক্ষীর প্রতি’ (কবিতাবলী); ‘কৌমুদী,’ ‘খদ্যোত,’ ‘ফুল,’ ‘সরিৎ—সময়,’ ‘কল্পনা,’ ‘প্রজাপতি,’ (চিত্তবিকাশ) এবং ‘গঙ্গা,’ ‘পদ্মফুল’ (বিবিধ কবিতা) ইহার উদাহরণ।

এগুলির মধ্যে 'গঙ্গা,' 'প্রজাপতি,' 'খদ্যোত' প্রভৃতি কবিতায় পুরানো সংস্কার কিছুটা বর্তমান আছে। 'অশোকতরু,' 'কৌমুদী,' 'কল্পনা', 'কমল-বিলাসী,' 'পদ্মফুল,' কবিতায় নূতনত্বের সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়।

অশোকতরুর কথা বলিতে বলিতে অতি-সচেতন কবি তাহার সহিত শেষ দিকে নিজের কথা জুড়িয়া দিয়াছেন—

তরু রে আমার মন তাপদগ্ধ অনুক্ষণ,
কেহ নাহি শোকানলে ঢালে অশ্রুধারা .
আমি তরু জগতের সুখদুখ হারা।

কোকিলের কুহস্বর শুনিয়া কবি তাহার সহিত নিজের দুঃখটি জুড়িয়া দিয়া লিখিলেন—

যে হাসিতে প্রভাকর উজলি গগন
প্রাবৃটের কাল ঘন করে প্রিয় দরশন
করে চারু গুল্ম, তরু, গহ্বর কানন।
তেমনি হাসিতে তুষ্ট কর বঙ্গজন!

পদ্মের একটি মৃণালকে সরোবরে ভাসিতে দেখিয়া কবির মনে যে ভাবের উদয় হইল তাহার সহিত তিনি নিজের চিন্তা জুড়িয়া দিলেন—

সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি ;
পদ্ম, জল, জলাশয় ভুলিয়া সকলি।
অদৃষ্টের নিবন্ধন ভাবিয়া ব্যাকুল মন
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি?

"ইহা প্রকৃতিকে নিজের মনের ভাব দিয়া দেখা নয়, ইহা নিজের মনের ভাবগুলিকে প্রকৃতির কয়েকটি ঘটনার উদাহরণের সাহায্যে ফুটাইয়া তোলা মাত্র।" ('কাব্যে রবীন্দ্রনাথ' : বিশ্বপতি চৌধুরী)।

হেমচন্দ্র যে প্রকৃতি-কবিতায় সচেতনভাবে ইংরাজী প্রকৃতি-কবিতার অনুসরণ করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় 'চাতক পক্ষীর প্রতি' কবিতায় ('কবিতাবলী')। এই কবিতাটি শেলীর 'To a Skylark'-এর অনুসরণে রচিত।

কিন্তু এই অনুবাদও যে অনুভূতির অগভীরতা ও আবেগের ক্ষীণতার জন্য সফলতা লাভ করে নাই, তাহা প্রথম দুইটি স্তবকের প্রতিতুলনায় প্রমাণিত হইবে।

হেমচন্দ্রের—

কে তুমি রে বল পাখী,
সোনার বরণ মাখি,
গগনে উধাও হয়ে,
মেঘেতে মিশায়ে রয়ে,

এত সুখে সুধামাখা সঙ্গীত শুনাও ?
বিহঙ্গ নহ ত তুমি ;
তুচ্ছ করি মর্ত্ত্যভূমি
জ্বলন্ত অনল প্রায়
উঠিয়া মেঘের গায়,
ছুটিয়া অনিল পথে সুস্বর ছড়াও।

('চাতকপক্ষীর প্রতি')

শেলীর—

Hail to thee, blithe Spirit !
Bird thou never wert,
That from heaven, or near it,
Pourest thy full heart
In profuse strains of unpremeditated art.

Higher still and higher
From the earth thou springest
Like a cloud of fire ;
The blue deap thou wingest,
And singing still dost soar, and soaring ever singest.

('To a Skylark')

শেলীর অবিমিশ্র আদর্শবাদ—অসীমের উপলব্ধি তাঁহার কবিতাটিতে মূর্ত হইয়াছে। ছন্দের হ্রস্ব প্রসার ও ক্ষিপ্র গতিতে উপমার মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনে ও সুরের তীক্ষ্ণ মর্মভেদী মূর্চ্ছনায় পাখীর আকাশ-বিহারের তীব্র প্রেরণা ও তাহার দ্রুত অশান্ত পক্ষ-বিধূনন আশ্চর্যরূপে ধ্বনিত হইয়াছে।

শেলীর পাখী মাটির সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া আকাশমার্গে উধাও হইয়াছে ; সূর্যাস্তের বর্ণপ্লাবনে স্নান করিয়া তাহার আভা রঞ্জিত মেঘপুঞ্জে বিলীন হইয়া মাটির চিহ্ন সম্পূর্ণভাবে লোপ করিয়াছে। স্কাইলার্কের গান অগ্নিস্তম্ভের ন্যায় ভাস্বর। রজত-শুভ্র জ্যোৎস্নাধারার ন্যায় সর্বপ্লাবী ; আবার প্রভাতম্লান চন্দ্রকিরণের ন্যায় চোখের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াও অনুভূতিতে অলক্ষ্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠ। শেষ পর্যন্ত কবি অনুমান করিয়াছেন যে জীবনমৃত্যুর যে চিরন্তন রহস্য মানবের চিন্তাধারাকে ব্যাহত ও তাহার গানকে আকস্মিক ও ছেদবহুল করে, স্কাইলার্ক কোনো অলৌকিক উপায়ে সেই রহস্যের মর্মভেদ করিয়াছে। এই পাখীকে উপলক্ষ্য করিয়াই শেলীর সমস্ত ব্যাকুল আত্মজিজ্ঞাসা, ব্যর্থ আদর্শানুসরণের সমস্ত অশান্ত চিত্তবিক্ষোভ মুক্তিলাভ করিয়াছে।

হেমচন্দ্রের কবিতায় কিন্তু কোনো চিত্তবিক্ষোভের পরিচয় পাই না।

কোনো অশান্ত আত্মজিজ্ঞাসায় তাঁহার কবিচিত্ত পীড়িত হইয়াছে, তাহা কবিতাপাঠে মনে হয় না। আসল কথা হেমচন্দ্রে আবেগের ক্ষীণতা ও অনুভূতির অগভীরতা ছিল। তাহা সত্ত্বেও 'যমুনাতটে' কবিতায় যে তিনি প্রকৃতি ও মানবমনের একটি সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহার জন্য তিনি বাংলা প্রকৃতি-কবিতার ক্ষেত্রে একটি স্থান দাবী করিতে পারেন। সংস্কারবদ্ধ দৃষ্টির অস্বচ্ছতা, সরসতার অভাব ও অনুভূতির অগভীরতা প্রকৃতি ও তাঁহার অন্তর্লোকের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। এই ব্যর্থতাকে মানিয়া লইলেও হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না।

নবীনচন্দ্রও প্রধানত মহাকাব্যজাতীয় রচনায় আপনার প্রতিভা প্রকাশের পথ খুঁজিয়াছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার কবিদৃষ্টিতে সরলতা ছিল বেশি, তাই হেমচন্দ্র অপেক্ষা প্রকৃতি-কবিতার ক্ষেত্রেও নবীনচন্দ্রের সফলতা বেশি। প্রাচীন আলংকারিক রীতিতেও যখন নবীনচন্দ্র প্রকৃতির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন, তখনও এই সরস দৃষ্টি তাঁহার কাব্যকে অনেক পরিমাণে সংস্কারমুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার প্রকৃতি-বর্ণনায় মাঝে মাঝে নির্বাচনরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই রুচির অভিব্যক্তিতে কবির নিরাবরণ চিত্তটি পাঠকের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে এবং নবীনচন্দ্রের প্রকৃতিবর্ণনায় আত্মলীন দৃষ্টি কিছুটা আসিয়া গিয়াছে। তবে এই দৃষ্টি কখনোই স্বপ্রতিষ্ঠ হয় নাই। এই আভাসের স্পষ্টতা বিহারীলালের কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়।

প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করিতে গিয়া হেমচন্দ্রের ন্যায় নবীনচন্দ্রও ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ তথা সমাজ রাষ্ট্র ইত্যাদির সহিত সম্পর্কের বিচিত্র চিন্তার মধ্যে তলাইয়া গিয়াছেন। তবে প্রকৃতিবর্ণনায় দৃশ্যসংস্থানে সজীবতা নবীনচন্দ্রের কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে তিনি হেমচন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এখানে তিনি বিহারীলালের সমগোত্রীয়। তবে একটী কথা অনস্বীকার্য। নবীনচন্দ্রের কাব্যে ভাবাবেগ অপেক্ষা ভাবাতিরেক প্রায়শঃই লক্ষ্য করা যায়। এই ভাবাতিরেকের জলাভূমিতে কোন বস্তুরই দৃঢ় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। সেই জন্য প্রকৃতিবর্ণনাও দানা বাঁধিতে পারে নাই।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র উভয়ের কবিতাতেই মানবমনের সহিত প্রকৃতির অনির্দেশ্য সম্পর্ক, প্রকৃতির স্পর্শে ব্যথিত মানবহৃদয়ের সান্ত্বনা-অন্বেষণ, অতি শৈশবে প্রকৃতি-উপভোগের স্মৃতিবেদনায় বর্তমান অতৃপ্তি লক্ষ্য করা যায়।

হেমচন্দ্রের মত নবীনচন্দ্রও প্রকৃতি-কবিতায় নিজের মনের ভাব বাহির হইতে জুড়িয়া দিতেন। 'সায়ংচিন্তা' কবিতায় ইহার পরিচয় মিলিবে। কবি সন্ধ্যাকালে—

সুশীতল সন্ধ্যানিলে জুড়াতে জীবন,
ডুবাতে দিবস-শ্রম বিস্মৃতি-সলিলে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে উঠিলাম গিরিশিরে
বাসনা, জুড়াতে স্রোতঃসম্ভূত অনিলে,
কার্য-ক্লান্ত কলেবর সন্তাপিত মন।

সেখানে উঠিয়া সংস্কারের চোখে প্রকৃতিকে দেখিলেন—

রজনীর প্রতীক্ষায় প্রকৃতি-সুন্দরী
ললাটে সিন্দুরবিন্দু পরিল তখনি।

প্রকৃতিতে জীবন আরোপের সনাতন প্রথা কবি গ্রহণ করিয়াছেন, 'আপন মনের মাধুরী' মিশান নাই। তারপর কবি নিজের কথা বলিবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। কবিতায় এক রাখাল-শিশুকে আমদানী করিলেন—

নিরুদ্বেগে তরুতলে, তটিনীর কলকলে,
গাইছে রাখাল-শিশু মধুর গায়ন,—
নাহি কোন চিন্তা, নাহি ভবিষ্যৎ ভয়।

তারপর রাখাল-শিশু যে সমাজ রাষ্ট্র ধর্মনীতি সম্পর্কে কিছু জানে না তাহার দীর্ঘ বর্ণনা এবং তাহাকে যে 'চিন্তা কাল-ভুজঙ্গিনী করে না দংশন' সে কথা কবি বলিয়াছেন। এই রাখালকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি নিজ জীবনের যত কিছু চিন্তা অভাব-অভিযোগ সুখ-দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাকে দেখিয়া তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—

আমিও ইহারি মত ছিলাম সুন্দর,
ছিলাম পরম সুখে সুপ্রসন্ন মনে—

ইত্যাদি চিন্তার পর ভারতের দুর্দশায় বিলাপ করিয়া প্রকৃতি-কবিতার অপমৃত্যু ঘটাইয়া কবি ক্ষান্ত হইলেন।

এই কবিতা নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যের (১৮৭১।৭৭) অন্তর্গত। কিন্তু এই কাব্যেই এমন কয়েকটি নিসর্গ-চিত্র পাই যাহা সরস ও মধুর। যেখানে আপন মনের মাধুরী মিশিয়াছে সেখানে কবির বিশিষ্ট মেজাজ প্রকাশ পাইয়াছে।

কে তুমি' কবিতায় রমণীর রূপবর্ণনা—

যেন নিদাঘের আকাশ হইতে
একটি নক্ষত্র সরোবর ঘাটে
পড়েছে খসিয়া।

ইহার সহিত তুলনীয় ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের

A violet by a mossy stone
Half-hidden from the eye!

—Fair as a star, when only one
Is shining in the sky.

ওঅর্ডস্ওঅর্থের বর্ণনায় যে সূক্ষ্ম কোমল পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়, তাহা নবীনচন্দ্রের বর্ণনায় নাই। তথাপি বর্ণনায় অভিনবতা ও সজীবতা লক্ষ্য করা যায়। এই সজীবত্ব ও সরসতার জন্যই নবীনচন্দ্রের কয়েকটি বর্ণনা অদ্যাবধি আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

তৎকালীন কবিদের মত নবীনচন্দ্র এই সকল সজীব নিসর্গ-চিত্রে গোটাকতক বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য পাশাপাশি জুড়িয়া দেন নাই। দৃশ্য-সমাবেশের মধ্যে সতর্ক নির্বাচন ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। নিসর্গ-কবিতায় সংগীত নবীনচন্দ্রই আনিয়াছিলেন। ইহার উদাহরণ,

কভু তুঙ্গ শৃঙ্গে উঠি প্রফুল্লিত মনে,
দেখিতাম বিশ্বছবি সায়াহ্ন-পবনে।
দোলায়ে বসন্ত-লতা বহিত পবন,
মর্মরিত পত্রকুল, জুড়াত জীবন।
গাইলে বিহঙ্গকুল বসিয়া আবাসে,
গাইতাম, তোমা, নাথ! মনের উল্লাসে
দেখিতাম দূর-নদী রবির প্রভায়,
জন্ম-ভূমি-কণ্ঠমূলে স্বর্ণ-রেখা প্রায়।
অতিদূরে আম্রবন, স্রোতস্বতী-তটে।
চিত্রবৎ দেখাইত আকাশের পটে।

('একটি চিন্তা')

রূপকাত্মক নিসর্গ বর্ণনা আছে 'পিতৃহীন যুবক' কবিতায়। প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপ লক্ষ্য করা যায় 'পিতৃহীন যুবক' কবিতার সূর্যোদয়-বর্ণনায়, 'কীর্তিনাশা,' 'শশাঙ্ক-দূত,' 'অশোকবনে সীতা,' 'বুড়ামঙ্গল' কবিতায়। অনুভূতিশীল নিসর্গ-বর্ণনা আছে 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী' কবিতায়।

অনুভূতিশীল নিসর্গের বর্ণনা এইরূপ :

প্রাণনাথ! অশ্রুবারি পড়ি ধরাতলে,
শোভিছে শিশির সম দূর্বার আগায়।
আর কত বিন্দু নাহি পড়িতে ধরায়,
কোথায় উড়িয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের বলে
যাইতেছে নাহি জানি হেন মনে লয়।……
একতানে ঝাউগণ স্বনিয়া স্বনিয়া
গাইতেছে সুললিত সঙ্গীত সুন্দর।……
দুই-এক অশ্রু-বিন্দু পাষাণে ঝরিয়া
শোভিল পঙ্কজভ্রষ্ট নীহার পাতায়।

('পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী'

প্রত্যক্ষ খণ্ড প্রকৃতিদৃশ্যসমূহকে সামগ্রিক ও ভাবসংহতিপূর্ণ চিত্ররূপ দানের ক্ষমতা নবীনচন্দ্রের ছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে (১৮৭৫) যে প্রকৃতি-চিত্র পাই, তাহা পৃথক আলোচনা দাবি করে। এই সার্থক রূপক-কাব্যে কবিকল্পনাকে একটি স্বতন্ত্র মহিমা দান করা হইয়াছে। রোমান্টিক কবিকল্পনার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, বাংলা কাব্যে তাহা প্রথম এই কাব্যেই দেখা গেল। বিহারীলালের 'সারদা' ও রবীন্দ্রনাথের 'কবিকল্পনালতা'র অগ্রদূতী 'স্বপ্ন প্রয়াণে'র 'কল্পনা'। এই রূপক-কাব্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ যে রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রকৃতি-বর্ণনা তাহাতে পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছে। এই জন্যই স্বপ্নপ্রয়াণের প্রকৃতি-বর্ণনা আমাদের মনোযোগ দাবি করে।

এই মন্তব্যের পরিচয় স্বরূপ 'নন্দনপুর প্রয়াণ' শীর্ষক দ্বিতীয় সর্গের মায়াটবী বর্ণনার খানিকটা উদ্ধার করিতেছি :

যথায় মহাবট, শিরে জট, অতি নিবিড় ;
পালিছে চুপে চাপে, খোপে খাপে, অযুত নীড়॥
নমনা নামি' নামি' ঊর্দ্ধগামী হইয়া উঠি'
বহে বিপুল ভার ; অন্ধকার করে ভ্রূকুটি ॥১১৯॥

যে দিকে আঁখি যায়, ছায়ে ছায় সকল ঠাঁই।
ঝিলিলি ছাড়ে বোল উতরোল বিরাম নাই॥
হোতায় তালগাছে রহিয়াছে গগন ঢাকা।
আলসে ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া ঢুলিছে শাখা॥১২০॥

হেতায় ঝরঝর, ঝর ঝর, ঝরণা ঝরে।
পাদপ, মর মর, মর মর শব্দ করে॥
কি জানি, কোথা হ'তে, বায়ু পথে, আসিছে গীত ;
বীণার ঝঙ্কার, হয় আর আচম্বিত॥১২১॥

এই প্রকৃতি বর্ণনার স্বাতন্ত্র্য ও সারল্য প্রথানুগত চিত্রণের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম রূপেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

অপ্রধান কবিদের প্রকৃতি-কবিতা

নবীনচন্দ্রের সমসাময়িক হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী তাঁহার 'বিনোদমালা' (১৮৭৮) ও 'মালতীমালা' (১৮৯৯) কাব্যে সজীব প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রকৃতিতে মানবতা-আরোপিত নিসর্গ বর্ণনায় নবীনচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র উভয়েই মধুসূদনের অনুগামী ছিলেন। সেইজন্য এই ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ গীতিরস তাঁহাদের প্রকৃতি-কবিতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই।

মধুসূদনের 'বিজয়া দশমী' সনেটে—

যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি এ পরাণ যাবে!—
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।

নবীনচন্দ্রের 'শশাঙ্ক-দূত' (অবকাশরঞ্জিনী) কবিতায়—

কোথা যাও শশধর! ফিরিয়া দাঁড়াও
অভাগার গোটা কত কথা শুনে যাও।
এই 'নব গঙ্গাতীরে' এই তরুতলে,
গাইব দুঃখের গীত ভাসি অশ্রুজলে।

ইহার সহিত তুলনীয় হরিশ্চন্দ্রের 'যামিনীর প্রতি' (বিনোদমালা) কবিতার আবেদন—

কোথা যাও অয়ি নিশি শ্যামলবরণে!
খুলিয়া ললাট মণি
হিমাংশু রজতখনি;
যেও না যেও না দেবি মিনতি চরণে।......
যেও না রজনী তবে সুশ্যামা সুন্দরী!
ফুলময়ী যামিনীরে
স্থির প্রবাহিনী-নীরে
তুলো না আবার দেবি চপল লহরী।
ডুবো না অস্তিমাচলে, দেব শশধর!
সুনীল আসনে বসি
হাস মৃদু তুমি শশী
হাসাইয়া কুমুদীরে, বিশ্ব চরাচর।

হরিশ্চন্দ্রের প্রতিভার স্ফূর্তি হইয়াছে পরে 'মালতীমালা' কাব্যে। নিসর্গসুন্দরীর পুষ্পাভরণসজ্জিতা রূপে কবি মুগ্ধ হইয়া অপূর্ব চিত্রসমৃদ্ধ যে কবিতাগুলি লিখিয়াছেন সেগুলি তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক। এ কাব্যের 'অকাল কুসুম' কবিতায় কবির অভিজ্ঞতা পরিপক্বতর, রূপকর্ম ত্রুটিহীন:

এ অকালে কেন আজি বল গো প্রকৃতিবালা!
পরালে এ কুঞ্জ কণ্ঠে এ নব কুসুমমালা?
এখনো শারদ শেষে
হিমানী আসেনি দেশে
রূপসী মুক্তার মালা না ছিঁড়িতে দূর্বাদলে
এ ফুলে এ কুঞ্জ কেন সাজাইলে কুতূহলে?......

অচল-বিজলী-সম এস মা কমলেশ্বরি !
তরল-রজত-রূপে নীলাম্বর আলো করি ;
দেখ দেবি, প্রাণ খুলে
ও রাঙা কুসুম তুলে,
অকালে পূজিব আজি চরণ কমলামল।
উপহার দিয়ে মাগো গলিত নয়ন-জল !

প্রকৃতিদেবীর আন্তরিক আবাহনেই এই কবিতার সমাপ্তি। প্রকৃতিকে সজীব দেবীপ্রতিমারূপে চিত্রণে হরিশ্চন্দ্র বিরল সাফল্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।

এই সাফল্যের গৌরব আরো বাড়ে যদি সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের নিসর্গ-বর্ণনার সহিত ইহার তুলনা করি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসন্তী পদাবলী' কবিতা ('কাব্যমালা'। রচনা: ১৮৮০-১৯০০। প্রকাশ ১৯২০) বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের অনুসরণে ঋতুরাজ বসন্তের মোহন রূপের বর্ণনা মাত্র; অক্ষয় চৌধুরীর 'বসন্তের উদয়' বর্ণনা ('উদাসিনী' ১৮৭৪), কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'বৈকালিক ঝড়', 'পাপ-কেতকী', 'শারদ-তরঙ্গিনী', 'রজনী' প্রভৃতি কবিতায় পাই গতানুগতিক প্রাচীন ধারানুসারী ঋতু ও প্রকৃতি-বর্ণনা মাত্র।

প্রকৃতিতে নীতি-আরোপপ্রবণতা কৃষ্ণচন্দ্রে বহুল পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতিকে নীতি প্রচারের বাহন করায় বর্ণনার সজীবতা নষ্ট হইয়াছে। 'পাপ-কেতকী' কবিতাটি এই বর্ণনার ব্যর্থতাই প্রমাণ করে:

একদিন ধীরে ধীরে মনের উল্লাসে
উপনীত কেতকী কুসুম শ্রেণী পাশে।
হেরিলাম কত শত শত মধুকর,
সুসৌরভে হয়ে তারা বিমুগ্ধ অন্তর,
মধুপূর্ণ কমল করিয়া পরিহার,
মধু আশে কেতকীতে করি হে বিহার,
কিন্তু মধু কোথা পাবে সে কেতকী ফুলে !
শুধু হয় ছিন্নপক্ষ কণ্টকের হুলে।
তথাপি সে বিমূঢ় অবোধ অলিগণ,
উড়িয়া কমলদলে না করে গমন।
ভাবিলাম এইরূপ মানব সকল,
ত্যজি পরিমলপূর্ণ তত্ত্ব-শতদল ;
সুখ-সুধা আশে সদা প্রফুল্ল অন্তরে,
বিষয়-কেতকীবনে অনুক্ষণ চরে।
কোথা পাবে সে অমিয় ব্যর্থ অকিঞ্চন,
সার দুঃখ কণ্টকের যাতনা ভীষণ।

তবু তত্ত্ব-সরসিজে না করে বিহার,
ধিক্ রে মানব তোরে ধিক্ শতবার।

হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের ন্যায় কৃষ্ণচন্দ্রও এই ভাবে প্রকৃতিতে নীতি আরোপ করিয়াছিলেন।

মহিলা-কবিদের কয়েকজনের প্রকৃতিকবিতায় এই নীতি-আরোপ প্রথার অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের 'গোলাপফুল' কবিতাটি ('বনপ্রসূন' ১৮৮২) ইহার অন্যতম উদাহরণ। কবি প্রথমে গতানুগতিক বর্ণনা দিয়াছেন—

দেখ দেখ চেয়ে দেখ গোলাপ-সুন্দর,
কিবা চমৎকার শোভা, কেমন মোহন আভা!
অল্পফুলে উপবন হয় মনোহর ;
দেখিলে গোলাপ ফুল জুড়ায় অন্তর।

শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন—

এতেক সদ্‌গুণ যেবা ধরে একাধারে,
তার (ও) এবে হায় হায়! বয়সে আদর যায়।
বাসি হ'লে কেহ নাহি ছোঁয় গোলাপেরে ;
অভিমানে পাতাগুলি যায় সব ঝরে।

বিরাজমোহিনী দাসীর 'মধ্যাহ্নকালের সূর্য' কবিতাও ('কবিতাহার' : ১৮৭৬) তাহাই—

মরি কি মধ্যাহ্নকালে প্রখর তপন!
হেরে হেন বোধ হয় যেন অগ্নিরাশি ;
ব্যাপিয়াছে চতুর্দিকে সবেগেতে আসি,
পোড়াইতে করেছে মনন।

শেষে নীতি প্রচার—

হে প্রচণ্ড দিবাকর, তব এ কিরণ,
সদাকাল সমভাবে রহি এ প্রকারে,
পারে কি সকল জীবে দগ্ধ করিবারে?
জানিহ সম্ভব তাহা নহে কদাচন।

আবার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'জলে ফুল' কবিতায় ('কবিতা-পুস্তক' : ১৮৭৮) এই নীতিপ্রচারপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায় :

কে ভাসাল জলে তোরে কানন-সুন্দরি!...
একাকিনী ভাসি যাও, কোথায় অবলে!
তরঙ্গের রাশি রাশি, হাসিয়া বিকট হাসি,
তাড়াতাড়ি করি তোরে খেলে কুতূহলে?
কে ভাসাল তোরে ফুল কাল নদীজলে!

শেষে,—

কে ভাসাল তোরে ফুল, কে ভাসাল মোরে !
কাল স্রোতে তোরই মত, ভাসি আমি অবিরত,
কে ফেলেছে মোরে এই তরঙ্গের ঘোরে ?
ফেলিছে তুলিছে কভু, আছাড়িছে জোরে !
তুই যাবি ভেসে ফুল, আমি যাব ভেসে।
কেহ না ধরিবে তোরে, কেহ না ধরিবে মোরে,
অনন্ত সাগরে তুই, মিশাইবি শেষে।
চল যাই দুইজনে অনন্ত উদ্দেশে।

আসল কথা, প্রকৃতিতে নীতিআরোপ ও তুলনায় মানবজীবনের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়া প্রাণহীন প্রকৃতি-কবিতা রচনা তখনকার দিনে চলিত 'ফ্যাশন' ছিল। এই 'ফ্যাশন' ইহাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃতি এই সব কবিদের নিকট জীবন্ত প্রত্যয় হইয়া উঠে নাই ; কাব্যরচনার অবলম্বন মাত্র ছিল। নিসর্গ-চেতনা দেখা দিয়াছে অন্য কবিদের লেখায়।

যে সকল অপ্রধান কবির নিকট প্রকৃতি নিতান্ত বর্ণনীয় বস্তু না থাকিয়া জীবন্ত, প্রত্যক্ষ ও সরস হইয়া উঠিয়াছে, এইবার তাহাদের কথা আলোচনা করিব। এই আলোচনায় দেখা যাইবে, প্রকৃতি-বর্ণনায় বাঙালি কবিরা এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রকৃতি-বর্ণনায় এবার রোমান্টিক কবিভাবনার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়াছে। প্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গতার ফলে কবিমনে রোমান্টিক বিষাদ ও উদাস বিরহের স্পর্শ লাগিয়াছে। এই রোমান্টিক বিষাদ সকল প্রকৃতি-কবিতাতেই লক্ষ্য করা যায়। বিহারীলালের 'শরৎকাল' কাব্যের 'সন্ধ্যাসংগীত' কবিতায় ইহার সূচনা। সরোজকুমারী দেবীর 'হাসি ও অশ্রু' (১৮৯৪) কাব্যের অন্তর্গত 'মধ্যাহ্ন' কবিতাটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়—

কেমন হয়েছে প্রাণ অলস আবেশে
যেন কি স্বপন ঘোর ছাইতেছে এসে।
বিষণ্ণ অবশ প্রাণে যেন কি করুণ তানে
বিশ্বের রাগিণী আজি যাইতেছে মিশে।

সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির অব্যক্ত বেদনা আজ কবিহৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে। অলস মধ্যাহ্নে শৈশবস্মৃতিচারণান্তে কবি তাই বিষাদের সুরে গাহিয়াছেন—

আজ তটিনীর তীরে রয়েছি একেলা।
সুদীর্ঘ জীবন আজি কতই নিরালা।
এ প্রবাস যেন মোর দিতেছে যাতনা ঘোর
কি সুদীর্ঘ মনে হয় এ দুপুর বেলা।

অধীর হৃদয় আজি ঘুঘুর ও গানে,
তটিনী কি গাথা যায় আজি মধু তানে !
বহিছে শীতল বায় আমার হৃদয় হায় !
কি আবেশে অলসিত হয়েছে কে জানে !

রবীন্দ্রনাথের শৈশবসংগীত-সন্ধ্যাসংগীত পর্বের কবিতায় ইহার সুস্পষ্ট প্রতি-ধ্বনি শোনা যায়।

প্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গতায় বাঙালি কবি যে আরো অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ বিনয়কুমারী ধরের 'রাত্রির প্রতি রজনীগন্ধা' কবিতাটি (১৮৯৩ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় চৈত্র, ১৩০০-সংখ্যায় প্রকাশিত)। রাত্রির জন্য রজনীগন্ধার ব্যাকুলতার চিত্রে কবি এখানে প্রকৃতির উপর মানবত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু এই মানবত্ব আরোপ কৃত্রিম নহে, ইহা আন্তরিক আকুলতাকে প্রকাশ করিয়াছে। এ সেই 'The desire of the moth for the star'.

রাত্রির প্রতি আবেদন—

বারেক দেখিয়া যাও, ওগো মহা অন্ধকার !
পদতলে বনপ্রান্তে ফুরায় জীবন কার ?···
আনন্দে উঠিনু ফুটে, তোমারি পূজার তরে
সমস্ত হৃদয় দেহ যৌবনে উঠিল ভরে !
সব গন্ধ সব মধু তব তরে লয়ে বুকে,
অপূর্ব পুলকে আমি চাইনু তোমার মুখে।
শত লক্ষ এই তারা-খচিত নীলিমাসনে
যখন বসিলে তুমি প্রশান্ত গম্ভীরাননে ;
যোগ্য অধিপতি জেনে আপনাকে সমর্পিয়া
ধরণী চরণতলে পড়ে তব ঘুমাইয়া।······
শেষ সুবাসিত শ্বাস প্রণয়ের উপহার,
দিতেছি অন্তিমে ; ওগো, এ নিশ্বাসে অনুক্ষণ,
স্নিগ্ধ রহে যেন তব শূন্য অন্ধকার মন।

রাত্রি এখানে মুগ্ধা প্রণয়িনীর সমস্ত ব্যাকুল বেদনা লইয়া মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রকৃতিতে মানবিক আবেগ ও উত্তাপ সঞ্চারে কবি বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। এই সাফল্যের আরেকটি উদাহরণ পঙ্কজিনী বসুর 'সূর্যমুখী' কবিতাটি ('স্মৃতিকণা' ১৯০২)—

চাহ নাকো প্রতিদান,
নাই মান, অভিমান,
মন কথা কয় বুঝি আঁখি সনে থাকি ?
নীরব প্রণয় তব একি সূর্যমুখি ?

কেমন নির্লজ্জ মেয়ে ;
তবু তার পানে চেয়ে
প্রত্যাখ্যান, অপমান সকল উপেখি,
'জগতের হিত তরে
মোর প্রিয় প্রাণ ধরে
কেমনে আমার হবে' ;—তাহাই ভাব কি ?

সরলাবালা সরকারের 'নির্ঝরের আত্মসমর্পণ' ('প্রবাহ' ১৯০৪) কবিতাটি প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপের একটি জীবন্ত চিত্র,—

অতি দূর পর্বত-শিখর,
গিরি যেথা ঢাকে মেঘ জালে,
নিভৃত আঁধার গুহা-কোলে
নির্ঝরিণী ছিল শিশুকালে,
দিন যত যায় দিনে দিনে,
কি যে চিন্তা উঠে তার মনে,
একা একা কুল কুল স্বরে,
গান গাহে কারে মনে করে।...
যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে,
নির্ঝরিণী ছুটে চলে আসে,
কোথা শিলা বাধা দেয় পথে,
ভ্রুক্ষেপ নাহি তা'র তা'তে ;...
পর্বতের শিখর হইতে
ছুটে এসে শিলাময় পথে
ক্ষীণ স্রোতা নির্ঝরিণী এক
ঝাঁপায়ে পড়িল খর স্রোতে।

স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁহার 'কবিতা ও গানে' (১৮৯৫) যে কয়টি নিসর্গ চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে তিনি অনুভূতিশীল নিসর্গের বর্ণনা দিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত আন্তরিক গভীর একাত্মতা বোধ করার পরই এই অনুভূতিশীল নিসর্গচিত্ত রচনা সম্ভবপর। ঐ সময়ে স্বর্ণকুমারী এই দুরূহ পথে বিরল সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

'শারদ-জ্যোৎস্নায়' ও 'বসন্ত-জ্যোৎস্নায়' কবিতা দুইটি ইহার পরিচায়ক। প্রথম কবিতায়—

শরতের হিম জ্যোছনায়
নিশীথিনী আকুল নয়নে চায়,
বহুদিন পরে যেন পেয়েছে প্রণয়ীজনে
অশ্রুর লহরী মাখা সুখের আলোক ভায় !...

ও ছায়া কাহার ছায়া? ও মূরতি কার মায়া?
চিনিতে পারিলে? যেন চিনি চিনি মত করি!
আকুল ব্যাকুল প্রাণ ধরিবারে আগুয়ান।
যতই ধরিতে যাব ধীরে ধীরে যায় সরি!

এই শারদ জ্যোৎস্নায় "তাই প্রাণ কেঁদে ওঠে বুঝি এ সময়!" 'শারদ-জ্যোৎস্নায়' ব্যাকুল ক্রন্দন, 'বসন্ত-জ্যোৎস্নায়' আকুল পিপাসা—

জোছনা হসিত নিশা, বসন্ত পুরিত দিশা,
প্রকৃতি নয়নে ঘুম ঘোর;
কুসুম সুবাস হিয়া উঠিতেছে উছলিয়া,
চাঁদ পানে চেয়ে ভাবভোর!
উদাস মলয় বায় আনমনে বহে যায়,
প্রাণে মেশে প্রাণের পিয়াস;
সে মধু পরশ লাগে, তটিনী চমকি জাগে,
ধীরে বহে সুখের নিশ্বাস।
তাই, মধুর স্বপন বেশ, মধুর স্বপন দেশ,
সংগীতের মধুর উচ্ছ্বাস;
বিহ্বল চাঁদিনী নিশি, বিহ্বল বাসন্তী দিশি,
প্রাণে জাগে আকুল পিয়াস!

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি অপ্রধান কবিরাও প্রকৃতির বিভিন্ন রাগিণী আপন কাব্যবীণার তারে বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র-হেমচন্দ্রের প্রকৃতিকে মানবিক ধর্মে সমৃদ্ধ করিয়া, তাহাকে অনুভূতিশীল জীবন্ত চরিত্রে পরিণত করিয়া এই কবিরা প্রকৃতি-কবিতারাজ্যে নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

প্রধান কবিদের প্রকৃতি-কবিতা

ইহার পর উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান কবিদের প্রকৃতি-কবিতা আলোচনা করিব। ইহারা হইতেছেন—দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রেমকবিতার মত প্রকৃতি-কবিতাও রূপকর্ম ও প্রসাধনের দিক দিয়া ক্রটিহীন। প্রেমকবিতায় দেবেন্দ্রনাথ যে ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ইন্দ্রিয়-সচেতনতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতি-কবিতায়ও লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতির জলন্ত উগ্র স্পষ্ট চিত্র অঙ্কনে তাঁহার স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। আধ-আলো-ছায়াময়ী সন্ধ্যা ও রহস্যরূপিণী জ্যোৎস্না-নিশীথিনী যেমন অক্ষয় বড়ালের কল্পনার অনুকূল, দেবেন্দ্রনাথের কল্পনা তেমনি চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্র-মদিরা পানে বিভোর—অশোকের রঙে, চম্পকের সৌরভে, গোলাপের

রক্তরাগে মাতিয়া উঠে। (দ্রঃ মোহিতলাল মজুমদার—'আধুনিক বাংলা সাহিত্য'।) দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি-কবিতায় উদ্বেল বর্ণবিলাস লক্ষ্য করা যায়।

বৈশাখের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি উদাস নির্লিপ্ত রুদ্র সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিলেন ; তিনি বৈশাখকে আহ্বান করিয়াছিলেন এই বলিয়া,

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি পিনাক করাল
কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।

('বৈশাখ', কল্পনা)

দেবেন্দ্রনাথের বৈশাখ-আহ্বান :

কপালে কঙ্কণ হানি' মুক্ত করি চুল
বাসন্তী যামিনী আহা কাঁদিয়া আকুল !
স্বামী তার চৈত্রমাস অনঙ্গের মত,
দক্ষিণে ঈষৎ হেলি' জানু করি নত
কার তপ ভাঙ্গিবারে করিছে প্রয়াস ?
রুদ্রের মূরতি ও যে !—এ কি সর্বনাশ !
ললাটে অনল হের ধক্ ধক্ জ্বলে !
সর্বাঙ্গে বিভূতি-ভস্ম মাখি' কুতূহলে
তপে মগ্ন—চিনিলে না বৈশাখ-দেবেরে ?
হে চৈত্র ! এ নিশি-শেষে, নিয়তির ফেরে
হারাইলে প্রাণ আহা ! নাশিতে জীবন
রোষান্ধ বৈশাখ ওই মেলিল নয়ন !
দিগঙ্গনা হাঁকি ডাকে—"কি কর কি কর !"
নব উষা বলে "ক্রোধ সম্বর সম্বর !"
কোকিল ডাকিল মুহু করিয়া মিনতি !
সম্ভ্রমে অশোক-পুষ্প করিল প্রণতি !
বৃথা ! বৃথা ! বৈশাখের দু'চক্ষু হইতে
নিঃসরিল অগ্নিকণা বেগে আচম্বিতে !
ভস্ম হ'ল চৈত্রমাস ! হয়ে অনাথিনী
মুছিল সিন্দূরবিন্দু বাসন্তী যামিনী !

প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপেই এখানে কবি ক্ষান্ত হন নাই। বৈশাখের রুষ্ট নেত্রপাতে ভয়ার্তা বসন্তের আর্তনাদচিত্র সজীব হইয়া উঠিয়াছে। মহাকবি কালিদাসের কাব্য ও রবীন্দ্রনাথের 'মদনভস্মের পূর্বে' ও 'মদনভস্মের

পরে' কবিতা দুইটির কথা এখানে স্মরণে আসে। দেবেন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক সংঘটনকে মানবিক রূপদানে এই জাতীয় দক্ষতা দেখাইয়াছেন।

'প্রকৃতি' কবিতায় (গোলাপগুচ্ছ, ১৯২২) দেবেন্দ্রনাথ প্রকৃতির বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন,

বাসন্তী ওড়োনা সাজে, প্রকৃতি-রাধিকা রাজে,
চরণে ঘুঙ্ঘুর বাজে, আনন্দে ঝঙ্কারি',—
নগনা, দোলনা-কোলে, মগনা রাধিকা দোলে,
কবি-চিত্ত-কল্পনার অলকা উঘারি !

পুনশ্চ, অয়ি বরনারি,
চিরদিন, চিরদিন, তুহারি পূজারি আমি,
তুহারি পূজারি !
ত্রিদিব-আনন্দময়ী, ষোড়শী রূপসী তুই,
তোরে হেরি দুঃস্বপন গিয়াছি বিসারি !

প্রকৃতি-নারীর রূপধ্যানে দেবন্দ্রনাথ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সে রূপ প্রধানতঃ চৈত্র-বৈশাখের মদির রূপ।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম যুগের লেখায় প্রকৃতিতে নীতি-আরোপ করিয়াছিলেন। ইহার উদাহরণ, 'ফুলবালা' কাব্যের (১৮৮০) কবিতাসমূহ।

কামিনী পুষ্প দেখিয়া কবি বলিতেছেন,

প্রাঙ্গণে ফুটেছ তুমি কামিনীসুন্দরি,
নিশিভোর না হইতে ভাল করে না ফুটিতে
কি ভাব-আবেশে ফুল যাও তুমি ঝরি ?
সত্য করি বল মোরে কামিনী সুন্দরি।
হায় রে তোমার মত নারীর যৌবন।
ভাল করে না ফুটিতে সুসৌরভ না ছুটিতে,
স্মৃতি-দর্পণের তলে হয় রে পতন ;
তাই কি কৌশলে তুলে করাও স্মরণ ?
('কামিনী')

সূর্যমুখীকে সম্বোধন করিয়া কবি বলেন,

এই শিক্ষা শিখিলাম তোর কাছে আজি
তপন সুন্দরি !
নারী হয় প্রেমময়ী প্রেম তার বিশ্বজয়ী,
ভূধর যদ্যপি টলে টলে না গো নারী
প্রেমে যাই বলিহারি ! ('সূর্যমুখী')

কিন্তু পরবর্তী কাব্যগুলিতে দেবেন্দ্রনাথের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ

পাইয়াছে এবং চৈত্র-বৈশাখের প্রকৃতিতে তিনি আপন কল্পনার উৎস আবিষ্কার করিয়াছেন। বসন্তের উচ্ছ্বাস, বরনারী, দোলপূর্ণিমা, গোলাপ-কিংশুক-অশোকের রক্ত-সমারোহ, বৃন্দাবনের মিলন রাত্রি—এই সকল চিত্র তাঁহার নিকট অতি প্রিয় ছিল। এইগুলির মাধ্যমে তিনি প্রকৃতিসুন্দরীকে উপস্থিত করিয়াছেন।

'অশোক-তরু' সনেটে (অশোকগুচ্ছ : ১৯০০) কবি বলেন—

হে অশোক, কোন্ রাঙ্গা-চরণ-চুম্বনে
মর্মে মর্মে শিহরিয়া হলি' লালে লাল ?
কোন্ দোল-পূর্ণিমায় নব বৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ প্রকৃতি-দুলাল।

'লক্ষ্মৌর আতা' সনেটে দেবেন্দ্রনাথের বর্ণনার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছে :

চাহি না 'আনার'—যেন অভিমানে ক্রূর
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজসুন্দরীর !
চাহি না ক' 'সেউ'—যেন বিরহ-বিধুর
জানকীর চির-পাণ্ডু বদন-রুচির।
একটুকু রসে ভরা, চাহি না আঙ্গুর,
সলজ্জ চুম্বন যেন নব বধূটির !
চাহি না 'গন্না'র স্বাদ ! কঠিনে মধুর
প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ়-দম্পতীর !
দাও মোরে সেই জাতি সুবৃহৎ আতা,
থাকিত যা নবাবের উদ্যানে ঝুলিয়া ;
চঞ্চলা বেগম কোন্ হ'য়ে উল্লসিতা
ভাঙ্গিত; সে স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়া !
অহো কি বিচিত্র মৃত্যু ! আনন্দে গুমরি
যেত মরি রসিকের রসনা উপরি !

নিসর্গের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও জীবনের সাধারণ অনুভূতি—এতদুভয়ের মিলন এবং লঘু খেয়ালি কল্পনা (Fancy) ও গুরু ভাবকল্পনার (Imagination) পরিণয় সাধনের বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচায়ক এই সনেটটি। এই ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ অনন্য।

আবার কবি নববর্ষকে সম্ভাষণ জানাইয়াছেন 'নববর্ষের প্রতি' কবিতায় (গোলাপগুচ্ছ : ১৯১২)—

অশোকের বীরবোলী দোলে তব কাণে !
বালার্কের ফোঁটা তব ভালে !
কে গো তুমি দাঁড়াইয়া, বিজন উদ্যানে ?
হাসিরাশি নয়ন বিশালে ?

পীত ধড়া, পীত তনু, অধরে বাঁশরী,—
কি গাহিছ, হে কুহকি, প্রাণ-মন হরি' ?

নববর্ষের অন্তরাত্মা নহে, বাহিক কুহকিনী রূপটি এখানে ফুটিয়াছে।

প্রকৃতিসুন্দরীর এই কুহকেই দেবেন্দ্রনাথ ধরা দিয়াছেন। 'অশোকফুল' সনেটে (অশোকগুচ্ছ : ১৯০) কবির নয়নের বর্ণবিলাস উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতা (দ্রঃ তৃতীয় অধ্যায়) আলোচনাপ্রসঙ্গে এই কবিতাটি উদ্ধার করিয়াছি। এখানে কবির সহিত একজন চিত্রকর আসিয়া যোগ দিয়াছেন। উপমার গাঢ়তায় ও নিপুণ সন্নিবেশে একটি রসঘন ভাবমূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। চটুল কল্পনাবিলাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রগাঢ় রসোপলব্ধি এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি দেবেন্দ্রনাথের কল্পনা যেমন চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্র-মদিরা-পানে ও অশোক-গোলাপের রক্তরাগে বিভোর, অক্ষয় বড়ালের কল্পনা তেমনি আধ-আলো ছায়াময়ী সন্ধ্যা ও রহস্যরূপিণী জ্যোৎস্না নিশীথিনীর মোহে বিভোর। অক্ষয়কুমারের প্রকৃতিচিত্রে সৌন্দর্যের উগ্রতা ও উচ্ছ্বাস নাই, আছে মৃদু শান্ত সমাহিত নিরুচ্ছ্বাস আবেগ।

কেবল নিশীথিনী নয়, কোমল সন্ধ্যা ও বর্ষার চিত্রও অক্ষয়কুমারের কাব্যে পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে এইটির অভাব ছিল

অক্ষয়কুমারের বর্ষার চিত্রে রোমান্টিক বিষাদের সুর লাগিয়াছে। কেবল চিত্র নহে, চিত্র ও সঙ্গীতের অপূর্ব পরিণয় সাধিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বর্ষাবর্ণনা দেখা গিয়াছে মানসী কাব্যে—এই বর্ষা শুধু চিত্ররূপী প্রকৃতিকে নহে, ভাবময়ী প্রকৃতিকে প্রকাশ করিয়াছে।

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।

('বর্ষার দিনে' মানসী)

এখানে বর্ষাবর্ণনায় চিত্রসম্ভার অল্পই, তথাপি বর্ষার নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণের দিনে একটি অলস ক্ষণের আবেশটুকু চমৎকার প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বর্ষার দিনের বিরহ মানুষকে সংকীর্ণ সীমা হইতে মুক্তি দেয়, সে আত্মকেন্দ্রিক বিরহকে সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া চিরন্তন ও অসীম বিরহের আস্বাদ লাভ করে। তখন কবিচিত্ত দীর্ণ করিয়া উৎসারিত হয় এই ভাবনা :

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী
গাঢ় ছায়া সারাদিন
মধ্যাহ্ন তপনহীন,

দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।
আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা অভিসার
পাগলিনী রাধিকার,
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।........
আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।
('একাল ও সেকাল', মানসী)

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ বর্ষার এই সংগীতময় চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পূর্বে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রাবণে' কবিতায় (প্রদীপ) অক্ষয়কুমার মানবের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া বর্ষার এই চিরন্তন বিরহের সুরটি জাগাইয়া তুলিয়াছেন:

সারাদিন একখানি জলভরা কালো মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ,
বসে জানালার পাশে সারাদিন আছি চেয়ে
জীবনের আজি অবকাশে।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে তরুগুলি হেলে দোলে
ফুলগুলি পড়েছে খসিয়া;
লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়েছে লুটি
পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়া।

বর্ষার নির্বাচিত দৃশ্য সমূহ উপস্থাপনের পর কবিমনের রোমান্টিক বিষাদ প্রকাশ পাইয়াছে—

চেয়ে আছি শূন্য পানে কোনো কাজ হাতে নাই
কোনো কাজে নাহি বসে মন,
তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই; দেহ আছে, মন নাই;
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন।
এই উঠি, এই বসি; কেন উঠি, কেন বসি;
এই শুধু, এই গান গাই।
কি গান—কাহার গান! কি সুর!—কি ভাব তার!
ছিল কভু, আজ মনে নাই!

একটি উদাস বিধুর মনোভাব এখানে কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। তারপর রবীন্দ্রনাথের অমৃত লেখনীতে নিত্য নব নব রূপে বর্ষা প্রকাশিত হইয়াছে।

এইবার অক্ষয়কুমারের কল্পনায় অনুকূল প্রকাশক্ষেত্র সন্ধ্যার কোমল চিত্রটি উপস্থিত করিব। এই কবিতাটি—'সন্ধ্যা'—'সাহিত্য' পত্রিকায় (পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৮৯৪) প্রকাশিত হইয়াছিল—পরে 'শঙ্খ' কাব্যে গৃহীত হয়। সন্ধ্যার ধীর পদক্ষেপে আগমনের চিত্রটি মনোরম :

ধীরে সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী,
সুনীল দুকূলে ঢাকি ফুলতনুখানি।
তরল গুণ্ঠন-আড়ে
মুখশশী উঁকি মারে,
কম্পিত কণ্ঠনী-ধারে হৃদয়ের বাণী!
নব নীলোৎপল মত
লাজে দিঠি অবনত,
সম্ভ্রমে সঙ্কোচে কত বাধিছে চরণ।
পতির পবিত্র ঘরে
সতী পরবেশ করে—
হাতে সুবর্ণের দীপ, হৃদয়ে কম্পন।

এই সন্ধ্যাচিত্র রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত সন্ধ্যাচিত্রের কথা মনে করাইয়া দেয়—

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা
সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপশিখা।

সন্ধ্যা দেবীর প্রতি প্রেম নিবেদনে এই কবিতার সমাপ্তি :

এস প্রিয়া প্রাণাধিকা—
জীবন-হোমাগ্নি শিখা!
দিবসের পাপতাপ হোক হতমান।
ওই প্রেমে—প্রেমানন্দে,
ওই স্পর্শে—বাহুবন্ধে
আবার জাগুক মনে আমি যে মহান্
একেশ্বর অদ্বিতীয় অনন্যপ্রধান।

প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপেই এই কবিতা শেষ নহে, আপন অনুভূতি প্রকৃতির অনুভূতির সহিত মিশাইবার নৈপুণ্য এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি-কবিতায় আনন্দ, চাঞ্চল্য, উচ্ছ্বাস; অক্ষয়কুমারের কবিতায় শান্তি, ধৈর্য, ঔদাস্য। দেবেন্দ্রনাথে উদ্বেল বর্ণবিলাস, অক্ষয়-কুমারে বর্ণবিরলতা। দেবেন্দ্রনাথে অসহ্য আবেগ, অক্ষয়কুমারে আবেগের সংযম। 'শঙ্খ' কাব্যের (১৯১০) প্রকৃতি-কবিতাপাঠে অক্ষয়কুমার

সম্পর্কে এই ধারণাই জন্মে যে, কবি প্রকৃতির মধ্যে তাঁহার উদাস বিধুর মনোভাবের সমর্থন লাভ করিয়াছেন।

'শঙ্খ' কাব্যের প্রকৃতি-কবিতার কয়েকটি উদাহরণ এই অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। এগুলিতে কেবল প্রকৃতি নহে, কবির মনোভাবও বর্তমান।

'মধ্যাহ্নে' কবিতায়—

একেলা জগৎ ভুলে, পড়ে আছি নদীকূলে
পড়েছে নধর বট হেলে ভাঙ্গা তীরে
ঝুরু ঝুরু পাতাগুলি কাঁপিছে সমীরে।
নিঝুম মধ্যাহ্ন-কাল, অলস স্বপন-জাল
রচিতেছি অন্য মনে হৃদয় ভরিয়া!
দূর মাঠ পানে চেয়ে, চেয়ে—চেয়ে, শুধু চেয়ে
রয়েছি পড়িয়া!
ধূ-ধূ ধূ-ধূ করে মাঠ, ধূ-ধূ-ধূ আকাশ-পাট
পড়িয়া ধূসর রৌদ্র পরিশ্রান্ত মত!
হু-হু-হু-হু বহে বায়— ঝাঁপাইয়া পড়ে গায়,
কোথাকার কথা যেন লয়ে আসে কত!
হৃদয় এলায়ে পড়ে যেন কি স্বপন ভরে!
মুদে' আসে আঁখি-পাতা যেন কি আরামে!
অন্য মনে চাহি' চাহি'— কত ভাবি, কত গাহি!
পড়িছে গভীর শ্বাস—গানের বিরামে।
খসে' খসে' পড়ে পাতা, মনে পড়ে কত গাথা—
ছায়া-ছায়া কত ব্যথা সহি ধরাধামে!

সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালি কাব্যের মধ্যাহ্ন-চিত্রগুলির কথা এখানে স্বতঃই স্মরণে আসে।

'অপরাহ্নে' কবিতায়—

ঘনায়ে আসিছে সন্ধ্যা, স্তব্ধ বনভূমি
সোনালী মেঘের গায়ে সুরভি-শীতল বায়ে
শিথিল তটিনী-ভঙ্গে লুকালে কি তুমি!
পিক-কণ্ঠে, মৃগ-নেত্রে, কম্পিত শ্যামল-ক্ষেত্রে,
মুদ্রিত কমল-পত্রে রয়েছ কি ঘুমি'!
আকুল হৃদয় কাঁদে কোথা তুমি—তুমি!

এখানে বিদায়ী অপরাহ্নের বেদনা কবিহৃদয়ের বেদনার সহিত এক হইয়া গিয়াছে।

'সায়াহ্নে' কবিতায়—

পূর্ণিমা রজনী,
জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেছে সমস্ত ধরণী।
অদূরে পুলকে পিক কুহরে
ফুলে ফুলে তরুলতা শিহরে ;
নয়ন আলসে ঢুলু-ঢুলু,
কূলে নদী বহে কুলু-কুল্ ;
ওই দূরে নীপমূলে তাহার আঁচল দুলে—
কত হয় ভুল !
ভুলি' বিশ্ব চরাচর আগ্রহে বাড়াই কর—
হৃদয় আকুল।

প্রকৃতির উদাস বিধুর বিষণ্ণ রূপটি কবিকে আকর্ষণ করিয়াছে, সহমর্মী হইয়া সান্ত্বনা দিয়াছে ও স্নেহময়ীরূপে প্রেম দিয়াছে। মনে হয় যে কবি এক বিরহ-বিধুর, স্বপ্নাবিষ্ট মন লইয়া প্রকৃতিতে তাহারই ঘনীভূত পরিবেশ খুঁজিয়াছেন—প্রকৃতির নিজস্ব ভাবটি যেন কবির পূর্বসংস্কারের মধ্যে চাপা পড়িয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে কবি-মানসী ও প্রকৃতি এক হইয়া গিয়াছে। কবি নিজেও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন ('কবিত্ব', প্রদীপ ১৮৮৪)—

একবার, নারী, তব প্রেম-মুখ হেরি ;
আর বার প্রকৃতির শ্যাম বুক হেরি,
মনে হয়,—দুইজনে দু'খানি মেঘের মত
রহিয়াছে জগতেরে ঘেরি'।
আমি—তোমাদের মাঝে একটি বিদ্যুৎ সম
চকিতে জ্বলিয়া
মিশায়ে—মিলায়ে, যাই মিশিয়া—মিলিয়া !

ইহাই প্রকৃতির কবি অক্ষয়কুমারের যথার্থ পরিচয়।

গত শতাব্দীর এই প্রকৃতি-সাধনার অনুসরণ লক্ষ্য করি বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর কাব্যে। প্রমথনাথের নিসর্গচিত্রগুলিতে এই উদাস বিষণ্ণ প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা যায়। বিদায়ী অপরাহ্ন-বেলার ম্লান বিষণ্ণতা কবিচিত্তকে স্পর্শ করিয়াছে। 'আসন্ন দৃশ্য' কবিতাটি (গীতিকা কাব্য, ১৯১৩) এই উদাস বিধুর মনোভাবের পরিচায়ক :

ওই যায়, চলে যায় অপরাহ্নবেলা ;
এখনি ভাঙ্গিয়া যাবে দিবসের খেলা
অতি ধীর সন্তর্পণে ধরি' অস্তপথ
চলিছে বিদায়-ক্ষুণ্ণ আলোকের রথ।

নিশার আবাসযাত্রী রাজহংসগুলি
উৎসুক উন্মুখ পক্ষে আছে গ্রীবা তুলি।
মন্দ বায়ে নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষোপরে
ছায়াস্নিগ্ধ শ্যাম গোষ্ঠে আরাম-শয়নে
গাভীরা রোমন্থ করে মুদিত নয়নে।
হাট করি পল্লিপথে বোঝা রাখি শিরে
মুখর জনতাশ্রেণী গৃহপানে ফিরে।
ভরা-ঘট ছলকিয়া ভিজায় আঁচল;
শেষবার গ্রাম্যবধূ লয়ে যায় জল।

অপরাহ্নের অলস উদাস সুর এবং চিত্ররচনার শক্তি এখানে পরিণয়ে আবদ্ধ হইয়াছে। চিত্রা-চৈতালির শান্ত সৌন্দর্য এখানে ধরা পড়িয়াছে।

প্রকৃতির এই উদাস বিধুর করুণ মূর্তিটি কবি অন্যত্রও লক্ষ্য করিয়াছেন। 'শারদীয় বোধন' কবিতার প্রারম্ভিক বর্ণনায় পাই:

বর্ষারে বিদায় দিয়ে শূন্যচিত্ত উদাস আকাশ
ধরি অভিনব মূর্তি, নবনীল পরি বেশ-বাস
আহ্বানিল কারে!
দিগ্বধূরা মুছি আঁখি, নীলাম্বরে তনু ঢাকি,
নমিল তাঁহারে।
উদিলা শরৎ-লক্ষ্মী আপনার প্রফুল্ল প্রত্যুষে
বিশ্বের দুয়ারে!

শরতের এই কল্যাণী মূর্তি অংকনে কবির প্রকৃতি-সচেতনতা পরিস্ফুট।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রকৃতি-কবিতায় একটি অনন্যসুলভ স্বাতন্ত্র্য আছে। ইহাতে প্রত্যক্ষতার প্রতি ঝোঁক ও ভাবালুতার তীব্র বিরোধিতা লক্ষ্য করি। অবশ্য এই বিরোধিতা গীতিকবিতার রসহানি ঘটাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃতি-কবিতা এক কথায় বিষয়নির্ভর প্রত্যক্ষ প্রকৃতিরূপচিত্রণ। 'মন্দ্র' (১৯০২) ও 'আলেখ্য' (১৯০৭) কাব্যে ইহার পরিচয় মিলে। 'আলেখ্য'র ত্রয়োদশ চিত্র 'রাখাল বালক' কবিতায় তবু কতকটা গতানুগতিক বর্ণনা আছে, কিন্তু 'মন্দ্র' কাব্যের 'দার্জিলিঙে হিমালয় দর্শনে' এবং 'পুরীতে সমুদ্রের প্রতি' কবিতা দুইটিতে সমকালীন ভাবালুতা ও প্রকৃতি-নিমগ্নতার বিরোধিতা প্রকট। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটিতে প্রথমে সমুদ্রের প্রতি ব্যঙ্গ, শেষে তাহার মহান গাম্ভীর্যের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যঙ্গ যে গীতিকবিতার উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করে না, সে বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল সচেতন ছিলেন না। তথাপি এই অনন্যসুলভ স্বাতন্ত্র্যের জন্যই এই দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার যোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন:

হে সমুদ্র! আমি আজ এইখানে বসি। তব তীরে,—
ঠিক তীরে নয়; এই সুপ্রশস্ত ঘরের বাহিরে,
বারান্দায়, আরাম-আসনে বসি', সুখে, এইক্ষণে,
'দুনিয়াটা মন্দ নয়' এই কথা ভাবিতেছি মনে।...
তুমি যে হে গর্জিছই!—চট কেন? শোন পারাবার!
দুটো কথা বলি শোন। তোমার যে ভারি অহঙ্কার!
শোন এক কথা বলি!—দিনরাত করিছ শোঁ শোঁ;
তোমার কি কাজ কর্ম নাই?—অহো চট কেন? রোসো।
শুদ্ধ নিন্দাবাদী আমি? তবে শোনো দুটি স্তুতিবাণী;—
বলেছি, 'যা প্রাপ্য মান্য তাহা আমি করিব না হানি।'
—না, না, তুমি ভাঙ্গো বটে; কর চূর্ণ যাহা পুরাতন;
কিন্তু তুমি নবরাজ্য পুনরায় করিছ সৃজন;
ব্যাপ্তিসম, কালসম, সৃজনের বীজমন্ত্র মত,
এক হাতে নাশ তব, এক হাতে গঠনে নিরত;
যুগে যুগে বহে' যাও গম্ভীর কল্লোলি নিরবধি,
ন্যায়সম নিঃসঙ্কোচে নিজ কার্য সাধিছ জলধি।...
কল্লোলিয়া যাও সিন্ধু! চূর্ণ কর ক্ষুদ্রতার দম্ভ
ধৌত কর পদপ্রান্তে ভূধরের মহত্ত্বের স্তম্ভ;
সৃষ্টির সে প্রেমান্ধ সঙ্গীত তুমি যুগে যুগে গাও;
—যাও চিরকাল সমভাবে বীর কল্লোলিয়া যাও।

মহিলা-কবি-রচিত প্রকৃতি-কবিতা

বাংলা কাব্যে প্রকৃতি-কবিতা যে ক্রমশঃ পরিপক্বতা লাভ করিতেছে, তাহা এই সকল কবিদের নিসর্গ-চিত্র আলোচনা করিলেই বোঝা যায়। মহিলা-কবিরাও এক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অন্ততঃ দুইজন মহিলা-কবি যে প্রকৃতি-চিত্রণে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রকৃতির সেই তারে আঘাত করিয়াছেন যাহাতে বিরহবেদনার সুর বাজিয়া উঠে। প্রকৃতির সংগীত যে ব্যক্তিহৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উৎসারিত, এই বিশ্বাস ইহাদের ছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী তাঁহার শিখা' কাব্যেই (১৮৯৬) এই বিরহী প্রকৃতিকে আঁকিয়াছেন। 'বর্ষাসংগীত', 'শ্রাবণে', 'ভাদরে', 'সন্ধ্যায়' কবিতাগুলি এই অভিমতকে সমর্থন করে।

'বর্ষাসংগীত' কবিতায় কবির ব্যাকুল হৃদয়বেদনার প্রকাশ:

কেন ঘন ঘোর মেঘে
এমন পরাণ মাতে?

কি লেখা লিখেছে কে গো
সজল জলদ পাতে !
শত বিরহীর হিয়া,
ওর মাঝে মিশাইয়া,
আপন গোপন ব্যথা
লুকায়ে দিয়েছে তাতে ।
বিন্দু বিন্দু ঝর ঝর,
ওকি তার অশ্রু থর ?
তড়িৎ-চমক ওকি—
বাসনার বহ্নি তা'তে ?…
কি লেখা লিখেছে সে গো,
ফুটে না উঠিছে ফুটি ।
উদাসে হৃদয়ে শুধু ;
নীরে ভরে আঁখি দুটি ।

'মানসী' কাব্যে বর্ষার যে ভাবময় চিত্র আছে, তাহার সহিত এই কবিতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আপন হৃদয়বেদনাকে প্রকৃতির নানা বিচিত্র প্রকাশের মাধ্যমে ব্যক্ত করিয়া দিবার কৌশল গিরীন্দ্রমোহিনী আয়ত্ত করিয়াছিলেন ।

গিরীন্দ্রমোহিনী সন্ধ্যার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতেও এই ম্লান বিষণ্ণ মৌন শ্রান্ত সকরুণ স্বরটি শোনা যায়—

উজ্জ্বল সীমন্ত-মণি শোভিত শিরসে,
ধীরে ধীরে মৃদু পদে সন্ধ্যা নেমে আসে
নিবিড় তিমির কেশ চুম্বিত চরণা,
ধূসর অম্বরাবৃতা আনত-নয়না,
আরক্ত চরণ-রাগ পশ্চিম গগনে
সুধীরে মিলায়ে যায় ;—ফিরে গৃহ পানে
শ্যামল প্রান্তর হ'তে শ্রান্ত গাভীগুলি ।—

সন্ধ্যার গ্রামপথে মুহূর্তের মধ্যেই শ্রান্তির ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে, তখন 'সুদূরে মিলায়ে আসে দিগন্তের রেখা'। তাই এ শ্রান্ত সন্ধ্যায় কবির ভাবনা,

প্রতিদিন ঝরে পড়ে জীবনের কণা
রহিল অপূর্ণ কত সমুচ্চ বাসনা ;
কি ব্যথা জাগায়ে তুলে কোন্ বিফলতা ?
কত দূরে নিয়ে যায় সান্ধ্য নীরবতা !

মানকুমারী বসুর প্রকৃতি-চিত্রণে দক্ষতা ছিল বটে, কিন্তু তাহা এতটা

গভীর ও পরিপক্ক নহে। প্রকৃতি-কবিতার যে প্রাথমিক স্তরের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি, মানকুমারী সেই পথেই চলিয়াছেন। স্বর্ণকুমারী, সরলাবালা, বিনয়কুমারীর সহিত মানকুমারীর যতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল, গিরীন্দ্র-মোহিনীর সহিত ততটা নহে। গিরীন্দ্রমোহিনী অক্ষয় বড়ালের সহযাত্রিণী। মানকুমারীর 'কনকাঞ্জলি' (১৮৯৬) কাব্যে যে প্রকৃতি-চিত্র পাই তাহা প্রাথমিক স্তরের হইলেও সজীব।

'শিরীষ-কুসুম' কবিতা ইহার পরিচয় দিবে :

কেন আমি ভালবাসি শিরীষ-কুসুম ?
ধীরে ধীরে সোনামুখী
দেয় মধুমাখা উঁকি !
উষার সুরভিশ্বাস, বসন্তের ঘুম,
অমরার আলোকণা শিরীষ-কুসুম !...
শিরীষ-কুসুম কার ভাল নাহি লাগে ?
সদা স্নিগ্ধ শান্তরূপ
মধুরতা অপরূপ !
কে না পুজে হৃদি-তলে প্রীতি-অনুরাগে ?
পরি' রাজরাণী-সাজ,
চাঁপা, গন্ধা, গন্ধরাজ,
প্রাণ করে ঝালাপালা, সুতীব্র সোহাগে,
শিরীষ-কুসুম, মোর তাই ভাল লাগে।

আসল কথা প্রকৃতি-চিত্রণে নহে, অন্যত্র মানকুমারীর প্রতিভা বিকাশ লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কবিদের প্রকৃতি-কবিতা আলোচনান্তে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে, প্রকৃতি-চিত্রণে কবিরা ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া উঠিতেছেন। প্রাথমিক শিশুসুলভ মুগ্ধ দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া করিয়া প্রকৃতিতে নীতি ও মানবত্ব আরোপ করিয়াছেন। তারপর, আপন হৃদয়-বীণার তন্ত্রীতে প্রকৃতির সুরটি বাঁধিয়া লইয়াছেনন। সেখানে প্রকৃতি আর জড় নহে, সে মানুষের সখী হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি কবি কেবল আনন্দ খুঁজেন নাই, হৃদয়বেদনার সমর্থনও পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রকৃতি-কবিতা নূতন অর্থগৌরবে ও ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। পূর্ববর্তী কবিদের প্রকৃতি-উপাসনার সকল সুফল তাঁহার কাব্যে ধরা দিয়াছে। 'সোনার তরী' কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতায় যে প্রকৃতি-প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বাংলা কাব্যে অনন্য, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর-সাধনের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই তাহার দিকে আলিঙ্গনের ব্যগ্র বাহু বিস্তার করিয়াছেন। এই প্রেমের প্রকাশেই প্রকৃতি-কবিতা নবজন্ম লাভ করিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়
বিষাদ-কবিতা

পটভূমি ও প্রাথমিক প্রয়াস

জনৈক বিদেশি সমালোচক আধুনিক কাব্যের চরিত্র-লক্ষণ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন: "The poetry of later paganism lived by the senses ; and incidentally, the poetry of mediaeval Christianity lived by the heart and the imagination. But the main element of the modern spirit's life is neither the senses and understanding, nor the heart and imagination ; it is the poetry of reason."

একান্তভাবে বুদ্ধিপ্রধান ও মননশীল আধুনিক মনের বহুল চর্চার ফলে জীবনে যে নৈরাশ্য ও তজ্জনিত বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই আধুনিক বিষাদ-কবিতার মূল উৎস।

জীবন সম্পর্কে এই যে হতাশার সুর, ইহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে পৃথিবীর বহু সাহিত্যসংসারেই শোনা গিয়াছিল। জীবন একটি দুর্বহ ভার, ব্যর্থতার স্তূপ মাত্র, তাহা মানবের সমগ্র কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ত ব্যাহত করিয়া দিতেছে, এবং তাহারই ফলে কাব্যকন্দরে বেদনা ঘনাইয়া উঠিতেছে, ইহা দেশী-বিদেশী কবিদের লেখায় ধরা পড়িয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে মানুষ যেমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও সামুদ্রিক অভিযানের জয়যাত্রার ফলে নবলব্ধ বিশ্বাস ও উল্লাসে উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনই আবার মানসিক হতাশার অতল গভীরে পৌঁছিয়াছিল—সেখানে জীবনের প্রতি কোনো শ্রদ্ধাই আর অবশিষ্ট ছিল না। বস্তুতঃ ইহাকে যুগের ব্যাধি বলা ছাড়া উপায় থাকে না। এ সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি।

বাংলা কাব্যেও অনুরূপ জীবন-জিজ্ঞাসা, জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধাহীনতা, নৈরাশ্য ও বেদনা লক্ষ্য করা যায়। আশ্চর্যের কথা এই যে, বাংলা কাব্যে আধুনিক গীতিকবিতার জন্মলগ্নেই এই হাহাকার ও বিষাদের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল।

জনৈক পণ্ডিত-সমালোচক গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কাব্যসংসারের বিষাদ ও নৈরাশ্যের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন: 'The common refrain was that life was a burden and futility, and that above all, there was a higher agency, call it fate or anything else that

presided over the destinies of man. These sentiments were echoed in the early poems of Michael, Hemchandra, Nabinchandra, Biharilal, Akshay Baral, Adharlal Sen, Kamani Ray, Saralabala Dasi, Priyambada Devi and Rabindranath Tagore. All of them, in their early compositions, were dominated by a morbid melancholy, an unreality and a kind of Wertherism which was altogether a new current in our poetry.'—(Harendramohan Dasgupta : 'Western Influence on Nineteenth Century Bengali Poetry' : Introduction.)

বিষাদ-কবিতার স্বচনা করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। বাংলা দেশের আধ্যাত্মিক সংস্কারে ভগবদুপলব্ধির ব্যর্থতা ও মায়াবাদের প্রাধান্য বিষাদের মূল উৎস। ঈশ্বর গুপ্ত মূলতঃ এই উৎসেরই অনুসরণ করিয়াছেন—ইহা ঠিক যুগপ্রভাবের ফল নহে।

গত শতাব্দীর মধ্যবিন্দুতে দাঁড়াইয়া ঈশ্বর গুপ্ত সখেদে প্রশ্ন করিয়াছিলেন :

হায়, আমি কি করিলাম এত দিন
দিন যত গত গত, দিন দিন দীন॥
বৃথায় হইল জনু বৃথায় হয়েছি মনু,
অতনু-শাসনে তনু তনু অনুদিন।
ভাবে নাহি ভাবি ভাবি, কার ভাবে মিছা ভাবি,
না ভাবিয়া ভবভাবী, ভেবে হই ক্ষীণ॥ (হায় আমি কি করিলাম)

ঈশ্বর গুপ্তের জীবনের ব্যর্থতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁহার 'আত্মবিলাপ' কবিতায় এই ব্যর্থতাজনিত ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাই :

না বুঝিলে সার মর্ম হায় হায় রে।
কে আমার আমি কার, আমার কে আছে আর,
যত দেখ আপনার ভ্রম মাত্র তায় রে॥
আত্মার আত্মীয় কই, আত্মার আত্মীয় কই,
আত্মার আত্মীয় নই, আত্মা কই কায় রে।
ইন্দ্রিয় যাহার বশ, ছোটে যশ দিক্‌ দশ,
পরম পীযূষ-রস সুখে সেই খায় রে॥

ঈশ্বর গুপ্তের ব্যাকুল আত্মজিজ্ঞাসা শেষ পর্যন্ত কবিওয়ালার হাতে শব্দক্রীড়ায় পরিণত হইয়াছে, তাহা প্রথম অধ্যায়ের শেষভাগে আলোচনা করিয়াছি।

ইহারই পরে মধুসূদনের বিখ্যাত 'আত্মবিলাপ' কবিতাটি (১৮৬১) পাই। সেদিনের বাঙালি সমাজের দ্বিধাবিভক্ত, আন্দোলিত, অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত, শিক্ষিত তরুণ মানসের আন্তরিক বেদনা ও হাহাকার এই কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে। আর এই বেদনাতেই আধুনিক গীতিকবিতার জন্ম হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের

পূর্বধৃত কবিতার সহিত মধুসূদনের 'আত্মবিলাপে'র তুলনা করিলেই শেষোক্ত কবিতার আন্তরিকতা, গভীরতা ও গীতিরস ধরা পড়িবে। জীবনপ্রবাহে তাড়িত এক শ্রান্ত বিশ্বাসরিক্ত পথিকের ব্যাকুল মর্মভেদী আর্তনাদে এই বিলাপের সূচনা :

আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে।
জীবন প্রবাহ বহি' কালসিন্ধু-পানে যায়
ফিরাব কেমনে ?

আশার ছলনামুগ্ধ বঞ্চিত প্রতারিত জীবনের এ ব্যাকুল আর্তনাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে আমাদের আর কোন সন্দেহ থাকে না যখন আমরা সেদিনের বাঙালি জীবনের ও কবিজীবনের পটভূমিকায় ইহাকে স্থাপিত করি। আয়ুক্ষীণ ব্যর্থ বিশ্বাসরিক্ত বিনিদ্র জীবনের এ হাহাকার আমাদের মর্ম স্পর্শ করে—

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত হে ব্যয়িলি হায়
কব তা কাহারে
সুগন্ধ কুসুম গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,
মাৎসর্য-বিষদশন কামড়ে রে অনুক্ষণ !
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে অনিদ্রায় ?
মুকুতাফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জলতলে
ফেলিস, পামর।
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক ছলে ?

এই ব্যাকুল আত্মবিলাপে বিষাদ-কবিতার শুভ সূচনা হইল। বাংলা কাব্যে Wertherism-এর প্রথম পরিচয় এখানে পাই।

মধুসূদনের এই আত্মবিলাপ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে (১৮৬৬)। 'বিজয়াদশমী', 'নূতন বৎসর', 'নদী তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির', 'যশ,' 'যশের মন্দির', 'সমাপ্তে' প্রমুখ সনেট তাহার পরিচয়স্থল। নূতন বৎসর 'সনেটটি' 'আত্মবিলাপে'রই ঘনীভূত ও সংহত কাব্যরূপ। 'আত্ম বিলাপ' ব্যক্তিগত, 'নূতন বৎসর' সর্বজগদ্‌গত।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় এই সংসারে অতৃপ্তি, অনির্দেশ্য বেদনা ও হাহাকার লক্ষ্য করা যায়। এই মানবজীবন তাঁহার নিকট মরীচিকা বলিয়া মনে হইয়াছে :

জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে—
হ'য়ে লালায়িত কে ইহা যাচিত রে!
প্রভাতে অরুণোদয়, প্রফুল্ল যেমন হয়,
মনোহরা বসুন্ধরা, কুহেলিকা আঁধারে,……
সেইরূপ বাল্যকালে, মন মুগ্ধ মায়াজালে
কত লুব্ধ আশা আসি স্নিগ্ধ করে আমারে।—
সেইরূপ ক্রমে যত, শৈশব যৌবন গত
মনোমত সাধ তত ভাঙ্গে চিত্তবিকারে।
স্বর্ণ মেঘের মালা লয়ে সৌদামনী ডালা
আশার আকাশে আর নিত্য নাহি বিহরে।
ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্যবাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায় প্রহারে!
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ-প্রাকারে।
জীবনেতে পরিণত এই রূপে হয় কত
মর্ত্ত্যবাসি মনোরথ হা দগ্ধ বিধাতা পে!
('জীবন মরীচিকা'—কবিতাবলী)

আশার ছলনায় ভুলিয়া ব্যর্থমনোরথ হইবার কাহিনীই এখানে বর্ণিত হইয়াছে। সংসারের অসারতা কবিকে বিষাদে পূর্ণ করিয়াছে:

কি হবে কাঁদিয়া জগৎ ভরিয়া,
সবারি এ দশা, কিছু চির নয়,
চির দিন কারো নাহি রয় স্থির,
চিরকাল কারো সমান না যায়।…

শেষপর্যন্ত কবি সান্ত্বনা খুঁজিয়াছেন ঈশ্বরের নিকট—

ডাকি হে শ্রীহরি শ্রীচরণে ধরি,
মোহ অন্ধকার দাও দূর করি,
দেহ শান্তি প্রাণে এই ভিক্ষা করি।
অভাগার শেষ আশা মিটাও॥
('কি হবে কাঁদিয়া', চিত্তবিকাশ)

কবিপ্রাণে যে অতৃপ্তির বেদনা, তাহার নিরসনের জন্যও কবি ঐ শ্রীচরণ ভরসা করিয়াছেন—

এ অতৃপ্তি কেন সদা, ধন যশ কি প্রেমদা,
কিছুই সন্তোষকর নহে।
নাহিক আকাঙ্ক্ষা আশা, নাহিক কোন লালসা
প্রাণ যেন সদা শূন্য রহে।………

স্থলে জলে ভূমণ্ডলে, স্থখের লহরী চলে,
কিসে স্থখ আমি মরি খুঁজে।
সহেছি অনেক দিন, সই আর কত দিন,
দিনে দিনে ডুবি হে পাথারে।
সত্বর এ প্রাণ হরি' এ দুঃখ ঘুচাও হরি,
এ যাতনা দিওনা ক' কারে।

('অতৃপ্তি'—চিত্তবিকাশ : ১৮৯৮)

কবিজীবনের এই ব্যাকুল অতৃপ্তিই যে কবিকে চালনা করিতেছে, এই বোধ হেমচন্দ্রের ছিল না। এখানে বিষাদের প্রাথমিক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই সকল কবিতায় বিষাদের ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতা সনাতন ধর্ম-বোধের পথ অনুসরণ করিয়া বৈচিত্র্য হারাইয়াছে।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র অন্ধ হইয়া যান। অন্ধত্বের উপর তিনি 'বিভু, কি দশা হবে আমার' কবিতাটি (চিত্তবিকাশ) লিখিয়াছিলেন। মিল্টনের 'On His Blindness' কবিতাটির সহিত ইহার স্বতঃই তুলনা হইতে পারে। দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হওয়ার জন্ম সংসারে কবির কী ক্ষতি হইয়াছে, কী দৃশ্য উপভোগ হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন, 'পর-প্রতিপাল্য দীন' জনে পরিণত হইয়াছেন, প্রিয়জনদের দেখার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন : ইহার দীর্ঘ তালিকা কবি পেশ করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের নিকট অভিযোগ জানাইয়াছেন :

নিজ পুত্র কন্যা মুখ পৃথিবীর সার স্থখ,
তাও আর দেখিতে পাব না।
অপূর্ব ভবের চিত্র থাকিবে স্মরণে মাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা।
কি নিয়ে থাকিব তবে কি সাধনা সিদ্ধ হবে,
ভবলীলা ঘুচেছে আমার।
বৃথা এবে এ জীবন, হর না কেন এখন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার।
ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার।
জীবনের শেষ কালে সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু! কি দশা হবে আমার ?

মিলটনের 'On His Blindness' কবিতাটিতে তথ্য প্রাধান্য লাভ করে নাই, তথ্যের সারনির্যাসটি গৃহীত হইয়াছে। আপন দুর্ভাগ্যকে মঙ্গলময় ঈশ্বরের অমোঘ বিধান বলিয়া অন্ধ কবি স্বীকার করিয়াছেন

এবং সকল ক্ষোভ পরিহার করিয়া ঈশ্বর-চরণে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছেন। ফলে নির্বেদ ও প্রশান্তি, গাম্ভীর্য ও একান্ত নির্ভরতার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। এই প্রশান্তির সুর ব্যক্তিগত দুঃখকে অতিক্রম করিয়া পাঠকমনে স্থায়ী রস সঞ্চার করিয়াছে।

হেমচন্দ্রের কবিতায় তথ্যসঞ্চয়ন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তত্ত্বগত আলোচনা সার্বভৌম ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ হয় নাই। ব্যক্তিগত দুঃখ ও আন্তরিকতার অভাব এ কবিতায় নাই, কিন্তু সে অনুভূতির সাধারণীকরণ ও কল্পনা-সমৃদ্ধি ঘটে নাই, ফলে কবির দুঃখ ব্যক্তিগত হইয়াই আছে—সর্ব-হৃদয়-সংবাদী হইয়া উঠে নাই।

আসল কথা আলোচ্যমান কবিতাগুলিতে বিষাদ ও বিলাপের প্রাথমিক সুরটিই লক্ষ্য করা যায়। মধুসূদনের 'আত্মবিলাপে' যে রোমান্টিক বেদনা আছে, হেমচন্দ্রের এ সকল কবিতায় তাহা প্রকাশ লাভ করে নাই।

নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী' (১৮৭১/৭৭) কাব্যে কবিহৃদয়ের এই বেদনা গভীর হইয়া উঠিয়াছে। ব্যর্থ প্রণয়ে কবি বলিয়াছেন—

কল্পনা-বিমল-জলে, প্রতিবিম্বে প্রতি পলে,
যেই তারা দেখিতাম হায়!
বিস্মৃতির অন্ধকারে, কেমনে লুকাই তারে,
অনুতাপ সহন না যায়।
নিরাশার কাল ছুরি হানিলাম বুকে,
যায় যায় যাক প্রাণ কাজ কি এ দুখে।

('প্রতিমা-বিসর্জন')

কবি যখন তাঁহার হৃদয়ে বিষাদের উৎস সন্ধান করিয়াছেন, তখন তাঁহার মনে হইরাছে—

অকস্মাৎ কেন আজি জলধর প্রায়,
বিষাদে ঢাকিল মম হৃদয়-গগন?
দুর্বল মানসতরী, ছিল আশা ভর করি,
চিন্তার সাগরে কেন হইল মগন?
দুঃখের অনলে বুঝি আবার জালায়!
কেন কাঁদে মন আহা! কে দিবে বলিয়া!
কে জানে এ অভাগার মনের বেদন?
অন্তরে আছেন যিনি, কেবল জানেন তিনি,
যে অনলে এ হৃদয় করিছে দাহন,
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ এ তাপ সহিয়া?

('হতাশ")

নবীনচন্দ্রের দুইটি দীর্ঘ কাহিনীকাব্য—'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী'

ও 'পিতৃহীন যুবক'—এ দু'য়ে বিষাদের পর্যাপ্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই বিষাদের সহিত জীবনের আন্তরিক সংযোগ স্থাপিত হয় নাই; কোথাও ইহা তরল ভাবোচ্ছ্বাসে, কোথাও বা দীর্ঘ বক্তৃতায় পরিণত হইয়াছে। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে হৃদয়বেদনার বর্ণনায় সজীবতা লক্ষ্য করা যায়।

বিশুদ্ধ গীতিকাব্যের প্রেরণা এই দুই কাহিনীকাব্যে নাই। তাই 'অবকাশরঞ্জিনী'র কয়েকটি কবিতায় রোমান্টিক বিষাদের ব্যর্থ অনুসন্ধানেই আমাদের ক্ষান্ত হইতে হয়।

রোমান্টিক বিষাদ-কবিতা

বিশুদ্ধ গীতিকাব্যের প্রেরণা বিহারীলালেই প্রথম পাই। বাংলা কাব্যে এখানেই রোমান্টিক কবিভাবনার আবির্ভাব ঘটে। "গীতিকবি হিসাবে বিহারীলালের মৌলিকতা আমাদের সমস্ত পূর্ব-ধারণাকে বিপর্যস্ত করে—বাংলা কাব্যের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত ইহা সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্পর্ক। বিষয়-পরিকল্পনা, অনুভূতির অশরীরি সূক্ষ্মতা, বিশ্বসৌন্দর্যের বিবিধ বিকাশের মধ্যে এক মূলীভূত চিৎশক্তির আবিষ্কার, বাস্তববোধ-বিবর্জিত ভাবোন্মত্ততা, বস্তুসত্তার চারিদিকে এক অতীন্দ্রিয় সর্বব্যাপী ভাবসত্তার সমাবেশ, সর্বোপরি অন্তরাবেগের বহিঃপ্রকাশ রূপে ছন্দঝংকারের করুণ-কোমল ভাবব্যঞ্জনা—এই সমস্ত দিক দিয়া বিহারীলাল একেবারে স্বতন্ত্র।" (ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সমালোচনা-সাহিত্য', ভূমিকা)। সমগ্র জীবন ও নিখিল বিশ্বের মর্মকোষে অবস্থিত ভাবসৌন্দর্যের জন্য কবির ব্যাকুলতা; বিস্ময় ও রহস্যবোধ, না পাইবার জন্য গভীর বিষাদবোধ—এই সবই বাংলাকাব্যে প্রথম এবং এখানেই রোমান্টিকতার সূচনা।

রোমান্টিক কবিভাবনার প্রধান লক্ষণ বিহারীলালে আছে—অপ্রাপণীয়ের জন্য আকুতি ও বেদনা।

রোমান্টিক বিষাদের প্রবর্তক হিসাবে বিহারীলালের কৃতিত্ব তাই অনস্বীকার্য। তাঁহার প্রকৃতি-কবিতা ও প্রেমকবিতা উভয়ত্রই এই রোমান্টিক বিষাদের সুর লক্ষ্য করা যায়।

'নিসর্গ-সন্দর্শন' (১৮৭০) কাব্যের প্রকৃতি-চিত্রে প্রাথমিক স্তরের বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী—'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০) কাব্যেই কবি নিজস্ব প্রকাশ-মাধ্যম আয়ত্ত করিয়াছেন। শহুরে পরিবেশ হইতে দূরে গ্রামে প্রকৃতির স্নেহ-ক্রোড়ে শান্তি লাভের ইচ্ছা 'উপহার' অংশে কবি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম এখানেই রোমান্টিক বেদনার সুর লাগিয়াছে:

বৃথা হেন কত ভাবি মনে,
বিনোদিনী কল্পনার সনে,

জুড়াইতে এ অনল,
মৃত্যু ভিন্ন অন্য জল
বুঝি আর নাই এ ভুবনে !
হায় রে সে মজার স্বপন
কোথা উবে গিয়েছে এখন,
মোহিনী মায়ায় যার,
সবে ছিল আপনার,
যবে সবে নূতন যৌবন !
ওহে যুবা সরল সুজন,
আছ বড় মজায় এখন,
হয় হয় প্রায় ভোর ;
ছোটে ছোটে ঘুমঘোর,
উঠ এই করিতে ক্রন্দন !

রোমাণ্টিক বেদনার এই বহিঃপ্রকাশ অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের। এই বেদনা গভীর হইয়াছে 'সারদামঙ্গল' কাব্যে।

'সংগীত শতক' (১৮৬২) কাব্যে বিহারীলাল আদর্শায়িত প্রেমকবিতার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। প্রেমের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আলোচনান্তে কবি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, বাস্তব জগতে প্রেমের কোনো লৌকিক ভিত্তি নাই। প্রেমলাভের জন্য যে যোগ্যতা আবশ্যক তাহার অভাব ঘটিলে জীবনে বঞ্চনা প্রাধান্য লাভ করে। তাই খেদের সুরে কবির স্বীকৃতি :

হায়, যে সুখ হারায় !
সে সুখের সম নাহি তুলনায়।
সাগরে ডুবিলে পৃথিবী ঘুঁটিলে
আকাশে উঠিলে,
পাতালে পশিলে,
পরাণ সঁপিলে, সহস্র করিলেও,
তবু কি সে নিধি আর পাওয়া যায় ? (৬০ সং)

তাই ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর—ক্ষোভ ও বেদনার পর প্রশান্তির সুর শুনি। তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করিয়াছি।

সংগীতশক ও বঙ্গসুন্দরী কাব্যের বিষাদ ও প্রশান্তি সারদামঙ্গলে অপ্রাপণীয়ের জন্য গভীর ব্যাকুলতায় নিজেকে শতধা-বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।

আদি কবির তপোবনে যে দেবীর আবির্ভাব হইল তিনি 'জ্যোতির্ময়ী' কন্যা, 'যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে' ; তিনিই বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী। ইহার প্রসাদ লাভের জন্য কবির ব্যাকুল অভিসার। এই লাবণ্যময়ীর উদ্দেশেই কবির ব্যাকুল প্রেমাবেদন।

এই দেবীর অদর্শনে সমগ্র প্রকৃতি কাঁদিবে—বনভূমি, হরিণী, নির্ঝরিণী —সকলেই 'করুণ ক্রন্দন হাহাকারে' মরিবে, তাই—

ভেবে সে শোকের মুখ
বিদরে আমার বুক,
মরিতে পারিনে তাই আপনার হাতে।···
কি করিব, কোথা যাব,
কোথা গেলে দেখা পাব,
হৃদি-কমল-বাসিনী কোথা রে আমার!
কোথা সে প্রাণের আলো,
পূর্ণিমা-চন্দ্রিমাজাল,
কোথা সেই সুধামালা সহাস বয়ান।
কোথা গেলে সঞ্জীবনী!
মণি-হারা মহা খনি,
অহো সেই হৃদিবাক্য কি ঘোর আঁধার!
তুমি তো পাষাণ নও,
দেখি কোন্ প্রাণে সও
অয়ি সুপ্রসন্ন হও কাতর পাগলে!

প্রথম সর্গের এই ব্যাকুল ক্রন্দন দ্বিতীয় সর্গেও সঞ্চারিত হইয়াছে। কবি বিষাদের সুরে গাহিয়াছেন:

হারায়েছি—হারায়েছি রে, সাধের স্বপনের ললনা
মানস-মরালী আমার কোথা গেল বল না!
কমল-কাননে বালা,
করে কত ফুলখেলা,
আহা, তার মালা গাঁথা হল না!
প্রিয় ফুলতরুগণ,
সুধাকর, সমীরণ
বল বল ফিরে কি আর পাব না!
কেন এল চেতনা!

এই দেবী সারদার জন্যই বিহারীলালের রোমান্টিক বেদনাময় ক্রন্দন। একবার কবি বলেন:

সারদা—সারদা—সারদা কোথা রে আমার!
এ জন্মে তোমারে আমি দেখিতে পাব না আর।
ত্যজে এ মরতভূমি,
কোথা চলে গেলে তুমি।
এস দেবি, এস এস দেখি একবার!

সয়েছি বিরহ-ব্যথা
ধরি ধরি আশালতা ;
কি ঘোর এ শূন্যময়, কেবল আঁধার !
তুমিও গিয়েছ চলে,
ধরা গেছে রসাতলে ;
বাতাস আকাশ ভোরে করে হাহাকার !
('কবিতা ও সংগীত': ৯)

কখনো বলেন :

কোথা লুকালে,
ত্যজিয়ে আমারে।
ত্রিভুবন আলো করে এই যে জ্বলিতে ছিলে।
লুকাল তপন শশী,
ফুরাল প্রাণের হাসি,
চিরদিন এ জীবন তিমিরে ডুবালে ! (৩)

কখনো বা এ বেদনার ভারে নমিত হৃদয়ের ক্রন্দন :

প্রাণে সহে না—সহে না—সহে না ক' আর !
জীবন-কুসুমলতা কোথা রে আমার।
কোথা সে ত্রিদিবজ্যোতি,
কোথা সে অমরাবতী,
ফুরাল স্বপন-খেলা সকলি আঁধার। (২)

স্বপ্নভঙ্গের এই বেদনাই বিষাদের সুরে বিহারীলালের কাব্যে অনুরণিত হইয়াছে।

বিলাপপ্রধান বিষাদ-কবিতা

আশার ছলনায় মুগ্ধ ও প্রতারিত কবিচিত্তের ব্যর্থ জীবনের জন্য বিলাপ এই সময়ে বারেবারেই বাংলা কাব্যে ধ্বনিত হইয়াছে। মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র বিহারীলালের ন্যায় প্রধান কবিদের কাব্যেই নহে, অপ্রধান কবিদের লেখাতেও এই ব্যর্থআশ বিশ্বাসরিক্ত জীবনের করুণ বিলাপ শোনা যায়।

প্রিয়নাথ মিত্র তাঁহার 'হেসো না' কবিতায় ('হরিষে বিষাদ' কাব্য) বলিয়াছেন :

হেসো না প্রকৃতি— পরি' নব নব বেশ
মধু সমাগমে ফুল আভরণে ;
হেসো না কমল—বসি স্বচ্ছ সর-নীরে,
ও হাসি এখন লাগে না ভাল।......

নাহি ক' সেদিন, নাহি জীবনের সুখ,
কালের প্রবাহে ভাসিয়ে গেছে।
নাহি আশা, অভিলাষ, পিরীতি, প্রণয়,
জল অরু সম শুকায়ে গেছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অন্তিম বাসনা' ('কাব্যমালা') প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

অস্তাচলে গেল গো দিনমণি
আইল রজনী
উঠিল শশধর রজত-রুচি।
জীবনের সুখের দিনে—হায়
এমনি চলি যায়
রঙ্গভঙ্গ যায় চকিতে ঘুচি ॥......
ভাব এক এমনি—মরি হায়
কি যেন মৃদু বায়—
যাবে চলি' আমার উপর দিয়া।
মনে হবে জীবনযাত্রা মোর
হইয়ে এল ভোর,
বিশ্রাম করিবারে চাহিবে হিয়া ॥

যোগেন্দ্রনাথ সেন 'উষা' কাব্যের 'কস্তুরিকা মৃগ' কবিতায় মৃগের সহিত নিজের জীবনের তুলনা করিয়া খেদ করিয়াছেন—

হায় ও মৃগের সম,
অমূল্য জীবন মম
বৃথা কাটিলাম,
ভ্রান্ত হয়ে সুখ-আশে,
সংসার অরণ্যে আমি
বৃথা ছুটিলাম!
আমার পরশমণি
হৃদয়ে রাজিছে আহা
নাহি দেখিলাম,
ভোগ-আশে মত্ত হয়ে
বাণবিদ্ধ মৃগ সম
বৃথা মরিলাম।

বিচ্ছেদমূলক বিষাদ-কবিতা

আর এক শ্রেণীর কবিতা আছে যাহার উৎস সংসারে স্নেহের সম্পর্কে বিরতি বা প্রিয়জন-বিচ্ছেদ। এখানে ব্যক্তিগত শোক অপেক্ষা সংসারের পটভূমিতে যে ক্ষতি ও শূন্যতাবোধ তাহাই প্রাধান্য লাভ করে।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'অকালে বিজয়া' ('কবিতামালা' : ১৮৭৭) এই ধরণের কবিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে প্রিয়-বিরহের বেদনা খুব গভীর ও আন্তরিক হইয়া উঠিতে পারে নাই। কবি বলিয়াছেন :

> কেন রে অকালে কাল বিজয়া আইল, রে ?
> সোনার প্রতিমা মম সহসা ডুবিল রে।
> হৃদয়ের সিংহাসনে, না তুলিতে সযতনে,
> না পুজিতে প্রেমফুলে, এমনি হইল রে।
> একথা কহিব কায়, দুখে বুক ফাটি যায়,
> আমার মনের আশা মনেই রহিল, রে।

তাই,

> আমার জীবন, হায়, বিফল হইল, রে।
> আমার মাথার মণি খসিয়া পড়িল, রে।

যোগেন্দ্রনাথ সেনের 'প্রেম-ভিখারী' কবিতায় ('ঊষা') একই বেদনা-বিলাপ :

> সংসার-পাথার-মাঝে আমি যে ভিখারী গো
> ভিক্ষা মোরে দাও !
> আমার হৃদয়-নিধি হারায়েছি আমি গো
> কি আর শুধাও ?
> এই ছিল কোথা গেল,
> কোথা এবে লুকাইল,
> আঁধারে করি আলো পরশরতন
> হায় আমি সে রতন হারানু এখন !...
> হায় আমি কোথা যাব ! বহিতে না পারি আর
> এ বিষম শোক।
> কুজ্ঝটিকা অন্ধকার,
> বেড়িয়াছে চারিধার,
> শূন্য—শূন্য—সব শূন্য, অনন্ত গগন
> অভাগারে নাহি করে কর বিতরণ।

মুন্সী কায়কোবাদের 'নিবেদনে' ('অশ্রুমালা' কাব্য) এই ক্ষতি ও শূন্যতা-বোধের অপর এক প্রকাশ লক্ষ্য করি। কবির বিশ্বাসরিক্ত হৃদয়ের সুন্দর

এই কবিতাটি। আজ তিনি অভিমান ভরে সব কিছুই অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করিতেছেন :

আঁধারে এসেছি আমি
আঁধারেই যেতে চাই!
তোরা কেন পিছু পিছু
আমারে ডাকিস্ ভাই !···
অনাদর—অবজ্ঞায়
সদা তুষ্ট মম প্রাণ,
সংসার-বিরাগী আমি
আমার কিসের মান ?
চাইনে আদর স্নেহ, চাইনে সুখের গেহ
ফলমূল খাদ্য মোর,
তরুতলে বাসস্থান !······
শোকে তাপে এ হৃদয়
হয়ে গেছে ঘোর কালো !
আঁধারে থাকিতে চাই
ভাল যে বাসিনে ভালো !
আমি যে পাগল কবি,
দীনতার পূর্ণ ছবি,
স'বি করে 'দূর দূর'
তোরা কি বাসিস ভালো ?

এই কবিতায় সংসার-বৈরাগ্য নয়, সংসারের প্রতি অভিমানই বড় কথা।

এই অভিমান, এই বেদনা, এই শূন্যতার সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়াছে গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতায়। কবি স্বভাবেই প্রবল অভিমানী ছিলেন; সে অভিমান 'কোথায় যাই' ('প্রেম ও ফুল' : ১৮৮৮) কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে :

আর ত পারিনা আমি নিতে!
করুণার মমতার, এ বোঝা--এত ভার,
আর আমি পারি না বহিতে।
এত দয়া অনুগ্রহ, কেমনে সহিব কহ
আর না কুলায় শকতিতে!
হৃদয় গিয়েছে ভরে নয়ন উছলে পড়ে
ধরে না ধরে না অঞ্জলিতে,
ভাসিয়া যেতেছি হায়, করুণায় মমতায়,
অলস অবশ সাঁতারিতে।

কবির জীবনে প্রিয়া-বিচ্ছেদে যে শূন্যতা তাহা আজ নূতন করিয়া করুণা

মমতায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তথাপি কবির হৃদয়ের আর্ত বেদনা রহিয়া গিয়াছে—

আমারে দিও না কেহ, আর এ মমতা স্নেহ,
আর অশ্রু পারিনা মুছিতে !
এত স্নেহ মমতায়, কত যে যাতনা হায়,
যে না পায়, পারে না বুঝিতে।

গোবিন্দ দাসের এই যে প্রবল অভিমান, তাহার আরেক প্রকাশ ঘটিয়াছে 'আমার চিতায় দিবে মঠ' (১৯১১) কবিতায়—

ও তাই বঙ্গবাসী আমি মর্লে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ !

এই শ্রেণীর কবিতায় কবিকল্পনা উচ্চগ্রামে উঠে নাই, কবিরা একান্ত বাস্তব জীবনের ক্ষতি ও শূন্যতাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। ফলে এখানে যে বিষাদের সুর শুনি তাহা অগভীর ; যে বেদনার আর্তি এখানে ধ্বনিত হয় তাহা মর্মে প্রবেশ করে না। বাংলা বিষাদ-কবিতার প্রথম যুগে সাংসারিক বিবেচনাবোধের দ্বারা হৃদয়বেদনা পরিমাপের প্রয়াস সেদিন কবিকল্পনাকে খঞ্জ করিয়া রাখিয়াছিল। বিহারীলালের যে রোমান্টিক বিষাদ তাহার উঁচু সুরের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের শোকদুঃখকে বাঁধিবার ক্ষমতা এই শ্রেণীর কবিদের ছিল না। সে ক্ষমতা পরে রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার প্রমথনাথ রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে দেখা গিয়াছে।

মহিলা-কবি-রচিত বিষাদ-কবিতা

গত শতাব্দীর মহিলা-কবিদের লেখার প্রধান সুর বিষাদের সুর। ইহার কারণ কি? ইহাদের কবিতায় বিষাদের সুর অবিচ্ছিন্ন কেন? কেন ছত্রে ছত্রে এমন আশাভঙ্গের খেদ, জীবনে অনীহা, মৃত্যুর আবাহন?—এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে মহিলা-কবিদের জীবনেতিহাস আলোচনা করিতে হয়। মনে হয় উনবিংশ শতাব্দের মহিলা-রচিত কাব্য প্রায় গোটাটাই উৎসারিত হইয়াছে কোনো শোকবিধুর সান্ধ্য উপত্যকা হইতে। কবিদের মধ্যে প্রসন্নময়ী দেবীর স্বামী ছিলেন উন্মাদ ; গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, সরলাবালা সরকার, প্রিয়ম্বদা দেবী—ইহাদের কাহারো বিবাহজীবন সুখের হয় নাই। ইহারা প্রত্যেকেই স্বামী হারাইয়াছেন উনিশ হইতে পঁচিশের মধ্যে। কামিনী রায় যদিও বিবাহ করিয়াছিলেন অনেক বেশি বয়সে, তাঁহারও স্বামীর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় কয়েক বৎসরের মধ্যেই। রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লজ্জাবতী বসু আজীবন অবিবাহিতাই ছিলেন।

এক কথায় গত শতাব্দের মহিলা-কবিদের লেখার পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয়—ইহা স্বামীহীনার স্বগতোক্তি। জীবনের শোকতাপ ইঁহাদের

কবিতায় একটি আন্তরিকতা দান করিয়াছে। রূপকর্মে দক্ষা না হওয়া সত্ত্বেও আন্তরিকতার জোরেই হৃদয়াবেগকে ইহারা সফলতার উত্তীর্ণ স্তরে করিয়াছেন। গত শতাব্দের পুরুষ-কবিদের যতটা আন্তরিকতা ছিল, মহিলা-কবিদের আন্তরিকতা তদপেক্ষা বেশি বলিয়াই মনে হয়।

এই অকপট আন্তরিকতা ও সুগভীর বিষাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাক্।

'বনলতা' (১৮৮০) ও 'নীহারিকা' (১৮৮৪।৯৬) কাব্যের রচয়িত্রী প্রসন্নময়ীর দেবীর কবিতা—

আর কি দেখিব সেই সুখের স্বপন ?
জীবনে কি সে চিত্রের পাব দরশন ?
আজীবন কাঁদিবারে
জাগিলাম—মরিবারে
মুহূর্তে মুহূর্তে মৃত্যু ! নিরাশে অনল
জ্বলিবে, পিপাসা মম বাড়িবে কেবল। ('কেন জাগিলাম')

পঙ্কজিনী বসু তরুণ বয়সেই অজানা পথের সন্ধান খুঁজিয়াছেন—

এ ধরার খেলা সাঙ্গ হলে,
নাহি জানি যাইব কোথায় ;
মাঝে মাঝে তাই থেকে থেকে
কাঁপে বক্ষ সন্দেহ-শংকায়।
কখনো মরণ ভাল লাগে,
কিন্তু পুনঃ হয় বড় ভয়,
পাছে মহাশূন্যতার মাঝে
শান্তিহারা ঘুরিবারে হয়।
মৃত্যুতেও শান্তি যদি নাই,
তবে থাকি কিসের আশায় ?

সতের বৎসর বয়সে শেষ শয্যায় শুইয়া কবি মরণকে আহ্বান জানাইয়াছেন,

তোমারি স্নেহের কোলে
জানি আমি এক দিন,
অবশ আকুল প্রাণ
ধীরে ধীরে হব লীন।
তাই তো মুগ্ধের মত
সদা আমি চেয়ে থাকি,
কোথায় মরণ, এস,
সে দিনের কত বাকী ?
(রচনা—১৯০০ ; 'স্মৃতিকণা' ১৯০২)

সরলাবালা সরকারের লেখায় জীবনে অনীহা প্রকাশ পাইয়াছে—

আমি এক প্রভাতের কবি
এ জীবন শিশিরের মত,
প্রভাত ফুরায়ে গেছে হায়,
তাই বড় হয়েছি বিব্রত!
শিশির শুখায়ে গেছে বনে
প্রভাতের বিদায়ের সনে,
শুখায়েছি, তবু বেঁচে আছি
দগ্ধ হয়ে তপন কিরণে।
শিশির শুখায়ে গেল বনে,
প্রভাত ফুরায়ে গেল হায়,
আমি এক প্রভাতের কবি
এ জীবন কেন না ফুরায়!

(রচনা—১৮৭০ ; 'প্রবাহ' ১৯০৪)

বিনয়কুমারী ধরের 'কে বুঝিবে' কবিতায় এই একই বিলাপ :

নিরখি নয়ন কোণে এক বিন্দু অশ্রুবারি,
কে বুঝিবে বল?
প্রাণের ভিতরে তব কি সিন্ধু লুকায়ে আছে
কত তার তরঙ্গ প্রবল!
একটি দীরঘ শ্বাসে, কে বুঝিবে, এ জগতে
কি ভীম তুফান
হৃদয়ের মাঝে তব, বহিতেছে দিবানিশি
চূরমার করিছে পরাণ!
শুনিয়া ও ক্ষীণ কণ্ঠে বিষাদের মৃদু তান,
কে বুঝিবে হায়?
কি গভীর মর্মোচ্ছ্বাসে কি গভীর হাহাকারে
বুক তব ভেঙ্গে নিতি যায়!
সজল নয়নযুগে কাতর চাহনি আধ,
দেখে একবার।
কে বুঝিবে হৃদি মাঝে আকুল পিয়াস-ভরা
কি বাসনা, কি ভিক্ষা তোমার?
বিন্দুমাত্র দেখাইয়া বুঝাইতে সব কথা,
কেন আকিঞ্চন!
কে এত মরমগ্রাহী দেখিয়া বালুকাকণা
মরুদৃশ্য বুঝিবে কেমন?

('নির্ঝর' : ১৮৯১)

প্রমীলা নাগের (বসু)—

নয়নের শুকাল না জল,
পূরিল না জীবনের আশা !
ঘুচিল না প্রাণের আঁধার
গেল না সে স্নেহের পিপাসা।
নিভৃত এ হৃদয় মন্দিরে
দেখিল না কেহ এই প্রাণ !
এ গভীর নয়নের জলে
কেহ, দুটি অশ্রু করিল না দান !
('তটিনী' : ১৮৯২)

লজ্জাবতী বসুর—

কেন এ অতৃপ্তি-উর্ম্মি হৃদি-পারাবার
উথলিয়া কূলে কূলে করিছে রোদন ?
কি অভাব আকুলতা, কোন্ তৃষা তরে ?
চাহিছে সাধিতে সদা কোন্ সে সাধন ?
('অতৃপ্তি' : ১৯০২)

রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর স্বামীবিয়োগবেদনার প্রকাশ 'বিদায়' কবিতাটি—

চিরতরে চলে গেছে হৃদয়ের রাজ,
অতল বিষাদে মোরে ডুবাইয়ে আজ !
নিয়ে গেছে সুখসাধ সুখের বাসনা,
রেখে গেছে জন্মশোধ হৃদয়-বেদনা !···
নিবে গেছে নয়নের শুভ্র দীপ্তি আলো,
প্রাণে শুধু নেমে আসে ঘোর ছায়া কালো !
গিয়েছে সকলি মম কিছু নাহি আর,
রয়েছে কেবল স্মৃতি আর অশ্রুধার !
('শোকগাথা' : ১৯০৬)

স্বর্ণকুমারী দেবীও পরিণত বয়সে বিষাদ-করুণ সুরে গাহিয়াছিলেন :

শীতল শান্ত বেলা
পান্থ আমি অতি শ্রান্ত একেলা বড় একেলা !
বাতাস গাহিছে মর্ম-কাহিনী,
পাতায় পাতায় হৃদয়দাহিনী
করুণ হতাশ দোলা !
পান্থ আমি অতি শ্রান্ত একেলা বড় একেলা !
তলায় তলায় তরুবীথিকার ঘন কজ্জল ছায়া,

তার মায়া নাই তবু, মায়া নাই তার গো,
অসহন দুঃখ জ্বালা,
বড় একেলা আমি বড় একেলা।

দুঃখবাদিনী স্বামি-বিরহিণী প্রিয়ম্বদা দেবী 'রেণু' কাব্যে (১৯০০) ব্যাকুল করুণ সুরে বলিয়াছেন :

আমার সকল আলো অঞ্জলি ভরিয়া
প্রিয় সে, আপন ঘরে রেখেছে হরিয়া !
দিন পরে দিন যায়, মাস পরে মাস,
এ চিরজীবনে তাই আঁধার আকাশ !
গিয়াছে বিদায় নিয়ে আসিবে না আর,
আজিও স্নেহের ভুলে হৃদয় আমার
সে কথা মানে না তবু; তাই ঘুরে ফিরে
কভু হাসি মুখে, কভু নয়নের নীরে
রচি গান, গাঁথি মালা, আশা করে মনে
সকলি জানিছ তুমি না জানি কেমনে !

সরলাবালা দাসী 'চাতকিনী' কবিতায় বলিয়াছেন :

আর কিছু নাই কথা,
দে জল এই কি ব্যথা ?
বেজেছে কি বুকে তোর, ঝরিছে নয়ন।
চাতকিনি, এস কাছে দিব গো তোমায়
এ আঁখিতে যত জল,
নিত্য করে ঢল ঢল,
তা'তে সখি তৃষ্ণা তোর মিটিবে না হায়।
('মিরণ' : ১৯১১)

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফীর 'শেষ' কবিতাটিতে প্রাণের আন্তরিক বেদনার সুর শুনিতে পাই :

কি শেষ ? কিসের শেষ ? মরমের ব্যথা ?
কি শেষ ? কিসের শেষ ? মরমের কথা ?
সে ব্যথা মরমে মোর নীরবে নীরবে আছে,
বলিনি তা বলিব না জীবনে কাহারো কাছে।
তার নাকি আছে শেষ এ পোড়া ধরাতে হায় !
সে অনন্ত ব্যথা নাকি বলে' শেষ করা যায় !
হয় না ক' শেষ যদি হায় এ যাতনা ক্লেশ,
তাবে শেষ লিখি কেন ? কিসের গো এই শেষ ?

পরাণের দুটি কথা বিন্দু মর্ম ব্যথা-ডোর
দিয়া গাঁথিয়াছি মালা তারই আজ শেষ মোর ॥
('মর্মগাথা' : ১৮৯৬)

সরোজকুমারী দেবী 'হাসি ও অশ্রু' কাব্যে (১৮৯৫) হৃদয়বেদনা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

আকুল মর্মের মাঝে যে উন্মাদ স্বর বাজে
দুটি ছত্র লিখিতে বাসনা
গোপন হৃদয় ছায় যে সিন্ধু উচ্ছ্বাসে হায়
কি জানাবে দুটি অশ্রুকণা !

এইবার তিন প্রধান মহিলা-কবির কাব্যালোচনা করিয়া বিষাদের কাব্য-ধারাটিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিব। ইঁহারা হইতেছেন : গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর স্বামী ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। স্বামিবিয়োগ-বিধুরা গিরীন্দ্রমোহিনী 'অশ্রুকণা' কাব্য (১৮৮৭) প্রকাশ করেন। কবির শোকোচ্ছ্বাস সংকীর্ণ ও ব্যক্তিগত নহে, তাহা ব্যক্তিসীমাকে উত্তীর্ণ করিয়াছে। অনাড়ম্বর মর্মস্পর্শী আন্তরিক শোক-কাব্য হিসাবে বাংলা কাব্যসংসারে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। অক্ষয় চৌধুরী ও দেবেন্দ্র-নাথ সেন এই কাব্যের প্রশংসা করিয়া দুইটি কবিতা লিখিয়াছিলেন।

'অশ্রুকণা'র কথা বলিতে গিয়া কবি প্রথমেই বলিতেছেন :

এ নয় সে অশ্রুরেখা,
মানান্তে নয়ন কোণে,
ঝরিতে যা চাহিত না
দেখা হ'লে ফুলবনে।
সে অশ্রু এ নয় সখা,
দীর্ঘ বিরহের পরে
ফুটিয়া উঠিত যাহা
হাসির কমল-থরে।
এ শোকাশ্রু !
হৃদয়ের উন্মত্ত আহ্বান !
এ শোকাশ্রু !
জীবনের জন্মান্ত আলিঙ্গন।

বিষাদের সূচনা হইতে শেষে অন্তহীন ধূসর জীবনপথে যাত্রার খুঁটিনাটি ছবি কবি আঁকিয়াছেন এবং ইহাতে এমন একটি আর্ত বেদনার স্বর শোনা যায় যাহা পাঠকের মনকে বিদ্ধ করে। জীবনের একটু একটু করিয়া অপচয়ের

মধ্য দিয়া যে বেদনারস ক্ষরিত হইয়াছে, কবি অনুপম বর্ণনায় তাহা চিত্রিত করিয়াছেন, শোককে ব্যক্তিসীমা উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

'ভাব' কবিতায় গিরীন্দ্রমোহিনী স্বীকার করিয়াছেন :

একটু একটু করি জীবন করিয়া চুরি,
অনন্তে মিলায়ে গেল কত দিবা-বিভাবরী!

এখন,

গেছে সুখ, যায় দুখ, নীরবে যেতেছে প্রাণ;
বুঝাবারে পারিনু না একটি প্রাণের গান!
এ জনমে কিছু তবে বলা হইল না কথা!
মরমে রহিল ভাব, হৃদয়ে রহিল ব্যথা!

'পূর্বছায়া' কবিতায় ভাবী বিপদাশংকা প্রকাশান্তে কবির ব্যাকুল জিজ্ঞাসা :

সমাপন কবে হবে এই দুঃখ-গান?
কবে রে মুদিব আমি সজল নয়ান?

সুখ-আশে অন্তহীন পরিক্রমার শ্রান্তি এই দুই চরণে ঘনাইয়াছে :

হেথা ত হ'ল না সুখ; অবিরত বলি।
জানিনা কি সুখ-আশে কোথা যাই চলি!

কিন্তু যদি—

জীবনের পর-পার!
যে চির-বিস্মৃতি চাও—
সেথা যদি নাহি পাও?
সেথা যদি থাকে স্মৃতি—আর কিছু নয়!
কি করিবি—কি করিবি, তখন হৃদয়?

এ বেদনায় গভীরতা আছে, উচ্ছ্বাস নাই; আন্তরিকতা আছে, আড়ম্বর নাই। অন্তহীন পথে বেদনারঞ্জিত চরণে কবি যে যাত্রা করিয়াছেন, তাহার জন্য কোন আক্ষেপ নহে, কেবল একটি ব্যাকুল শ্রান্ত জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হইয়াছে—

এ দীর্ঘ জীবন-পথে
একেলা কি হ'বে যেতে?
পথে কি হবে না দেখা সঙ্গে কভু তার!
কে বলে দেবে গো মোরে,
পাব কত দিন পরে?
নিকটে কি আছে দূরে, কোথা সে আমার!

পরবর্তী কাব্য 'আভাষে' (১৮৯০) এই ব্যাকুল বেদনারই সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

সেখানে কবি ব্যাকুল জিজ্ঞাসা অন্তে প্রশান্তি লাভের প্রয়াস করিয়াছেন। বেদনাময় সুরেই কবি এ অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন—

বসে ওই মেঘের 'পরে সাধ করে সই যাইলো ভেসে,
হৃদয়ের ধন, প্রাণের রতন আছে যেথায় যাই সে দেশে!

শেষে "ব'সে ব'সে" কবিতায় কবি সান্ত্বনা খুঁজিয়াছেন এইভাবে—

দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি!
আঁধার রজনী ঘোরা,
আকাশ চন্দ্রমা-হারা,
শিরোপরে মিটি মিটি
জ্বলিতেছে তারাগুলি,
দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে ঢেউ গণি!

এখানে কবিকল্পনা শোকাঘাতে উচ্চস্তরে উত্তীর্ণ হয় নাই, এ যেন শোকের রহিয়া-রহিয়া স্মৃতি-রোমন্থন।

গত শতাব্দের মহিলাকবিদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া কামিনী রায়ের লেখায় একটি নিরবচ্ছিন্ন বিষাদের সুর লক্ষ্য করা যায়। এ বিষাদের উৎস জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অনীহা। তাঁহার 'আলো ও ছায়া' কাব্য (১৮৮৯) তাঁহার বিবাহের পূর্বেই রচিত ও প্রকাশিত হয়। সুতরাং ব্যক্তিগত শোক নহে, রোমান্টিক বিষাদই তাঁহার কাব্যের মূল ভিত্তি। প্রথম যৌবনেই কবি হৃদয়-অরণ্যে কাঁদিয়া ফিরিয়াছেন। মানবজীবনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতনতা এই বিষাদের প্রেরণা দিয়াছে।

'দিন চলে যায়' কবিতায় অতিক্রান্ত জীবনের হাহাকার ধ্বনিত হইয়াছে:

একে একে একে হায়! দিনগুলি চলে যায়,
কালের প্রবাহ 'পরে প্রবাহ গড়ায়,
সাগরে বুদ্বুদ্ মত . উন্মত্ত বাসনা যত
হৃদয়ের আশা শত হৃদয়ে মিলায়,
আর দিন চলে যায়।

কিন্তু এ হাহাকার কবির হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইয়াছে কিনা, সে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক, কেননা শেষ দিকে ইহা নীতিগন্ধী হইয়া উঠিয়াছে:

নিশ্বাস নয়নজল মানবের শোকানল
একটু একটু করি ক্রমশঃ নিবায়,
স্মৃতি শুধু জেগে রবে, অতীত কাহিনী কহে,
লাগে যত নিশীথের স্বপনের প্রায়;
আর দিন চলে যায়।

'এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার ছয়মাস পূর্বে' ১৮৮০ সালের ৩০শে জুন তারিখে, ষোল বৎসর বয়সে কামিনী রায় 'সুখ' কবিতাটি রচনা করেন। সংসারানভিজ্ঞা বালিকার পক্ষে এই খেদ প্রকাশ করা কতদূর সম্ভব, সে কথা আলোচনা না করিয়াই বলা চলে ইহাতে আন্তরিকতার স্পর্শ আছে। তবে প্রত্যক্ষ দুঃখাঘাতে ইহা উৎসারিত হয় নাই বলিয়াই বোধকরি ইহার শেষে কবি একটি নীতি যোগ করিয়াছেন—

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

প্রত্যক্ষ জীবন হইতে উদ্ভূত হইলে এই নীতি জুড়িয়া দিবার প্রয়োজন থাকিত না।

যাই হোক, কামিনী রায়ের কাব্যের মূল সুরটি এই 'সুখ' কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন :

নাই কিরে সুখ? নাই কিরে সুখ?—
এ ধরা কি শুধু বিষাদময়?
যতনে জ্বলিয়া কাঁদিয়া মরিতে
কেবলি কি নর জনম লয়?······
বল্ ছিন্ন বীণে, বল উচ্চৈঃস্বরে,—
না,—না,—না,—মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর,
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।

শেষে বিষাদের বিষণ্ণ উপত্যকা উত্তীর্ণ হইবার জন্য কবি পরহিতের পথ নির্দেশ করিয়াছেন।

মানকুমারী বসুর 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' (১৮৯৩) পতিবিয়োগবিধুরার আর্ত ক্রন্দনে ভরা। অষ্টাদশী তরুণী স্বামিহীনা হইয়া দীর্ঘ আশি বৎসর পর্যন্ত জীবনের উপলবন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়াছেন; এই পথের দুই ধারে কবিহৃদয়ের বেদনা যে কত কণ্টককে রক্তগোলাপে পরিণত করিয়াছে, তাহারই পরিচয় এই কাব্যে পাওয়া যায়। সংসারে সর্বসুখবর্জিতা রমণীর সকল বেদনার নিরাভরণ সরল প্রকাশ এই কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। এই কাব্যে এমন একটি আন্তরিকতা ও বিষাদের মর্মস্পর্শী আবেদন আছে যাহা আমাদের হৃদয়কে অভিভূত করে। 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি'তে মানকুমারী 'history of her own soul'—নিজ প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

কবি এই 'সাধ' প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
দু'টো কথা না কহিতে,
দু'টি বার না চাহিতে,
আপনি পোহায়ে যায় যামিনী সাধের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

তাই কবির অভিলাষ,—

এবার তো কর্মভোগ ভুগিলাম ঢের—
কালের তরঙ্গে ভাসি,
ফিরে যদি ভবে আসি,
তুমি স্রোত আমি ঢেউ হব সাগরের,
মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের !
ফুল হয়ে ফুটে থাক সুখ-সোহাগের—
আমিও অনিল হব,
তোমারি সৌরভ ব'ব,
জুড়াব পরাণ-মন কত তাপিতের,
এ আমার বড় সাধ চির জনমের !

'একা' কবিতায় পতিবিয়োগবিধুরার আর্ত ক্রন্দন অতিক্রম করিয়া এক বলিষ্ঠ বিশ্বাস, পরলোকের আশা ধ্বনিত হইয়াছে।

একা আমি, চিরদিন একা
সে কেন দুদিন দিল দেখা ?
আঁধারে ছিলাম ভাল
কেন বা জ্বলিল আলো ?
অঁাধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা !
ভুলে ভুলে ভালবাসা
ভুলে ভুলে সে দুরাশা
ভুলে মুছিল না শুধু কপালের লেখা !......
একা আমি চিরদিন একা,
তবু সে দু'দিন দিল দেখা !
এখন বাসনা তাই
কোটি পরমায়ু পাই
তাহারি তপস্যা করি কপালের লেখা !
তারি লাগি বসুন্ধরা
হাসি-ভরা কান্না-ভরা
জীবনের মূল তত্ত্ব তারি লাগি শেখা !

সে আলোকে আলো পথ
ত্রিদিবের পুষ্পরথ !
ওপারে অনন্তপুরী যায় যেন দেখা
যে ক'দিন থাকে প্রাণ
এই ক'রো ভগবান !
গাই যেন তারি গান বসি' একা একা !

শোক-বিষাদ ও প্রচলিত কাব্যপ্রথা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে বিষাদ ও শোকের বহুল ব্যবহার হইয়াছিল, একথা স্বীকার্য। কয়েকটি শোকগাথার এখানে উল্লেখ করা গেল:

রামদাস সেন—বিলাপতরঙ্গ (১৮৬৪)
রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—মিত্রবিলাপ (১৮৬৯)
বিহারীলাল চক্রবর্তী—বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০)
বিজয়কৃষ্ণ বসু—বিলাপসিন্ধু (১৮৭৪)
সুশীলগোপাল বসু—শোক ও শান্তি
গিরিজাকুমার—পত্রপুষ্প
অক্ষয় চৌধুরী—উদাসিনী (১৮৭৪)
নবীনকালী দেবী—শ্মশান-ভ্রমণ (১৮৭৯)
ইন্দুমতী দাসী—দুঃখমালা (১৮৭৪)
অন্নদাসুন্দরী দেবী—অবলাবিলাপ (১৮৭২)
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—যোগেশ (১৮৮১)
হরিশ্চন্দ্র মিত্র—নির্বাসিতা সীতা (১৮৯৩)
নবীনচন্দ্র দাস—শোকগীতি (১৯০০)
যদুনাথ চক্রবর্তী—সতীপ্রশস্তি
মুন্সী কায়কোবাদ—শ্মশানভস্ম কাব্য
শেখ মোঃ জমিরুদ্দীন—শোকানল
গগনচন্দ্র রায়—বিলাপলহরী
বলাইচাঁদ সেন—বিলাপলহরী
গোবিন্দ চৌধুরী—বিলাপমালা
নিবারণ চৌধুরী—বিলাপ সংগ্রহ
সুরেশচন্দ্র ঘোষ—শোক ও সান্ত্বনা
রামলাল কাব্যতীর্থ—শোকশান্তি
অনঙ্গমোহিনী দেবী—শোকগাথা

রোমান্টিক বিষাদের বিশুদ্ধ গীতিরস এই কাব্যসমূহে উৎসারিত হয় নাই। এগুলির মধ্য দিয়া বিষাদপূর্ণ জীবনদর্শন প্রকাশ পাইয়াছে—তবে তাহা সর্বত্র গীতিকবিতার উচ্চ স্তরে পৌছায় নাই। সেই জন্যই এই বিষাদের অনুভাবনা আন্তরিক কিনা, সে সন্দেহ থাকিয়াই যায়। এগুলিতে সাধারণতঃ শোক-জনিত বিষাদ (Bereavement) ও জীবনের অনিত্যতা ও চঞ্চলতার জন্য খেদ প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি বাংলা বিষাদ-কাব্যের সূচনায় জীবনের অনিত্যতাই প্রেরণা জোগাইয়া ছিল। মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তারপর শোক-জনিত বিষাদের কবিতা। ইহার আলোচনা আমরা একটু আগেই শেষ করিয়াছি।

শোকজাত বিষাদ-কবিতার উচ্চতম পর্যায়

এখন বাকি রহিল—(১) শোকাঘাতে কবির নবদৃষ্টি লাভ—ব্যক্তিগত শোককে বিশ্বগত সর্বসঞ্চারী বিষাদে পরিণত করার ব্যাকুলতা; এবং (২) বিশ্ববিধান সম্পর্কে ঘনীভূত বিষাদের (Cosmic melancholy) অনুভূতি—হৃদয়-অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত না হওয়ার ব্যাকুল বেদনা। প্রথমটি পাইব অক্ষয় বড়ালে, দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথে।

অক্ষয় বড়ালের 'এষা' (১৯১২) বাংলা সাহিত্যে অন্যতম প্রধান শোক-কাব্য। অক্ষয়কুমারের কাব্যলক্ষ্মী—নারী। কবি 'ভুল', 'কনকাঞ্জলি', হইতে শুরু করিয়া 'প্রদীপ' ও 'শংখ' পর্যন্ত এক অত্যুচ্চ মানস-আদর্শের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। 'এষা'-পূর্ব যুগের কাব্যগুলিতে কবিজীবনের সহিত কাব্যজীবনের যোগ ছিল না, 'এষা'তে সেই যোগ সাধিত হইয়াছে। এই কাব্যসমূহে কবির অতি-উর্দ্ধগ ভাবসর্বস্ব কামনারই জয়জয়কার ; তবে ইহাতে বাস্তবের ক্ষুধা বর্তমান। এগুলিতে প্রেমের অতৃপ্তির সহিত এক তত্ত্বান্বেষী দৃষ্টির মিলন ঘটিয়াছে। বাস্তবকে কবি উপেক্ষা করিতে বা স্বকীয় কল্পনায় গ্রাস করিতে সমর্থ নহেন। এই খানেই অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে—একবার তিনি নারীর সহিত একাত্মতা লাভে একান্ত উৎসুক, পরক্ষণেই আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাই যুগল মিলনেও ব্যর্থ মিলনের হাহাকার ঘুচে না। যিনি 'ভুল' কাব্যে বলেন :

পড়ে আছি নদীকূলে শ্যামদূর্বাদলে—
কি যেন মদিরা-পানে
কি যেন প্রেমের গানে
কি যেন নারীর রূপে ছেয়েছে সকলে !

তিনিই 'কনকাঞ্জলি'তে স্বীকার করেন :

অসমাপ্ত এ চুম্বন, অতৃপ্ত পিপাসা !
এই ত প্রেমের বন্ধ
বাস্তবে স্বপনে দ্বন্দ্ব,
কবিতার চিরানন্দ, সশঙ্ক দুরাশা !

এবং

পরিমলে কুতূহলী,
ফুলে শেষে পায়ে দলি—
তৃপ্তির নরকে জলি অতৃপ্তির খেদে।

নারীর বাস্তব রূপকে অগ্রাহ্য করিয়া একটি আত্মগত আদর্শকে কবি প্রেমের বিষয় করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা 'প্রদীপে' স্বীকার করিয়াছেন ; ইহার পরিণামে যে ব্যর্থতা, তাহাও কবি স্বীকার করিয়াছেন :

প্রণয়ের পরভাগ আপনি গড়িয়া লবে
আপনার কল্পনা-স্বপনে।

এই মতলব শেষ পর্যন্ত খাটে না, কারণ—

তুচ্ছ প্রেমিকের আশা,
ঘোরে না বিধির চক্র
মূলে নাহি পেলে একজনে।

তাই কবি 'শঙ্খ' কাব্যে স্বীকার করিয়াছেন—

ভাবিয়া বিন্দুরে এক ব্যাপ্ত হই বিশ্বময়,
শিখারে, শিখা' সে প্রেমযোগ ;
ছিঁড়ে যাক্ নাভি-শিরা, ঘুচে যাক জীবনের
চিরজন্মগত স্বার্থরোগ।

অক্ষয়কুমার প্রেমের সাধনায় আত্মসমর্পণ না করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিলেন, তাহার পরিণতি লক্ষ্য করা যায় 'এষা' কাব্যে। জীবনের শেষভাগে এই আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিমান ধূলিসাৎ হইয়াছে, নারীর যে বাস্তব রূপকে তিনি এতদিন অস্বীকার করিয়াছিলেন আজ তাহারই পদমূলে কবির অশ্রু-উপচার-সমর্পণ ; এতকালের অবাস্তব বিরহ-বেদনা বাস্তব পত্নীশোকে রূপান্তরিত হইয়াছে, যাহাকে তিনি ভাবের নক্ষত্রলোক ভিন্ন আর কোথাও চিনিতে চাহেন নাই, আজ তাহাকেই কবি স্নেহ-মমতাময়ী গৃহিণী পত্নীরূপে চিনিতে পারিয়া ও সকল অভিমান ত্যাগ করিয়া এই অপূর্ব শোকগাথা রচনা করিয়াছেন।

শোকাঘাতে কবি নবদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। অত্যুচ্চ আদর্শের আকাশ ছাড়িয়া বাস্তবের কঠিন ভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন। এতদিন যাহাকে অস্বীকার করিয়া ছিলেন, আজ তাহাকে হারাইয়া কবির বিলাপ

ও বেদনার অন্ত নাই। ইহাই 'এষা' কাব্য। কবি 'স্মরণযোগ্যা'কে ('এষা'কে) অশ্রুমালা নিবেদন করিয়াছেন। 'উপহার' অংশেই কবির ব্যাকুল নিবেদন চমৎকার রূপে প্রকাশিত হইয়াছে :

কেন আঁখি ছল-ছল্
স্বর্গ-মর্ত্য—রসাতল !
ঝরিছে হৃদয়-ক্ষতে নব রক্তধার।
আবার যে প্রেমোচ্ছ্বাসে
শত প্রাণ ছুটে আসে !
ছিন্ন হয় শত গ্রন্থি মিথ্যা-সান্ত্বনার !
তব বরাভয় করে
ধর কর চিরতরে !
চল—চল নিজ গৃহে—দূর মেঘপার !
প্রিয়তমে, প্রাণাধিকে,
কোথা তুমি—কোন্ দিকে !
জীবনে মরণে আমি তোমার—তোমার !

এত দিনের অবহেলার আজ প্রায়শ্চিত্ত। 'নিবেদন' অংশে কবির স্পষ্ট স্বীকৃতি—

নহে কল্পনার লীলা – স্বরগ নরক ;
বাস্তব জগত এই, মর্মান্তিক ব্যথা।
নহে ছন্দ, ভাব-বন্ধ, বাক্য রসাত্মক ;
মানবীর তরে কাঁদি, যাচি না দেবতা।

আজ সমস্ত অভিমান ও আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কবি 'মানবীর তরে' কাঁদিয়াছেন। পত্নীবিয়োগবেদনা কবির সকল অহংকারকে দূর করিয়াছে। কবির বেদনা যে অতিশয় মর্মান্তিক ও গভীর, তাহার প্রমাণ ভাষার স্বল্পাক্ষরতা ও উপমা-অলংকারের বাহুল্য-বর্জন। দাম্পত্য-প্রেমের ক্ষুদ্র গণ্ডী-টুকুর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াই আজ কবি তাঁহার আধ্যাত্মিক রস-তৃষ্ণাকে মিটাইতে চাহিয়াছেন ; আজ আর বাস্তবসম্পর্কহীন অত্যুচ্চ আদর্শের নভোমণ্ডলে কবি বিহার করিতে চাহেন না। এককথায় ইহা কবির আত্ম-পাপস্খালন ও নবজন্ম। বাঙালি জীবনের আনন্দনিকেতন গৃহে ও গৃহের অধিষ্ঠাত্রী পত্নীর প্রেমেই কবি নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু হায়, সকল সুখের আশা ফুরাইয়াছে ! পত্নীর মৃত্যুতে কবি শোকে অধীর হইয়া বলিতেছেন :

এই কি মরণ ?
এত দ্রুত—সহসা এমন !
চিরতরে ছাড়াছাড়ি, দেহে প্রাণে কাড়াকাড়ি,
নাই তার কোন আয়োজন !

বলিবে না কোন কথা, জানাবে না কোন ব্যথা,
ফিরাবে না বারেক নয়ন!
মন কি গো কাঁদিছে না? প্রাণে কি গো বাধিছে না?
যেতেছে যে জন্মের মতন!

তাই কবির অসহ্য ব্যাকুল আর্তনাদ:

নিও না গো—নিও না কাড়িয়া!
একা—একা, অতি একা! এই দেখা শেষ দেখা!
যায়—যায় হৃদয় পুড়িয়া!
কোথা হ'তে কি যে হয়! শূন্য—সব শূন্যময়!
নিষ্ঠুরতা জগত জুড়িয়া!
অশ্রুরোধ, শ্বাসরোধ, অসহ্য জীবন-বোধ!
হৃদয়টা ফেলি উপাড়িয়া।

পত্নীর মৃত্যুর পর কবি পত্নীর সেবা ও অনুরাগের মূল্য স্বীকার করিতেছেন:

কি ছিলে আমার তুমি—প্রেয়সী না ক্রীতদাস!
দুটি হাতে সেবা ভরা, বুকে ভরা প্রেমরাশি!

এই প্রতিমা 'মর্মের মানসী' নহে, সংসারের কল্যাণী স্ত্রী। এবার কবির অভিমান—

জাগে শোকে অভিমান,—কেন এত ভালবেসে
আভাসে বল নি তুমি, এত দুখ দিবে শেষে!
তুমি অভিশপ্তা দেবী—কেন বল নাই আগে,—
শুধু স্বরগের ছায়া দেখাইছ অনুরাগে!

প্রিয়াবিরহে কবির নিজের কী অবস্থা হইয়াছে, তাহার জলন্ত চিত্র দিয়েছেন:

চেয়ে আছি—চেয়ে আছি, হৃদয়ে পড়িছে ছেদ,
পশ্চাতে আলোক-ছায়া স্বর্গে মর্ত্যে অবিভেদ!
সম্মুখে উঠিছে জাগি' কি কঠোর দীর্ঘ দিন!
ভ্রমিতেছি শোক-বৃদ্ধ দীনহীন উদাসীন।

শোকের প্রথম আঘাত সামলাইবার পর কবির মনে চিন্তার উদয় হইয়াছে:

এই কী জীবন?
এত শ্রম—এত ভ্রম—এত সংঘর্ষণ!
কত-না কামনা করি
আকাশ-কুসুম গড়ি!
কত গর্ব অহঙ্কার—কত আস্ফালন!

মৃত্যুর বজ্রপ্রহারে সবেরই বিনাশ ঘটে, তাই—

এ যে অদৃষ্টের স্থধু নির্মম পেষণ।
যায় দিন—পায় পায়,
স্থখ যায়, দুখ যায়;

কত আসে, কত যায়—কে করে গণন !
যায় দিন—যায় আশা,
যায় প্রীতি, ভালবাসা,
ভাবনা, ধারণা, স্মৃতি, কল্পনা, স্বপন ।

বারবারই কবি ধু-ধু জীবন-মরুভূমির চিত্র আঁকিয়াছেন—

গেছে—যাক্ যাক্
বলিতে পারি না আর শোক গর্ব বাক্ ।
হৃদয় পুড়িয়া ছাই
নাই—আর কিছু নাই !
ধূলায় মিশিয়া যাই—
দু'পায়ে দলিয়া যাক্ শত দুর্বিপাক ।

তারপর বিশ্ববিধানের প্রতি কবির অবিশ্বাস, সন্দেহ, শেষে স্বীকৃতি ও আত্মসমর্পণ। কবির মন বারবার সেই কল্যাণী পত্নীর প্রতি ধাবিত হইয়াছে। একান্ত গৃহনিষ্ঠ প্রেমের জয়গানে কবি মুখর হইয়া উঠিয়াছেন :

শূন্যগৃহে বসে' আজ ভাবি—
করেছি প্রেমের শুধু দাবী !
সে দেছে সর্বস্ব হাসিমুখে !
শূন্য প্রাণে চেয়েছে কাতরে,
প্রেমবিন্দু দেই নি অধরে !
ম্লান মুখ চাপি নাই বুকে !
ল'য়ে তুচ্ছ বাদ-বিসংবাদ
ফুরাইল জীবনের সাধ !
অপ্রকাশ রহিল সকলি !
জীবনে সহজ ছিল যাহা,
মরণে দুর্লভ আজ তাহা !
কে ক্ষমিবে ? সে গিয়াছে চলি'।

শোকের বজ্রপ্রহারে উৎক্ষিপ্ত কবিচিত্তের সুন্দর প্রকাশ পরবর্তী কবিতাগুলিতে লক্ষ্য করি—এ শোকের আঘাত যে কী মর্মস্পর্শী গভীর বিষাদের উৎস হইয়াছে, তাহা এখানে অনুভব করি। কবির ম্লান গম্ভীর কণ্ঠের স্বীকৃতি আমাদের ব্যথাতুর করিয়া তোলে :

ওই বহ্নি—ওই ধূম—ওই অন্ধকার—
বিগত জীবন-স্বপ্ন, কিছু নাই আর ।

মাতৃহারা শিশুর বেদনা এই বেদনাকে ঘনীভূত করিয়া তোলে।

এবার কবি সান্ত্বনা খুঁজিয়াছেন। লোকান্তরিতা পত্নীর উদ্দেশে কবি বলিতেছেন :

সে সময়ে দিও দেখা !
নয়নে যখন ঘনাবে মরণ,
ধরণী হইবে ধূসর বরণ,
নয়নের তলে অতীত জীবন
স্বপনের সম লেখা।······
সে সময়ে দিও দেখা।

পত্নীবিয়োগে কবি কেবল বিশ্ববিধান সম্পর্কেই নিজ অভিমত প্রকাশ করেন নাই, মৃত্যু সম্পর্কেও করিয়াছেন। মৃত্যুকে কবি অভিনন্দন জানাইয়াছেন :

হে মরণ, ধন্য তুমি ! না বুঝে তোমায়
বৃথা নিন্দা করে লোকে ;
জগতে—তুমি ত শোকে
অমর করিছ প্রেমে দেব-মহিমায়।
আজি মোর প্রিয়তমা
তব করে বিশ্বরমা—
ভাসিছে ইন্দিরা-সমা সৃষ্টি-নীলিমায়।

প্রেমকে মৃত্যু অমরতা দান করিয়াছে, তাই মৃত্যু বরণীয় :

'এষা' কাব্যের শোকগাথায় দাম্পত্যপ্রেমের জয়ঘোষণা। এই ঘোষণায় কবিচিত্তের স্বরূপটি ধরা পড়িয়াছে—বেদনার গীতিরস তত্ত্বের পেয়ালা উপছাইয়া পড়িয়াছে। মর্মোৎসারিত বেদনার প্রকাশে কবি সর্বজনীন বেদনাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। তাই 'এষা'র আবেদন সত্যই স্মরণযোগ্য আবেদন।

অক্ষয়কুমারের শোককাব্য 'এষা'র সহিত তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্য। কবির বয়স যখন একচল্লিশ তখন তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সুবিস্তৃত রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই 'স্মরণ' (১৯০৩) কাব্যগ্রন্থ ছাড়া আর কোথাও পত্নী সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ নাই। একান্ত ব্যক্তিগত শোক ও দুঃখকে কবি চিরকাল অন্তরের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই কাব্যে ব্যক্তিগত দুঃখের সর্বজনীন রূপটিই প্রকাশ পাইয়াছে, একান্ত ব্যক্তিরূপটি অপ্রকাশিত। যেখানে যতটুকু ব্যক্তিগত শোক-দুঃখ ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, ততটুকুর প্রকাশই রবীন্দ্র-সাহিত্যে ধরা পড়িয়াছে। 'স্মরণ' কাব্য তাই ব্যক্তিগত হইয়াও সর্বজনীন।

'নৈবেদ্য' কাব্যের শান্তি ও সংসারবিমুখ পর্ব অতিক্রম করিয়া কবি 'স্মরণ'পথে যখন যাত্রা করিলেন, তখন শোকের দুঃসহ আবেগ প্রশান্ত, অপ্রমত্ত, গম্ভীর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। 'স্মরণ' কাব্যের কবিতাগুলি

তাই শান্ত, সংযত ও সংক্ষিপ্ত; শোকের তীব্রতা আছে, কিন্তু প্রেমের উদ্‌ভ্রান্তির পরিচয় কোথাও নাই, বিলাপের আর্ত ক্রন্দন ফাটিয়া পড়ে নাই। গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয় বড়ালের কবিতায় এই সংযম নাই। রবীন্দ্রনাথের শোকের বৈশিষ্ট্য ইহাই—সংযত, গম্ভীর, অপ্রমত্ত—চিত্তের গভীরতম তলদেশ হইতে উত্থিত।

'নৈবেদ্য' কাব্যের কয়েকটি কবিতায় (১৮ ও ৯০ সং) দেখি কবি মৃত্যুর পূর্বাভাস পাইয়াছিলেন ও তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তারপর ১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ স্ত্রীর মৃত্যুর পর কবি মরণের সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া প্রেমকে নবরূপে গ্রহণ করিলেন:

মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহমন্দিরে
নিঃশব্দ চরণপাতে। ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি
ঘুচেছে মরণস্নানে।
.........মরণের সিংহদ্বার দিয়া
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া। (১১ সং)

কল্যাণরূপিণী প্রিয়ার উদ্দেশে কবির শান্ত নিবেদন:

তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।
চিরবিদায়ের আভা দিয়া
রাঙায়ে গিয়াছ মোর হিয়া,
এঁকে গেছ সব ভাবনায় সূর্যাস্তের বরণ-চাতুরী।
জীবনের দিক্ চক্র সীমা
লভিয়াছে অপূর্ব মহিমা
অশ্রুধৌত হৃদয়-আকাশে
দেখা যায় দূর স্বর্গপুরী। (১৩ সং)

প্রবল শোককে কবি ভগবদ্‌ভক্তিতে রূপান্তরিত করিতে চাহিয়াছেন:

সে যখন বেঁচে ছিল গো তখন
যা দিয়েছে বারবার
তার প্রতিদান দিব যে এখন
সে সময় নাহি আর।
রজনী তাহার হয়েছে প্রভাত,
তুমি তারে আজি লয়েছ হে নাথ—
তোমার চরণে দিলাম সঁপিয়া
কৃতজ্ঞ উপহার। (২ সং)

প্রিয়ার উদ্দেশে কবি এই শান্তিবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন:

মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমা-সনে
এ বিচ্ছেদবেদনার নিবিড় বন্ধনে।
এসেছ একান্ত কাছে, ছাড়ি দেশকাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি অন্তরাল। (৮ সং)

কবি এখানেই সান্ত্বনা খুঁজিয়াছেন।

তবু এ সান্ত্বনার মাঝে ঈষৎ বেদনাস্পৃষ্ট জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হয়:

গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্ত হাতে?
এ ঘর হইতে কিছু নিলে না কি সাথে?……
তোমার সংসার-মাঝে, হায়, তোমা-হীন
এখনো আসিবে কত সুদিন-দুদিন—
তখন এ শূন্য ঘরে চিরাভ্যাস-টানে
তোমারে খুঁজিতে এসে চাব কার পানে?
আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে—
হে কল্যাণী, গেলে যদি গেলে মোর আগে,
মোর লাগি কোথাও কি দুটি স্নিগ্ধ করে
রাখিবে পাতিয়া শয্যা চিরসন্ধ্যা-তরে? (৪ সং)

এই জিজ্ঞাসার পরিণতি নিম্নোক্ত আবেদন:

আমার জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো।
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচো!
যেন আমি বুঝি মনে,
অতিশয় সংগোপনে
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।
আমারি জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো। (২৭ সং)

অক্ষয় বড়ালে যেখানে উদ্ভ্রান্ত হাহাকার, রবীন্দ্রনাথে সেখানে অপ্রমত্ত প্রশান্তি; একে শোকের উচ্ছ্বাস, অপরে সংযম।

বিহারীলালের 'বন্ধুবিয়োগ', অক্ষয়কুমারের 'এষা' ও রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যে যে ব্যক্তিশোকের কাব্যপ্রকাশ, দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' (১৯০৭) কাব্যে তাহারই প্রতিধ্বনি। পত্নীবিয়োগরূপ শোকাঘাতে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবনের আনন্দ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। গভীর শোককে তিনি বিদ্রূপ, ঠাট্টা ও প্রশ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা দ্বারা তিনি এই তীব্র শোকাবেগকে সামলাইতে পারেন নাই। 'আলেখ্য'র পঞ্চম, নবম ও অষ্টাদশ চিত্রে তাহার পরিচয় পাই। 'বিপত্নীক, ১' কবিতাটি (পঞ্চম চিত্র) উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনরোধের মর্মান্তিক প্রয়াস রূপেই আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে।

এই কবিতার সূচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল হতভাগ্য বিপত্নীকের চিত্র অংকন

করিয়াছেন। এ ত নিজেরই চিত্র। পুরুষকণ্ঠের মর্মভেদী হাহাকার আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে :

শ্রান্ত দেহে, সন্ধ্যাকালে ফিরে এসে যখন
আপন ঘরে যাবো ;
কাহার কাছে বসবো এসে তখন আমি ?—কাহার
মুখের পানে চাবো ?
ক্ষুদ্র সুখদুঃখের কথা কইব আমি এখন
কাহার কাছে এসে ?
যাহার কাছে কইতাম নিত্য,—গৃহ আঁধার কোরে
চোলে গিয়েছে সে।

তারপর 'আঁধারনিশায় শুক্ল পৌর্ণমাসী' প্রিয়ার প্রেমের বিবরণ কবি প্রদান করিয়াছেন। শেষে পত্নীহীন জীবনের মর্মান্তিক ট্রাজেডির চিত্র :

দিবসের পর দিবস আসে, মাসের পরে মাস
আসে এই ভাবে ;
বর্ষের পরে বর্ষ কত জানি না এরূপে
এসে চোলে যাবে।
চলেছিল এইরূপেই এ জীবনপথে
শান্তিতৃপ্তিহীন ;
জানিনাও কখনো কি তাহার সঙ্গে দেখা
হবে কোনো দিন ;
যতখানি দেখা যাচ্ছে,—ধূ ধূ করে শুধু
অসীম বারিনিধি ;
অহো কি মনুষ্য জন্মই তোমার বিশ্বে তৈয়ের
করেছিলে বিধি !

রোমান্টিক বিষাদের উচ্চতর পর্যায়

এইবার বিশুদ্ধ গীতিকবিতার অন্যতম প্রধান প্রেরণা রোমান্টিক বিষাদের কথা আলোচনা করিব। সাংসারিক জীবনের ক্ষতিজনিত বিষাদ, শোকজাত বিষাদ ও আশাভঙ্গের বেদনা—এগুলি এই পর্যায়ে পড়ে না। বিশুদ্ধ রোমান্টিক বিষাদ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি বিহারীলালে, তারপর রবীন্দ্রনাথে। বিহারীলালের কথা আলোচনা করিয়াছি। এবার রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কাব্যধারার অনুগমনে এই রোমান্টিক বিষাদের কথা আলোচনা করিব।

প্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গতার মধ্য দিয়াই রোমান্টিক বিষাদের সুর রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কাব্যে ধ্বনিত হইয়াছে। ইহাতে বিহারী-লালের প্রভাব আছে। অতি শৈশবে প্রকৃতির মধ্যে কবি যে আনন্দ উপভোগ

করিয়াছিলেন তাহার স্মৃতি আজিকার যৌবনের উপভোগের অতৃপ্তিতে এক অনির্দেশ্য বেদনা জাগাইয়া তুলিয়াছে।

বিহারীলাল 'শরৎকাল' কাব্যে বলিয়াছেন:

চাহিতে আকাশ পানে
কি যেন বাজিছে প্রাণে,
কাঁদিয়া উঠিছে যেন তারা সমুদয়। ('সন্ধ্যাসংগীত')

রবীন্দ্রনাথ 'শৈশবসংগীত' কাব্যে বলিয়াছেন:

কি যেন হারানো ধন কোথাও না পাই খুঁজে,
কি কথা গিয়েছি যেন ভুলে,
বিস্মৃত, স্বপনবেশে পরানের কাছে এসে
আধস্মৃতি জাগাইয়া তুলে। ('অতীত ও ভবিষ্যৎ')

১৮৭৮ হইতে ১৮৮২—'কবিকাহিনী' হইতে 'সন্ধ্যাসংগীত'-'কালমৃগয়া' পর্যন্ত—এই প্রাথমিক পর্বে যখন কাব্য-ভূসংস্থানে 'ডাঙা জেগে ওঠে নি'—তখনকার লেখায় এই রোমান্টিক বিষাদের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়।

আলোছায়ায় মিশ্রিত জগতে কবি তখন বাস করিতেন। কবি বস্তহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকের অধিবাসী ছিলেন যেখানে "সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মত কল্পনাটী অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট" আর "কল্পলোকের খুব তীব্র সুখ দুঃখও স্বপ্নের সুখ দুঃখের মত।" এই রাজ্যে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ একের পর এক কাহিনীকাব্য ও গীতিনাট্য লেখেন—কবিকাহিনী, বনফুল, বাল্মীকিপ্রতিভা, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড, সন্ধ্যাসংগীত, কালমৃগয়া; তারপর প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, নলিনী, শৈশবসংগীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, কড়ি ও কোমল, মায়ার খেলা। তারপর 'মানসী' কাব্যে (১৮৯০) আসিয়া কবি আপন পথ খুঁজিয়া পাইলেন, নিজের কথা বলিলেন।

এই সকল কাহিনীকাব্য ও গীতিনাট্য অস্পষ্ট, অপরিস্ফুট হৃদয়াবেগের বাষ্পোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। কাহিনী-কাব্যগুলি সবই ট্রাজেডি—সেগুলিতে অজস্র ক্রন্দন ও অবাধ উচ্ছ্বাস। এগুলিতে যে রোমান্টিক বিষাদ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কাঁচা রোমান্টিকতা। গোধূলির অস্পষ্টতা, আলো-আঁধারি নৈরাশ্য, প্রকাশের দৈন্য ও দুর্বলতা—ইহাই এসকল কাব্যের সাধারণ লক্ষণ।

প্রাক-প্রভাতসংগীত পর্বের লেখায় "ভাবহীন বস্তহীন কল্পলোকের" রাজত্ব চলিতেছে; রোমান্টিক উচ্ছ্বাস ও দুঃখবিলাসেরই সেখানে আধিপত্য। এই পর্বে কবি নিজের মধ্যে নিজে অবরুদ্ধ, বাহিরের স্পর্শ যতটুকু আসিয়া লাগিতেছে তাহাতে বাহিরকে জানিবার ও বুঝিবার, তাহার রহস্যের অন্তরে প্রবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ হইতেছে না, বরং নিজের মধ্যেই অবরুদ্ধ হইয়া আবর্তের সৃষ্টি করিতেছে; এখনও হৃদয়-অরণ্যের মধ্যেই তিনি ঘুরপাক খাইয়া ফিরিতেছেন। 'সন্ধ্যাসংগীত' তাঁহাকে হৃদয়-অরণ্য হইতে মুক্তির দিকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। যথার্থ মুক্তি ঘটিল 'প্রভাত-সংগীতে'।

"বাহিরের সঙ্গে মানুষের অন্তরের সুর যখন মেলে না—সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না তখন সেই অন্তরনিবাসীর পীড়ার বেদনায় মানস প্রকৃতি বঞ্চিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে কোনো বিশেষ নাম দিতে পারি না—ইহার বর্ণনা নাই — এইজন্য ইহার রোদনের যে ভাষা তাহা স্পষ্ট ভাষা নহে—তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ কথার চেয়ে অর্থহীন সুরের অংশই বেশী। সন্ধ্যাসংগীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে।" ('জীবনস্মৃতি')

যৌবনের প্রথম পর্বে তাই রবীন্দ্রনাথ প্রদোষের অন্ধকার, ছায়াময় কল্পনারাশি ও একপ্রকাব অস্বাস্থ্যকর ভাবোচ্ছ্বাসমূলক বিষাদে পর্যাপ্ত দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে প্রকৃত পথের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। তাই প্রাক্-মানসীপর্বে হৃদয়-অরণ্য হইতে নিষ্ক্রমণের প্রচেষ্টা ও ক্রন্দন। "এই পর্বের চিন্তাধারাও এই রোমান্টিক বিষাদের আধার মাত্র। বিশাল কল্পনাসমূহের ক্ষীণ, অস্পষ্ট প্রতি-চ্ছবি, সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে অপরিপক আলোচনা বারবার কবি করিয়াছেন। এই পর্বের কবিতাগুলির নামেই তাহাদের বিষয়বস্তু ও কবির মানসিক বিপর্যস্ত ভাবের পরিচয় প্রকটিত হইয়াছে। 'তারকার আত্মহত্যা' (সন্ধ্যাসংগীত), 'দুঃখ আবাহন' (ঐ), 'আশার নৈরাশ্য' (ঐ), 'সন্ধ্যা' (ঐ), 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' (প্রভাত-সংগীত), 'মহাস্বপ্ন' (ঐ), 'নিশীথ-চেতনা' (ছবি ও গান)—এই নামগুলিই কবির তদানীন্তন মানসিক বিকারের পরিচায়ক।" (শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—'কবিগুরু')। 'দুঃখ-আবাহন' কবিতায় বেদনা :

> আয়, দুঃখ, আয় তুই
> তোর তরে পেতেছি আসন,
> হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি' টানি' উপাড়িয়া
> বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
> বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস্ শোষণ ;
> জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ
> হৃদয়ে আয়রে তুই হৃদয়ের ধন।

এই বিষাদময় পরিবেশ হইতে কবি মুক্তি চাহিয়াছেন। 'সংগ্রাম-সংগীত' কবিতায় কবির শপথ,—

> হৃদয়ের সাথে আজি
> করিব রে করিব সংগ্রাম !
> এতদিন কিছু না করিনু
> এতদিন বসে' রহিলাম
> আজি এই হৃদয়ের সাথে
> একবার করিব সংগ্রাম।

'প্রভাতসংগীতে' আসিয়া কবি এই সংগ্রামে জয়ী হইলেন, হৃদয়-অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মুক্তি পাইলেন, তখন—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

এবং কবির মনে হইতেছে 'জাগিয়া উঠেছে প্রাণ'।

'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমলে' তাই জগৎ ও জীবনকে উপভোগের তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে ঃ

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

মানসিক বিকার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ হইতে কবি এখন মুক্তি পাইয়াছেন। 'কড়ি ও কোমলে' পৃথিবীকে, পৃথিবীর সৌন্দর্যকে, মানবজীবনকে একান্তভাবে আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্তিলাভের অদম্য প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই ভোগাকাঙ্ক্ষার সহিত একটা অতৃপ্তিও গোপনে লুকাইয়া আছে। স্থূল ভোগের জগৎ ও বাস্তবের মোহ ত্যাগ করিয়া কবি অন্য কিছুর সন্ধান করিতেছেন। কিন্তু তাহাকে ঠিক ধরিতে পারিতেছেন না। এই ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের সুরে সমগ্র 'মানসী' কাব্য পরিপূর্ণ। তাই কবিহৃদয় মথিত করিয়া এ আর্ত ক্রন্দন শুনি, "বৃথা এ ক্রন্দন! বৃথা এ অনলভরা দুরন্ত বাসনা।" রোমান্টিক মনের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা আজ সফল না হওয়ায় নৈরাশ্য ও বিষাদ কবিজীবন ছাইয়া ফেলিয়াছে। বাস্তব জগৎ ও আদর্শ—এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হয় না বলিয়াই কবির এই বেদনা। কবি তাই সান্ত্বনা খুঁজিয়াছেন অন্যত্র। কবি-জীবনের সাধনার যাহা লক্ষ্য, যাহার প্রতি কবির মনপ্রাণ ধাবিত হইতেছে, তাহার স্থান বাস্তব জগতে নয়। সে 'মানসী', ধ্যানলোকেই তাহার স্থান। 'মর্মের গেহিনী' এই মানসীকে কবি বাস্তবে নহে, ধ্যানে পাইতে চাহিয়াছেন। এই মানসীর অনুসন্ধানে কবি কাব্যজীবনে নবযাত্রা শুরু করিলেন। সে যাত্রা-পথের ইতিহাস আমাদের আলোচনার বাহিরে। রোমান্টিক বিষাদে পূর্ণ কবিকে তাঁহার মানসীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাইয়া দিয়া আমরা ছুটি লইলাম।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে আনন্দ ও বিষাদ, মিলন ও বিরহ, তৃপ্তির উল্লাস ও অতৃপ্তির বেদনা আলো ও আঁধারের মত পাশাপাশি বহিয়া গিয়াছে। অল্প-বয়সে রবীন্দ্রনাথের বিষাদের মূল আত্মবিকাশ ও প্রকাশলাভের জন্য—'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ'। পরিণত বয়সে তাঁহার বিষাদের মূলে আছে সুদূরের পিয়াসা—অসীমের জন্য সীমার ক্রন্দন—"আমি সুদূরের পিয়াসী"। একদিকে এই পূর্ণতার জন্য ক্রন্দন ও বিষাদ, আরেক দিকে আছে উপনিষদের আনন্দবাদ—কবিকণ্ঠ মুখরিত হইয়াছে—'হৃদয় আজি মোর কেমন গেল খুলি';

পরে সে আনন্দ বিলসিত হইয়াছে পূর্ণতার স্পর্শে—'যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি, ধন্য এ মোর ধরণী'। এই পূর্ণতা লাভের যে সাধনা, মানসী-পর্বে তাহারই ভূমিকা।

অষ্টম অধ্যায়

তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা

তত্ত্ব ও গীতিকবিতা

গীতিকবিতার উৎস কেবল কবিচিত্ত নহে, বাহিরের জগৎও প্রেরণা দান করে। কবির বিশুদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাস হইতে আত্মগত গীতি-কবিতার জন্ম হয়। সেখানে কবিমনের কেবল আনন্দ, কেবল হর্ষ, কেবল বেদনার তরঙ্গ উত্থিত হয়। সদর স্ট্রীটের বাড়ীতে কিশোর রবীন্দ্রনাথের সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে। কবি বলিয়াছেন, "একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে (বাগানের দিকে) চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতে-ছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন। আনন্দ এবং সৌন্দর্য সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না।" ('জীবনস্মৃতি')। এই যে নির্ঝরের মত স্বতোৎসারিত কবিতা, ইহাই বিশুদ্ধ আত্মগত গীতিকবিতা।

কিন্তু কবিমনের তত্ত্বচিন্তাভাবনাও গীতিকবিতার রূপ গ্রহণ করিতে পারে। বাহিরের বিষয়বস্তু, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে গুরুতর তত্ত্ব, ইতিহাসের তথ্য সবই গীতিকবিতার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব। এই অন্তর্ভুক্তি জোর করিয়া বসাইয়া দেওয়া নহে, অন্তরে ইহার প্রতিষ্ঠা চাই।

গীতিকবিতা সার্থকতা লাভ করে কখন? যখন কবিকল্পনা উদ্দীপিত হয়, তখন কার্যকারণ শৃঙ্খলা ও তথ্য-তত্ত্বের বেড়াজাল অতিক্রম করিয়া একটি নিগূঢ়তর ব্যঞ্জনা ও নবতর সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। কবিকল্পনা পাঠকমনকে একটা নূতন অপ্রত্যাশিত স্তরে উত্তীর্ণ করে সেই লগ্নে যখন পাঠকচিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

সুতরাং তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতাও গীতিকবিতা হইয়া উঠিতে পারে যদি তাহা এই সকল দাবি পূরণ করে।

ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ তত্ত্বাশ্রয়ী গীতিকবিতাই বেশি লিখিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় একটি শিক্ষকের প্রায়ই দেখা মিলে। তথ্য ও তত্ত্বের নীরস উপাদান হইতে তিনি সরস সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেন। সূর্যকরোজ্জ্বল বনভূমি হইতে আমরা ঢের বেশি শিক্ষালাভ করিতে পারি যাহা শত সহস্র শাস্ত্র দিতে পারে না, এই তত্ত্বটি তিনি 'Books and Nature' ('Tables Turned') কবিতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন:

Come forth into the light of things,
Let Nature be your Teacher.
She has a world of ready wealth,
Our minds and hearts to bless—
Spontaneous wisdom breathed by health,
Truth breathed by cheerfulness.
One impulse from a vernal wood
May teach you more of man,
Of moral evil and good,
Than all the sages can.

এই কবিতাটির পিছনে একটি প্রবল আবেগ প্রচ্ছন্ন আছে। তত্ত্ব ও আবিষ্কৃত অধ্যাত্ম সত্য—এ দুইয়ের মধ্যবর্তী ব্যবধানের উপর সেতু যোজনা করিয়াছে কবির জীবনব্যাপী সাধনার প্রবল আবেগ।

ওঅর্ডসওঅর্থ তাঁহার দীর্ঘকালের কাব্যসাধনায় এই সত্যই ঘোষণা করিলেন যে, শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতির অন্তরতম রূপটি অনুভব করা যায় না—বাহিরের রূপের চারিদিকে যে আত্মার সুকুমার জ্যোতির্মণ্ডল বিস্তৃত আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে ধ্যানময়, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির প্রয়োজন। প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালবাসা, নিবিড় একাত্মতাবোধ কবির ধ্যানচক্ষু খুলিয়া দিল। প্রকৃতির প্রতি ভালবাসার মাধ্যমে কবি ঈশ্বর-সমীপে পৌঁছিলেন। এক অখণ্ড, প্রগাঢ়, দার্শনিক তত্ত্ব ওঅর্ডসওঅর্থ যখন কবিতায় উপস্থিত করিলেন, তখন আমরা ইহাকে অস্বীকার করিতে পারি না:

And I have felt
A presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts; a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns,

And the round ocean and the living air,
And the blue sky, and in the mind of man :
A motion and a spirit, that impels
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things. Therefore am I still
A lover of the meadows add the woods,
And mountains. ('Tintern Abbey').

প্রত্যক্ষ অনুভূতিলব্ধ এই অধ্যাত্মসত্য সার্থক গীতিকবিতা হইয়া উঠিয়াছে. ইহা স্বীকার করিতে আমাদের বাধা নাই, কেননা আমরা কবির নিকট শুষ্ক শাস্ত্রোপদেশ পাই নাই, জীবন্ত অভিজ্ঞতা পাইয়াছি।

এই দৃষ্টির আলোকে বাংলা তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতার আলোচনা করিব।

প্রাথমিক প্রয়াস

বাংলা তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতার প্রথম ভাণ্ডারী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত ঈশ্বর-গ্রন্থাবলীতে 'পারমার্থিক ও নৈতিক বিষয়ক কবিতা' অধ্যায়ে এই শ্রেণীর ছিয়ানব্বইটি কবিতা গৃহীত হইয়াছে। কেবল দৈনন্দিন ও ব্যাবহারিক জীবনের তুচ্ছ বিষয় অবলম্বনে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করাতেই ঈশ্বর গুপ্তের ক্ষমতা নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই, এই কবিতাগুলি তাহারই প্রমাণ। স্রষ্টা ও সৃষ্টির ইন্দ্রিয়াতীত ধ্যানলব্ধ সত্যদর্শন এগুলিতে প্রকাশের প্রয়াস করা হইয়াছে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের যে প্রাথমিক জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়বোধ, এই পদ্যগুলিতে সেই জিজ্ঞাসা ও বিস্ময় প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মধ্যে কোনো তীব্রতা বা গভীরতা নাই, কোনো তীব্র আবেগ কবিচিত্তকে উদ্বেলিত করে নাই ; ইহা অতিসাধারণ মামুলি কৌতূহলের প্রকাশ মাত্র। কৌতূহল তীব্র হইলে কবিতার প্রকাশভঙ্গীতে যে আবেগ ও দীপ্তি আসে এই শ্রেণীর কবিতায় তাহার চিহ্নমাত্র নাই। সেইজন্য এগুলি গীতিকবিতার পর্যায়ে পৌঁছায় নাই ; নীরস তত্ত্ব হইতে নবতর সৌন্দর্য উদ্ভূত হয় নাই, নিগূঢ়তর ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায় নাই। কয়েকটি উদাহরণ এই মন্তব্যের সমর্থনে দেওয়া গেল।

নির্গুণ ঈশ্বর'-ভজনা—

কাতর কিঙ্কর আমি তোমার সন্তান
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান ॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান।
একবার তাহে তুমি নাহি দাও কান ॥
সর্বদিকে সর্বলোকে কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয় ॥

হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হয়ে, তুমি হলে কালা॥
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া।
অধীর হলেম ভেবে, বধির জানিয়া॥

কবির কাব্যসাধনা সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের বক্তব্য বিধৃত হইয়াছে 'কবি' পদ্যে :

কবির বর্ণনে দেখি, ঈশ্বরীয় লীলা।
ভাব-নীরে স্নান করি, দ্রব হয় শিলা॥
তুল্যরূপে দৃষ্ট হয়, ধন আর বন।
ভাব-রসে মুগ্ধ করে, ভাবুকের মন॥
রসিক জনের আর, নাহি থাকে ক্ষুধা।
প্রতিপদে বর্ণে বর্ণে, কর্ণে যায় সুধা॥
জগতের মনোহর, ধন্য ভাই কবি।
ইচ্ছা হয় হৃদিপটে, লিখি তোর ছবি॥

তুলির স্থূল টানে চিত্রিত এই ছবি আমাদের হৃদি-পটে স্থান লাভ করে না। এখানে ঈশ্বরগুপ্ত ব্যর্থ।

মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে (১৮৬৬) তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতার অভাব নাই। এই সংকলনে বারোটি তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা আছে : 'কবি', 'শনি', 'যশের মন্দির,' 'প্রাণে,' 'নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব মন্দির,' 'ভরসেল্স নগরে রাজপুরী ও উদ্যান', 'পরলোক,' 'শ্মশান', 'নূতন বৎসর', 'আশা', 'ভূতকাল', 'যশঃ'।

ঈশ্বর গুপ্তের উপরি-ধৃত 'কবি'-র সহিত মধুসূদনের 'কবি' সনেটের তুলনা অনিবার্যরূপেই মনে আসে। সেটি এখানে উদ্ধার করিতেছি :

কে কবি—কবে কে মোরে ? ঘটকালি করি'
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই, কি সে যম-দমী ? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন ?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনাসুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু- প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে ;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে,
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে ;

মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে !

এই সনেটে কবি-প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মননশীল তত্ত্বজিজ্ঞাসা সাংকেতিক ও সার্থক শব্দচিত্রের মধ্যে বিধৃত হইয়াছে। ইহাতে হয়ত আবেগ নাই, কিন্তু যে অনুভূতির গভীরতা হইতে সত্যদর্শন ঘটে তাহা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। ঈশ্বর গুপ্তে যাহা শুষ্ক গদ্যবিবৃতি, মধুসূদনে তাহা অনুভূতিসমৃদ্ধ সত্যদিদৃক্ষা।

মধুসূদনের এই সনেটগুলিতে গীতিকবিতার পেলব স্পর্শাসহিষ্ণু সৌকুমার্য নাই, কিন্তু তত্ত্বাবরণে সুরক্ষিত, মননের ভারসহ তন্তুজালে দৃঢ়বদ্ধ সৌন্দর্য-রূপটি প্রকাশ লাভ করিয়াছে। নিষ্ঠুর মৃত্যু-আমন্ত্রণ ও মৃত্যুঞ্জয় আশার সংগীত, এ দুয়ের পারস্পরিক আকর্ষণে দোলাচলচিত্ত মানবাত্মার ক্রন্দন এই সনেট-গুলিতে ধ্বনিত হইয়াছে। এখানে আমরা পাই পরিণত ফলের রস, অশরীরী কুসুমসৌরভ নহে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'করাল কাল আবাহন' ('পদ্মিনী-উপাখ্যান', ১৮৫৮) তথ্যবিবৃতি মাত্র—

করাল কালের কাণ্ড যেন সব ক্রীড়া-ভাণ্ড,
এ ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত তাহার।
কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
তার কাছে সব একাকার ॥······
হা রে রে নিদয় কাল ! একি তোর কর্মজাল,
শোভা না রাখিব ভব-বনে।
যথা কিছু দেখ ভাল না ঠাহর ক্ষণকাল,
জালে বদ্ধ কর সেই ক্ষণে ॥

তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা রচনায় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'সদ্ভাবশতক' (১৮৬১) নীতি প্রচারে ও সংসারতত্ত্বপ্রকাশে একদা খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

ঈশ্বর সম্পর্কে কৃষ্ণচন্দ্রের দৃষ্টি অনেকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত। পরমপিতার গুণ বর্ণনায় উভয়েই লেখনী নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ও তাঁহার প্রকাশ এই জগৎ—আমাদের তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুরাগী হইতে শিক্ষা দেয়,এই কথাই কৃষ্ণচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র বলিয়াছেন। কবি ব্যাকুল প্রাণে ঈশ্বর ভজনা করিয়াছেন, তাহা এক্ষেত্রে বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যে ও রামপ্রসাদের গানে ঈশ্বর সম্পর্কে যে ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায়,তাহা ইঁহাদের কবিতায় নাই। আসলকথা, হৃদয়ের ব্যাকুল বেদনা হইতে ইঁহাদের ঈশ্বর সম্পর্কিত কবিতার জন্ম হয় নাই, বিশুদ্ধ নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি এ সকল কবিতার উৎস। সেইজন্য গীতিকবিতা হিসাবে এগুলি সফলতা লাভ করে নাই।

ঈশ্বরের সৃষ্টি 'সুচারু বিশ্ব' সম্পর্কে কৃষ্ণচন্দ্র বলিতেছেন :

মরি কিবা শোভাময় এ ভব ভবন,
যখন যে দিকে চাই জুড়ায় নয়ন।
দিবানিশি রবি শশী প্রকাশি গগনে,
ভুবন উজ্জ্বল করে বিমল কিরণে।

শেষে হাফেজের অনুসরণে নীতি প্রচার—

এইরূপ জগতের শোভা সমুদয়
ভাবি ভাবরসে ভাসে ভাবুক নিচয়।
এসব স্বভাব শোভা, রচিত যাঁহার।
হাফেজ! মজ না কেন প্রেমরসে তাঁর!

হাফেজের ভগবদ্‌ভক্তিমূলক পার্সী কবিতার এই বাংলা অনুবাদে গীতিকবিতার উপযুক্ত সজীবতা ও আন্তরিকতা নাই, একথা অনস্বীকার্য। 'ঈশ্বর-প্রেম' কবিতায় ঈশ্বর-প্রেমের উৎকর্ষ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে :

যদ্যপি যতন করে শতজন
জীবন হরিতে ছলে।
তুমি সখা যার, বল হে তাহার
কি ভয় জগতী তলে?
তব প্রেম সুধা পিয়ে ক্ষোভ ক্ষুধা
যে জন হরিতে পারে,
বল প্রিয়! বল জঠর অনল
কি দুখ দিবে তাহারে।

ইহা তত্ত্বের দ্রবীভূত রূপ; তত্ত্ব প্রস্তরের ফাঁকে ফাঁকে অনুভূতির শীর্ণ প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভগবৎকৃপা লাভের অভিলাষ প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥

ঈশ্বর গুপ্ত অতি প্রকটরূপে অলঙ্কারধর্মী; প্রকাশচাতুরীই তাঁহার নিকট বড়। তাঁহার কাতরতা উক্তিমাত্র; প্রকাশে ফুটিয়া উঠে নাই।

যুক্তিবাদী মন দিয়া কবি 'নির্গুণ ঈশ্বরের' ভজনা করিয়াছেন। নীতিরক্ষক পরমপিতার জয়গানে ঈশ্বরচন্দ্র মুখর ছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারও তাহাই করিয়াছেন। 'ঈশ্বরই আমার একমাত্র লক্ষ্য' কবিতায় ঈশ্বরকে বিশ্বের নিয়ন্তা সম্রাট, পরমপিতা রূপে শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন, হৃদয়ের সিংহাসনে ঈশ্বরকে স্থাপন করেন নাই। এ কবিতায় কেবল ঈশ্বরের মহিমা-কীর্তন :

যেই ফুলে নিরন্তর মম মন মধুকর
মধুপানে উৎসুক হৃদয় ;
ফুল্ল যেই সর্বক্ষণে সময়ের বিবর্তনে
পরিম্লান কভু নাহি হয়।
সেই ধন অন্বেষণে ভ্রমি আমি বনে বনে
সজল নয়নে অনুক্ষণ ;
সম্বন্ধ বন্ধন যার বদ্ধ রহে অনিবার,
নাহি ঘুচে হলেও নিধন।
সেই সুখময় পথে চড়িয়া মানসরথে
নিয়ত হতেছি অগ্রসর,
যার প্রান্তে সুনিশ্চিত সর্বক্ষণ বিরাজিত
নিত্য সুখধাম মনোহর।
সেই প্রেমসিন্ধু জলে আত্মময় কুতূহলে
সত্য সত্য করেছি মগন,
সদা সেই স্থির রয় বিচ্ছেদ তরঙ্গ ভয়,
যার মাঝে নাহি কদাচন।
সেই সর্ব বরণীয় ত্রিজগত স্মরণীয়
সম্রাটের আমি হে কিঙ্কর।
যাঁহার চরণতলে নিখিল নৃপতি দলে
নোয়ায় মুকুট নিরন্তর ॥

এই মহিমাকীর্তনেই ইহার সমাপ্তি। ঈশ্বর গুপ্ত ও রবীন্দ্রনাথ—উভয়ের মধ্যবর্তী স্তরে এই কবিতার স্থান। তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতার এই এক শ্রেণী—ঈশ্বরের ঐশ্বর্যচিত্রণ।

ঈশ্বর-আরাধনামূলক গীতিকবিতা পরে দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, কাঙাল হরিনাথ, অতুলপ্রসাদের হাতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ইহার কারণ কি? ইহাদের এই সকল কবিতা ও গানে ঈশ্বরের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা ও বেদনা লক্ষ্য করা যায় ; ঈশ্বরের ঐশ্বর্যজ্ঞাপক তত্ত্বকথা প্রচারে ইহাদের ক্ষান্তি ছিল না। এসকল কবিতার পিছনে একটি প্রবল আবেগ বর্তমান।
কাঙাল হরিনাথ ('ফিকিরচাঁদ') গাহিয়াছেন :

ওহে, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা, ডাক্‌ছি হে তোমারে ॥

কিংবা,

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে।
তবে কি মা, এমন করে, তুমি লুকায়ে থাক্‌তে পারতে ॥
আমি নাম জানিনে, ডাক জানিনে,
আবার পারি না মা, কোন কথা বল্‌তে ;
তোমায়, ডেকে দেখা পাইনে তাইতে, আমার জনম গেল কান্‌তে ॥

এই সকল কবিতায় (১৮৯০-৯৫ তে রচিত) আবিষ্কৃত অধ্যাত্ম-সত্য ও তত্ত্ব—এ দুইয়ের মধ্যে সেতুযোজনা করিয়াছে কবিহৃদয়ের প্রবল আবেগ। ঈশ্বর গুপ্ত-কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতায় ইহারই অভাব ছিল।

পরবর্তীকালে অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে এই শ্রেণীর কবিতার আন্তরিকতা ও আবেদন আরো গভীর ও মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে ; রবীন্দ্রনাথে তাহা চরম উৎকর্ষলাভ করিয়াছে 'খেয়া-গীতাঞ্জলি' পর্বে। অধ্যাত্ম সত্য আর পুঁথিতে আবদ্ধ থাকে নাই, তাহা হৃদয়ের উত্তাপে ও রসে সমৃদ্ধ হইয়াছে। নিম্নধৃত উদাহরণগুলি এই মন্তব্য সমর্থন করিবে।

রজনীকান্তের—

আমায় সকল রকমে, কাঙ্গাল করেছ, গর্ব করিতে চূর ;
যশ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, সকলি করেছ দূর।

কিংবা,

(তুই) পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস্ হৃদয়-দেউল মাঝে।
ভক্তি প্রেমের ধূপটী জ্বালাস্, নিত্য সকাল সাঁঝে।
পাবি যেদিন দুঃখ ব্যথা, দেবতারি পায় নোয়াস্ মাথা।
বলিস্ 'তোমার ইচ্ছা ফলুক, আমার জীবন মাঝে' ॥

কিংবা,

তুমি, নির্মল কর, মঙ্গল-করে মলিন মর্ম মুছায়ে ;
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক্ মোর মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।...
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, বসে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া ;
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে ॥
('আনন্দময়ী' : ১৯১০)

অতুলপ্রসাদের—

আর কতকাল থাক্‌ব বসে দুয়ার খুলে,—বঁধু আমার,
তোমার বিশ্বকাজে আমারে কি রইলে ভুলে ?—বঁধু আমার।

কিংবা,

তোমায়, ঠাকুর, বল্‌ব নিঠুর কোন্ মুখে ?
শাসন তোমার যতই গুরু, ততই টেনে লও বুকে।
সুখ পেলে দিই অবহেলা, শরণ মাগি দুখের বেলা ;
তবু ফেলে যাওনা চলে, সদাই থাক সম্মুখে ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের—

মন ভাব তাঁরে।
বিরাজিত যিনি আকাশে-ভুবনে,
বিশাল বিশাল নীল পারাবারে।

(আর্যগাথা ১ম : ১৮৮২)

অবশ্য এগুলি গান, গীতিকবিতা নহে। তাই এগুলিতে ভাবের ও প্রকাশের দৈন্য সুরের বন্যায় ঢাকা পড়িয়াছে। তথাপি আবেগের তীব্রতা ইহাদের বেশি ছিল, তাহা অনস্বীকার্য। ঈশ্বরগুপ্ত-কৃষ্ণচন্দ্রে যাহা নিরানন্দ শুষ্ক পুঁথিগত আলোচনা ছিল, রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ--দ্বিজেন্দ্রলালে তাহা আনন্দময় হৃদয়াবেগে পরিণত হইয়াছে।

মননপ্রধান তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতার উচ্চতর পর্যায়

আধুনিক যুগের তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতায় মনন-শক্তির প্রাধান্য,ভাবের অগভীরতা, বুদ্ধির দাপট, একনিষ্ঠতার অভাব, উদ্‌ভ্রান্তচিত্ততা ও অস্থিরমতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। সপ্তদশ শতাব্দের ইংরেজি কাব্যের দার্শনিক কবিগোষ্ঠি (Metaphysical Poets) এই পথের অগ্রগামী কবিদল। এই যে তর্কপ্রবণতা,তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ ও বুদ্ধিপ্রাধান্য, তাহা আধুনিক বাংলা তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতাতেও লক্ষ্য করা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দের তৃতীয়পাদ নহে, শেষ দশকেই বাংলা কাব্যসংসারে এই তত্ত্বাশ্রয়ী তর্কপ্রবণ বুদ্ধিপ্রধান মননশীল কবিতার সাক্ষাৎ মিলে। রোমান্টিক কবিভাবনার পূর্ণতা সাধিত হইবার পরই কল্পনার উপর বুদ্ধির এই বিজয়-অভিযান লক্ষ্য করা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দে মানুষের চিন্তারাজ্যে বহু বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সমাজ, সংসার, জীব, দেশকাল—সকল বিষয়েই যুগান্তকারী চিন্তা দেখা দিয়াছে।

ডারুইনের বিবর্তনবাদ, ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, মার্কসের সাম্যবাদ আমাদের চিন্তারাজ্যে ক্রান্তির সূচনা করিয়াছে। ইহার প্রভাব কাব্যেও পড়িয়াছে। বাংলাকাব্যও চিন্তারাজ্যের এই সর্বগ্রাসী প্রবল অভিভবে আক্রান্ত হইয়াছে।

জড়বাদ কী ভাবে কবিতার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার স্পষ্ট উদাহরণ গ্রহণ করা যাক্।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোকগুচ্ছ' (১৯০০) কাব্যে 'দ্রৌপদী' নামক সনেটের ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন: "টিণ্ড্যাল্ হাক্সলি, স্পেন্সার, ডারুইন প্রভৃতি জড়বাদীদের গ্রন্থ পাঠান্তে এই কবিতা লিখিত হয়।" কবিতাটি এই:

হে প্রকৃতি! যত তোমা নেহারি নেহারি,
এত নব নব শোভা চর্ম-চক্ষে ভায়!

হে দ্রৌপদি! যত তোমা উঘারি উঘারি
নগ্ন করা দূরে থাক, শাটী বেড়ে যায়!
অশোক, চম্পক, পদ্ম, অতসী, কাঞ্চন,
অনন্ত শাটীতে ঘেরা—অদ্ভুত ঘাগরি!
প্রকৃতি সতীর আহা লজ্জা-নিবারণ,
অন্তরীক্ষে চুপে চুপে যোগান শ্রীহরি!
ক্ষম দেবি, অপরাধ, বিশ্বের জননি;
মোরা সবে দুঃশাসন, দাম্ভিক অজ্ঞান;
সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত, তপ্তরক্ত পান
করুক নৈরাশ্য-ভীম, করি' জয়ধ্বনি!
মোরা যত কুলাঙ্গার নির্বাক, নীরবে—
সভা-মাঝে অধোমুখে ব'সে আছি সবে!

জড়বাদ আধুনিক কবির মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার সুন্দর পরিচয়স্থল এই সনেটটি।

অক্ষয়কুমার তাঁহার শোক-কাব্য 'এষা'য় (১৯১২) কেবল প্রিয়বিচ্ছেদ-বেদনা ও আর্তি প্রকাশ করেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নানা তত্ত্বও আলোচনা করিয়াছেন। স্ত্রীবিরহে উন্মত্ত কবি যখনই চেতনা পাইয়াছেন, তখনই এই অসার জীবনের সত্য আবিষ্কারে ব্যগ্র হইয়াছেন। 'এষা' কাব্যের 'অশৌচ'-অংশে জড়বাদ, দেববাদ, গীতাবাদ, বিজ্ঞানবাদ—কবি এই চারি বিষয়ে চারিটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। কবি ব্যাকুল হৃদয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন:

গেল কি—গেল কি একেবারে?
মরিলেও পাব না তাহারে?
ফুরাল সকল!
প্রাণ তবে নয়—কিছু নয়?
দেহে জন্মি' দেহে হয় লয়—
পুষ্পে পরিমল?
বীণে যথা সুর-আলাপন,
সংযোজনে তাড়িত স্ফুরণ,
তেমনি কি প্রাণ—
সুধু—সুধু রসায়ন-ক্রিয়া?
পঞ্চভূত পঞ্চভূতে গিয়া
লভিছে নির্বাণ?
প্রীতি, স্মৃতি, ভাবনা, কল্পনা,
সকলি কি ক্ষণিক ছলনা—

অলীক স্বপন ?
অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার !
জড় ধরা—জড় দেহ সার ?
মৃত্যু কি ভীষণ !

জীবনের পরিণতি সম্পর্কে এই দুরূহ জিজ্ঞাসা কাব্য হইয়া উঠিয়াছে ব্যাকুলতার গুণে। এই ব্যাকুল জিজ্ঞাসার উৎসমূলে প্রবল আবেগ ক্রিয়া করিতেছে। জড়বাদ, দেববাদ, গীতাবাদ আলোচনা করিয়া কবি সান্ত্বনা খুঁজিয়াছেন। শেষে বিজ্ঞানের আলোচনায় বলিয়াছেন :

নিশ্চয় আছেন এক জন।
যে অর্থ আমরা বুঝি যে অর্থে তাঁহারে খুঁজি,
হয় ত তেমন তিনি নন।
কত দূরে সূর্যকায়া— জলে পড়িয়াছে ছায়া,
ছায়ামাত্র করি নিরীক্ষণ !

কবি বুঝিয়াছেন অমোঘ নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই বিশ্ব-'প্রকৃতির নাহি ব্যভিচার' আর 'মরণ ত সৃষ্টি বাহিরে।' তাই তাহা ব্যাখ্যার অতীত; কবি তাই প্রশ্নের উত্তর পান নাই :

কভু দেখি —মৃত্যু তুচ্ছ নয়।
ক্ষুদ্র শুক্তি, ক্ষুদ্র কীট— ধরিত্রীর পাদপীঠ ;
শম্বুকে প্রবালে দ্বীপোদয়।
কি গূঢ়-উদ্দেশ্য তরে মরিতেছি স্তরে স্তরে—
দিয়া আত্ম, করি বিশ্বজয় ?
সে আমার কোথা গেল চলি ?
ছিল সত্য, ছিল স্থূল, হ'লো সূক্ষ্ম, হ'লো ভুল,—
মনেরে বুঝাব এই বলি ?
ব্যষ্টিতে সমষ্টি-ভাব ? ক্ষুদ্রত্বে মহত্ত্ব-লাভ ?
আবার যে রহস্য সকলি !

'মৃত্যু'-অংশের ৭ সংখ্যক কবিতায় অক্ষয়কুমার এই প্রশ্নই তুলিয়াছেন : 'এই কি জীবন ?'

শেষে কবি এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন :

হৃদি-হীন বিধির কি দুর্বোধ সৃজন !
নাহি বুঝে নিজ শক্তি
নাহি লক্ষ্য আত্মরক্তি,
নাহি অনুভব-তৃপ্তি—সূক্ষ্ম দরশন ;
উন্মত্ত কবির মত,

গড়ে ভাঙ্গে অবিরত
ল'য়ে এক অন্ধ শক্তি—কল্পনা ভীষণ !

জড়বাদ শেষ পর্যন্ত অন্ধ জীবন-শক্তিতে (Life-force) পরিণত হইয়াছে।

কেবল জড়বাদ নহে, বিবর্তনবাদও কবিতার উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুতে জীবনের শেষ পরিণতি কিনা, এই জিজ্ঞাসাতেই কবি ক্ষান্ত হন নাই ; জীবনের উন্মেষ সম্পর্কেও কবির কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছে। অক্ষয়কুমারের 'শঙ্খ' (১৯১০) কাব্যের 'প্রতিভার উদ্বোধন' কবিতাটি এই বিবর্তনবাদের কাব্যরূপ।

সৃষ্টির প্রারম্ভে যে সর্বব্যাপী অন্ধকার ছিল, তাহার বর্ণনায় বাইবেলে বলা হইয়াছে—Darkness was upon the void and the spirit of God moved upon the waters—এইখানেই এই কবিতার সূচনা :

বিধাতার নিষ্কাম হৃদয়ে
চমকিল প্রথম কামনা ,
চমকিল নব আশা-ভরে
আনন্দের পরমাণু-কণা !···
কাঁপিতেছে ক্ষুব্ধ অন্ধকার,
অপেক্ষায় হৃদয় অস্থির ;
গড়িছে—ভাঙ্গিছে বারবার—
একি খেলা মুগ্ধা প্রকৃতির !···

তারপর ডারুইনের বিবর্তনবাদের অনুসরণে কবি প্রাণের উদ্বোধন—জীবনের সাড়া—জীবের উন্মেষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

মহাশূন্য পরিপূর্ণ আজি
সুকোমল তরল কিরণে !
ঘুরে গ্রহ-উপগ্রহরাজি
দূরে—দূরে—বিচিত্র বরণে !
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে ছুটে
ওঙ্কার ঝঙ্কার অনাহত !
পঞ্চভূত উঠে ফুটে' ফুটে'
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে কত !
ছন্দে ছন্দে যতি-গরিমায়
চলে কাল ললিত-চরণে !
অন্ধশক্তি পূর্ণ সুষমায়,
চেতনার প্রথম চুম্বনে !
নীলাবাসে ঢাকি' শ্যামদেহ
শশিকক্ষে ভ্রমে ধরা ধীরে ;

কত শোভা, কত প্রেম-স্নেহ,
জলে স্থলে প্রাসাদে কুটিরে !
চাহে ঊষা—চকিত নয়ন,
ফুলবাসে বায়ু সুবাসিত ;
উঠে ধীরে বিহগ-কূজন—
সৃষ্টি পরে স্রষ্টা বিভাসিত !

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা

ডারুইনের এই বিবর্তনবাদ কেবল অক্ষয়কুমারের উপরিধৃত কবিতায় কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে, তাহা নয় ; ইহার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী (১৮৯৪) কাব্যের কয়েকটি কবিতায় এই সত্যটি কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবি এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবি স্বীকার করিয়াছেন ঃ

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের ; তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনীদিন,
যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।

এই কবিতায় কবির অঙ্গীকার ও আনন্দময় স্বীকৃতি বৈজ্ঞানিক সত্যকে কাব্যমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই স্বীকৃতি আন্তরিক ও প্রবল আবেগোদ্ভূত বলিয়া ইহা শুষ্ক তত্ত্ব থাকে নাই, জীবনসত্যে পরিণত হইয়াছে।

প্রাণের বিবর্তন, সৃষ্টি ও জীবের ক্রমবিকাশ-তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথকে বার বার আকর্ষণ করিয়াছে। অক্ষয়কুমারের হাতে তত্ত্বের যে কাব্যরূপ, তাহা বীন্দ্রনাথের 'পত্রপুট' (১৯৩৬) কাব্যের 'পৃথিবী' ও 'জন্মদিনে' (১৯৪১-রাব্যের ৫ সংখ্যক কবিতায় অপরূপ শিল্পমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

প্রথম কবিতাটিতে পৃথিবীর জন্মেতিহাসের ও জড়-চেতনের সংগ্রামের কাব্যবর্ণনা ঃ

তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়—
সে পরুষ সে বর্বর সে মূঢ়।
তার অঙ্গুলি ছিল স্থূল কলাকৌশলবর্জিত ;
গদা-হাতে মুষল হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্রপর্বত

অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে
জড়রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি,
প্রাণের পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা ॥
দেবতা এলেন পরযুগে,
মন্ত্র পড়লেন দানব-দমনের—
জড়ের ঔদ্ধত্য হল অভিভূত ;
জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।
উষা দাঁড়ালেন পূর্বাচলের শিখর চূড়ায়,
পশ্চিম সাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট ॥

দ্বিতীয় কবিতাটিতে জড়ের সহিত সংগ্রামে প্রাণের জয়লাভের কাহিনী। কবি ভরতবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন এই বলিয়া :

এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি
প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদ্ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।
অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়া ছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি ;
কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়
অসংখ্য দিবস-রাত্রি অবসানে
মন্থর গগনে এল
মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে ;
নূতন নূতন দীপ একে একে উঠিতেছে জ্বলে,
নূতন নূতন অর্থ লভিতেছে বাণী ;
অপূর্ব আলোকে
মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ
পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা—
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ ॥

এখানে ঋষি-দৃষ্টিতে বিধৃত হইয়াছে তত্ত্বাবরণমুক্ত জ্যোতির্ময় সত্য।

প্রকৃতি হইতে শিক্ষালাভ, প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বের নিগূঢ় নিয়মের আবিষ্কার, প্রকৃতিতে বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছা অনুধাবন—এ কাজ বহু কবিই করিয়াছেন। ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ, শেলী, টেনিসন, ব্রাউনিং এইজন্যই বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। প্রকৃতির মধ্যে রহস্য সন্ধানের প্রয়াস ও প্রকৃতির উপভোগের বৈচিত্র্য

আধুনিক বাংলা কাব্যে আসিয়াছে পাশ্চাত্ত্য কাব্য হইতে, কেননা প্রকৃতির প্রতি এই দূরত্বসঞ্জাত অপরিচয়ের বিস্ময় ও রহস্যমিশ্রিত উপভোগ-ব্যাকুলতা, ইহা বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গি। রোমান্টিক অস্পষ্টতার মধ্য দিয়া প্রকৃতিকে ভালবাসার ও আবিষ্কার করিয়া নূতনত্ব উপভোগের পথ দেখাইয়াছেন পাশ্চাত্ত্য কবিকুল।

আমাদের ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এই রোমান্টিক অস্পষ্টতা ছিল না। ভারতীয় কবিকুলের নিকট যে রহস্যটা প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা হইল নিখিল বিশ্ব তথা সৃষ্টিকর্তার সহিত মানবজীবনের যোগসূত্র। প্রকৃতির প্রতি তাঁহাদের ধারণা জগৎ, জীবন এবং সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে এক মিষ্টিক দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতীয় কবিকুল প্রকৃতিকে বিধাতার বিচিত্র প্রকাশরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথে এই দুই ধারার, দুই দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে প্রকৃতিকে অপরিচয়ের রহস্যে আবৃত করিয়া তাহার মধ্যে গভীরতর অর্থের সন্ধান রবীন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন। আবার ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির সকল প্রকাশকে এক বিরাট পুরুষের লীলাবৈচিত্র্যের সহিত মিলাইয়া বিশ্বসৃষ্টির বিশালতার মধ্যে তাহাকে অনুভব করিয়াছেন।

প্রধান কবিদের তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র প্রকৃতির মধ্যে নূতন তত্ত্ব ও সত্যের আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্র প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া অন্তরের নিভৃত প্রদেশের চিন্তাধারা-গুলিকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রকৃতির সহিত মানবমনের একটি যোগসূত্র আছে :

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিদ প্রভেদ এমন
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী?
['যমুনাতটে', 'কবিতাবলী' (১৮৭০।৮০)]

মানবের চিন্তার সহিত প্রকৃতির এই সম্বন্ধের চেতনাকে যদিও তিনি সর্বত্র কবিত্বের পর্যায়ে উন্নীত করিতে পারেন নাই তবুও এই সম্বন্ধের সত্যতা তাঁহার নিকট ধরা পড়িয়াছিল।

'লজ্জাবতী লতা' কবিতায় লতাটি দেখিয়া হেমচন্দ্রের মনে পড়িয়াছে :

হায় এই ভূমণ্ডলে, কত শত জন,
দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে অবনীমণ্ডল লুটে,
শুনায় কতই রূপ যশের কীর্ত্তন,

কিন্তু হেন ম্রিয়মাণ, সদা সঙ্কুচিত প্রাণ
রমণী, পুরুষগণে কে করে যতন ?

এই কবিতাগুলিতে তত্ত্বের সহিত কাব্য-আবেগের মিলন হয় নাই, তাই প্রকৃতিতে নীতি আরোপিত হইয়াছে, প্রকৃতি হইতে নীতি উদ্ভূত হয় নাই। ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের 'টিনটার্ন এ্যাবি' কবিতার তত্ত্ব-প্রতিপাদন ইহার সহিত তুলনীয়। হেমচন্দ্রে যাহা আরোপিত, ওঅর্ডস্‌ওঅর্থে তাহা তত্ত্ব ও আবিষ্কৃত অধ্যাত্ম-সত্যের মিলনোদ্ভূত কবিভাবনা।

নবীনচন্দ্রের কবিতাতেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটিয়াছে। নবীনচন্দ্রের তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতাও সজীব ও আন্তরিক হয় নাই।

'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যের (দ্বিতীয় ভাগ : ১৮৭৭) অন্তর্গত 'সায়ংচিন্তা' কবিতায় সান্ধ্য-প্রকৃতি ও কবিহৃদয়ের তত্ত্বকথা—এ'দুইয়ের পরিণয় সাধিত হয় নাই। নবীনচন্দ্র প্রথমে সন্ধ্যার বর্ণনা দিয়াছেন :

সুশীতল সন্ধ্যানিলে জুড়াতে জীবন,
ডুবাতে দিবস-শ্রম বিস্মৃতি-সলিলে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে, উঠিলাম গিরিশিরে,
বাসনা, জুড়াতে স্রোতঃসম্ভূত অনিলে,
কার্য-ক্লান্ত কলেবর, সন্তাপিত মন।
রজনীর প্রতীক্ষায় প্রকৃতি-সুন্দরী,
ললাটে সিন্দূরবিন্দু পরিল তখন,
রবি অস্তমিত-প্রায়, সুবর্ণে মণ্ডিত কায়,
উজলিয়া গগনের সুনীল প্রাঙ্গণ,
ভাসিতেছে স্থানে স্থানে রক্ত-কাদম্বিনী।

তারপর কবি দেখিলেন :

মনের আনন্দে গায় বিহঙ্গনিচয়,
সুন্দর শ্যামল মাঠে চরে গাভীগণ ;
নিরুদ্বেগে তরুতলে, তটিনীর কলকলে,
গাইছে রাখাল-শিশু মধুর গায়ন,—
নাহি কোন চিন্তা, নাহি ভবিষ্যৎ ভয়।

তারপরই রাখাল-বালক সমাজ, সংসার, ভারতের দুরবস্থা ইত্যাদি কিছুই জানে না, তাহার সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। দেশের মঙ্গল কোন্ পথে, ধর্ম কোন্ পথে, কেশব সেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আন্দোলনই বা কোন্ পথে, ভারতের স্বাধীনতা কোন্ পথে—কিছুই রাখাল-বালক জানে না। কবি তখন চিন্তা-জর্জরিত হৃদয়ে ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া কবিতা সমাপ্ত করিলেন। এখানে গীতিকবিতার অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। 'মেঘনা' কবিতায় একই ব্যাপার ঘটিয়াছে।

অপ্রধান কবিদের তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা

হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের মত প্রধান কবিদের কবিতায় যে তত্ত্ব অঙ্গীকৃত হয় নাই, আরোপিত রহিয়া গিয়াছে, কোনো কোনো অপ্রধান কবির কাব্যে তাহা অঙ্গীকৃত হইয়া গিয়াছে। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র মহাকাব্যের কবি ; বোধ করি সেইজন্য গীতিকবিতায় তাঁহারা সমস্ত মনোযোগ ঢালিয়া দিতে পারেন নাই, কিন্তু অপ্রধান কবিরা তাঁহাদের সকল শক্তি ও মনোযোগ গীতিকবিতায় অর্পণ করিয়াছেন। তাই ইঁহাদের তত্ত্ব ও আবিষ্কৃত সত্যে কোনো ব্যবধান থাকে নাই, এ দুইয়ের মধ্যে কবিহৃদয়ের প্রবল আবেগ সেতু যোজনা করিয়াছে।

এই অপ্রধান কবিরা হইতেছেন : বলদেব পালিত, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রমণীমোহন ঘোষ, দীনেশচরণ বসু, গোবিন্দচন্দ্র রায়, বরদাচরণ মিত্র, নিত্যকৃষ্ণ বসু, মুন্সী কায়কোবাদ, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী। ইঁহারা সকলেই অন্যত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছেন—হয় প্রেমকবিতায়, নয় দেশপ্রেমের কবিতায়, নয় বিষাদমূলক কবিতায়। তত্ত্বচিন্তাকে ইঁহারা কাব্যাবেদনের উপরে স্থান দেন নাই, অধীনে রাখিয়াছেন। বলদেব পালিত ব্যতীত বাকি সকলেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে কবিতা লিখিয়াছেন। তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা প্রধান কবিদের হাতে নহে, ইঁহাদের হাতেই নবরূপ লাভ করিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। বুদ্ধিপ্রধান, মননশীল, বিমূর্ত ভাবের আলোচনাও এই আধুনিক তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতার একটি স্পষ্ট রূপ এই অপ্রধান কবিদের লেখায় পাওয়া গেল।

বলদেব পালিত তাঁহার 'কাব্যমঞ্জরী'তে (১৮৬৮) বিমূর্ত ভাবকে রূপ দান করিয়াছেন ও মননশীল আলোচনা করিয়াছেন। 'সুষুপ্তি' ও 'আশা, প্রমোদ ও প্রেম' কবিতা দুইটী কবির এই ক্ষমতার পরিচায়ক। 'সুষুপ্তি'র বর্ণনায় কবি বলিতেছেন :

> নিরমল, সুশীতল সুধাকর-করে,
> দুগ্ধ-ফেন-নিভ সুখ-শয্যার উপরে,
> স্বর্ণ-লতা-সমা প্রাণ-প্রেয়সীর পাশে,
> সুপ্ত ছিলে এতক্ষণ বাঁধা-ভুজ-পাশে ;
> দিবসের ক্লেশলেশ ছিল না অন্তরে,
> 'চিন্তা' নিশাচরী ছিল লুকায়ে অন্তরে ;
> অনঙ্গে অবশ অঙ্গ প্রিয়া-সমাবেশে
> অঙ্গহীন হয়েছিল নিদ্রার আবেশে ;
> শিথিল ইন্দ্রিয় সব ছিল যেন শব,
> কেবল নিশ্বাসে হতো প্রাণ অনুভব,

হেনকালে জলদের গভীর গরজে,
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর নয়ন-সরোজে,
সুষুপ্তির ভোগে ভাল তৃপ্তি পেলে, মন ,
মহানিদ্রা একবার কর রে স্মরণ।

মহানিদ্রা মৃত্যুর আগমনে সকল ইন্দ্রিয় কর্মক্ষমতাহীন হইয়া পড়িবে, তাই কবির প্রশ্ন :

অনিত্য, অস্থায়ী এই শরীর তোমার
কি হেতু ইহাতে এত স্নেহ কর আর ?

ইন্দ্রিয়নিচয় ও স্বভাবের বিচিত্র প্রকাশকে মূর্ত করিয়া তুলিতে বলদেব পালিত এখানে দক্ষতা দেখাইয়াছেন।

অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'চিন্তা' কাব্যে (১৮৮৭)। 'একদিন' কবিতায় কবি বলিতেছেন :

হৃদয়-মন্দিরে প্রাণ,
দেবীর চরণ তলে
ছিল ঘুমাইয়া।
বিজন-মন্দিরে সেই
প্রাণীমাত্র নাহি ছিল
দিতে জাগাইয়া॥
অতীত পূজার বেলা,
অনশনে ক্লান্ত প্রাণ
ঘুমে অচেতন।
ধুলায় পড়েছে ঢলি,
পাষাণে ললাট পড়ি
স্বেদ ঝরে ঘন॥

তারপর প্রাণের নিদ্রিত রূপ দেখিয়া কবির ব্যাকুলতা—

অস্থির হইনু আমি,
প্রাণের সে দশা বুকে
সহিল না আর।
'প্রাণ—প্রাণ—প্রাণ' বলি,
বিষম-কাতর-স্বরে
করিনু চীৎকার॥
শিহরি উঠিয়া বসি
উন্মাদের মত প্রাণ,
চৌদিকে হেরিল।

শিহরি উঠিলা দেবী,
পাষাণ-নয়নে তাঁর
স্নেহ মিলাইল ॥

প্রাণকে কাব্যরূপদানে ঈশানচন্দ্রের দক্ষতা অবশ্যস্বীকার্য।

অনুরূপ বিষয়ে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন দীনেশচরণ বসু। 'মানস-বিকাশ' কাব্যে (১৮৭৩) মহাকালকে কবি বাস্তবে মূর্ত করিয়াছেন 'কাল' কবিতাটিতে। কবি কাল-তরঙ্গের বর্ণনা দিয়াছেন :

অনন্ত, অজেয়, কালের তরঙ্গ,
চলে সদা, যেন উন্মত্ত মাতঙ্গ,
কোন্ বীর রণে নাহি দেয় ভঙ্গ
ধরণীতলে ?……
সেইরূপ কাল নিয়ত নিয়ত,
গড়িছে ভাঙ্গিছে নিমিষেতে কত,
আপন মনের অভিরুচি-মত
অবনী তলে,
মহোচ্চ ভূধর, গভীর জলধি,
কাঁপে থরথর, পূজে নিরবধি, পদযুগলে !…
দুরন্ত দংশন কাল রে তোমার,
তব হাতে কারো নাহিক নিস্তার,
ছোট বড় তুমি কর না বিচার,
বধ সকলে।…
এসেছি একেলা, এ ভবমণ্ডলে,
যবে হবে বেলা, যাইব রে চলে, কি ভয় এতে ?

পূর্বধৃত রঙ্গলালের 'করাল-কাল' কবিতার অনুস্মৃতি এখানে লক্ষ্য করি। কিন্তু মধুসূদনের কাব্যোৎকর্ষ দীনেশচরণ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

বরদাচরণ মিত্রের 'অবসর' কাব্যের (১৮৯৫) অন্তর্গত 'আলোক' কবিতাটি আলোক-বন্দনা—যে আলোক সমগ্র সৃষ্টির প্রাণস্বরূপ :

সুন্দর আলোক ! জীবন বিধাতা !
আঁধারের শিশু তুমি,
জনমে তোমার জনমিল প্রাণ,—
সকল মরত-ভূমি।

আলোক সম্পর্কে যে বৈজ্ঞানিক সত্য আমরা স্বীকার করিয়াছি, কবি তাহাকেই কাব্যরূপ দিয়াছেন ও সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন।

সৃষ্টি-মূল-মন্ত্রে গভীর স্পন্দিত
যবে প্রকৃতির কায়,

বিশ্ব-বিলোড়ন-মাঝেতে যখন
এক বহু হতে চায়,
জনমি ওঁকারে শব্দ-তরঙ্গ
কোটি বজ্রনাদে ছুটে,
অযুত-বিদ্যুত-স্ফুরণে সহসা
তিমিরে আলোক টুটে।
বীজ-অনুগণে আছিল যতেক
লয়-নিমীলিত প্রাণ,
প্রয়াস করিল বিকাশ লভিতে
ঝরিয়ে ত্রিদিব তান,
আকার-বিহীন ধরিতে আকার
গঠন, গঠন-হীন,
অগণন রূপে হইতে প্রকাশ
যা ছিল একেতে লীন ;—
টুটিয়ে অসীম, ফুটিতে সুষমা
সসীমের কলেবরে,
মরণ হইতে লভিতে জনম
পরাণ প্রয়াস করে !
তোমার প্রভাবে ভুবন উদয়,
কি মহিমা, বলিহারি ;—
জীবন প্রদানে, তুমি হে আলোক,
অমৃত-কুণ্ডের বারি ॥

কেবল অধ্যাত্ম-সত্য নহে, বৈজ্ঞানিক সত্যও যে কাব্যের বিষয়বস্তু হইতে পারে এবং সার্থক কবিতা রচিত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ উপরোক্ত কবিতা।

চিন্তাপ্রধান মননশীল কবিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন প্রমথনাথ রায়চৌধুরী তাঁহার 'পদ্মা' (১৮৯৮), 'গৈরিক' (   ) ও 'গীতিকা' (   ) কাব্যত্রয়ে।

'পদ্মা' কাব্যের অন্তর্গত 'পরশমণি' কবিতায় প্রমথনাথ এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন :

কার এ পরশখানি যুগান্ত বহিয়া,
স্মৃতি-নদস্রোতে ভাসি, মরণে ঠেকিল আসি,
স্বপনে শিহরি গেনু রাখিতে ধরিয়া ;
এই কি পরশমণি ?—উঠিনু জাগিয়া।

সেই বর্ষা-যামিনীতে কবি জাগিয়া উঠিলেন—কই, পরশমণি কোথায়? কবির ব্যাকুল অন্বেষণ,—

এই কি? এই কি? করি, অন্বেষ কাতর!—
নৈশসুপ্তি, রাহুরূপে ব্রহ্মাণ্ডে গ্রাসিছে চুপে,
করাল মুখব্যাদানে লুপ্ত চরাচর;
নদীবুকে ম্লানছায়া কাঁপে থর থর।

—বিস্তারি জলদ-জাল নীল নভ-নীরে,
চন্দ্রতারা ছাপি' বুকে টানিছে অনন্ত মুখে,
—বন্ধন খসাতে বন্দী চাহিছে অধীরে!
প্রকৃতির মসীপটে কারে খুঁজি ফিরে?

—হায়, স্বপরশে কই রাঙিল হৃদয়?
কু-আশা-সঞ্চিত ঘোর মুছে ত গেল না মোর,
এই কি সেই মণি,—যার স্পর্শে হেম হয়?
দারুণ কৃত্রিম বলি' বাড়িল সংশয়।

বুঝিনু নিশ্চয় কোন মায়ার ছলনা!
এ কপট অভিজ্ঞান প্রেরিয়াছে মোর স্থান,
জাগাইতে নৈরাশ্যের পূর্ণাঙ্গ বেদনা;
এ নহে সে মণি,—যার স্পর্শে হয় সোনা!

তদবধি ছন্ন মনে বসিয়া একেলা,
ভাবিয়াছি কতবার, এ হেন চাতুরী কার,
কার এ বিষম রঙ্গ; প্রাণান্তক খেলা?
ভঞ্জে নাই দুঃসন্দেহ; বয়ে গেছে বেলা।

সহসা সৌরভপূর্ণ হল দশ দিশি;
নভ-নহবৎ মাঝে জলদ-মল্লার বাজে;
চকিতে বিদ্যুৎবাণী মর্মে গেল মিশি;—
'সারাখানি প্রাণ দিয়ে খোঁজ দিবানিশি'।

কবিতাটির দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম এইজন্য যে মননশীল চিন্তামূলক নৈরাশ্যমিশ্রিত সুরের কবিতা হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন, প্রমথনাথও লিখিয়াছেন। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র হইতে প্রমথনাথে আসিয়া এই শ্রেণীর কবিতার উন্নতি কতটা হইয়াছে তাহা এই উদ্ধৃতির সহিত পূর্বধৃত হেমচন্দ্রের 'লজ্জাবতী লতা' ও নবীনচন্দ্রের

'সায়ংচিন্তা' কবিতাদুইটির তুলনা করিলেই ধরা পড়িবে। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রে যাহা প্রকৃতিতে নীতি আরোপ মাত্র, প্রমথনাথে তাহা প্রকৃতিতে অঙ্গীভূত। বর্ষা-যামিনীর ঘনঘটার সহিত কবিমনের নৈরাশ্যক্ষুব্ধ বেদনাবাণীর চমৎকার সঙ্গতি ঘটিয়াছে এবং যে নীতি শেষে পাই, তাহা আরোপিত নহে, অঙ্গীভূত।

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কাব্যে তত্ত্বের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সন্ধ্যা-সংগীত (১৮৮২) হইতে মানসী (১৮৯০) পর্যন্ত যে কাব্যধারা তাহাতে সর্বত্রই তত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'মানসী'র পূর্বে রবীন্দ্রনাথ আপন পথ খুঁজিয়া পান নাই। কাব্যপথের সেই অনুসন্ধান-পর্বে নানা তত্ত্বকথা ভীড় করিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই কাব্যের স্বচ্ছন্দ গতিকে ব্যাহত করিয়াছে। আসল কথা, প্রাক্‌মানসী-পর্বে তত্ত্বগুলিকে রবীন্দ্রনাথ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। বিশাল কল্পনাসমূহের ক্ষীণ অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি, সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে অপরিপক্ক আলোচনা, একটা অস্বাস্থ্যকর বিষাদ ও অপরিণত ছায়াময় ভাব—এই পর্বে লক্ষ্য করা যায়।

মানবহৃদয় ও প্রকৃতি সম্পর্কে গভীরতা ও অভিজ্ঞতার অভাবই এই পর্বের কবিতাগুলিকে তত্ত্বাশ্রয়ী ও তত্ত্বপ্রধান করিয়া তুলিয়াছিল। অনায়ত্ত তত্ত্বসমূহ কবিকে তাই শান্তি দেয় নাই, বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ করিয়াছে। 'তারকার আত্মহত্যা' (সন্ধ্যাসংগীত), 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' (প্রভাতসংগীত), 'মহাস্বপ্ন' (ঐ), 'নিশীথ চেতনা' (ছবি ও গান)—এই সকল কবিতায় সৃষ্টি ও জীবন সম্পর্কে গুরুতর তত্ত্ব কবি উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহা পরিপাক করিতে পারেন নাই। এই তত্ত্বের প্রচারক বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে দার্শনিক কবি বলা হয়। কিন্তু দার্শনিক কোন অর্থে? এই সকল কাব্য হইতে কোনো সুস্পষ্ট দার্শনিক মতামত সংকলিত করা যায় না। তবে দার্শনিক কবি তিনি কোন হিসাবে? জীবনের মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে (যত অপরিপক্ক দৃষ্টি হউক না কেন) এক অনন্ত শক্তির প্রবাহ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাসংগীতে গোধূলির ম্লান বিষণ্ণ নৈরাশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রভাতসংগীতে আসিয়া 'জাগিয়া উঠেছে প্রাণ'—সেই প্রাণের সহিত পারিপার্শ্বিকের দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে —'ওরে চারিদিকে মোর—এ কী কারাগার ঘোর'—এই নালিশ কবি করিয়াছেন—জড়ের সহিত সংগ্রামে প্রাণের প্রতিষ্ঠার সংকল্প কবি ঘোষণা করিয়াছেন—তাহার জন্য জীবনকে বিকশিত করার প্রয়োজনও কবি অনুভব করিয়াছেন। এই তত্ত্বগুলি কিন্তু এখানে কবি পরিপূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই; পারিলে আঁকু-পাকু করিয়া শূন্যকে আঁকড়াইয়া ধরিবার প্রয়াস কবি করিতেন না। কড়ি ও কোমলে কবি পথের নিশানা পাইয়াছেন—প্রকৃতির ও মানবজীবনের স্থূল সৌন্দর্য উপভোগের ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক

চরিতার্থতা লাভের বাণী কবি উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু এই ভোগাকাঙ্ক্ষার দ্বারাই কবি লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারেন না, ইহাতে অতৃপ্তি ও বেদনা পাইয়াছেন—'মনে হয় কি একটি শেষ কথা আছে।' এই বেদনা মানসী কাব্যে তীব্র নৈরাশ্যে পরিণত হইয়াছে—'জীবনের অনন্ত অভাব' কবিকে পীড়িত করিয়াছে। বাস্তব জগতের ভোগের দ্বারা আত্মার পরিতৃপ্তি হয় না—এই ব্যর্থতা কবি উপলব্ধি করিয়াছেন—তাই 'বৃথা এ ক্রন্দন'। তবে পথ কোথায়? তত্ত্বের সহিত সংগ্রামে ক্লান্ত কবি শেষ পর্যন্ত বাস্তবকে বাস্তবাতীত অপরূপ মূর্তিতে—মানসীতে পরিণত করিয়াছেন ও তাহাতে সান্ত্বনা খুঁজিয়াছেন।

মহিলা-কবি-রচিত তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা

মহিলা-কবিরা বিষাদ-কবিতায় আপন কবিভাবনা প্রকাশ করিতে পছন্দ করিতেন, ইহা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে লক্ষ্য করিয়াছি। আশাভঙ্গের করুণ সুর, ছত্রে ছত্রে বিলাপ ও জীবনে অনীহার সুর তাঁহাদের কবিতাকে বেদনা-বিধুর সান্ধ্য জীবন উপত্যকায় স্থাপিত করিয়াছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

এখন দেখা যাক, মহিলা-কবিরা তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতায় কি বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন? মহিলা-কবিদের সেই বিষাদকোমল হাতের স্পর্শ কি তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতায় পাওয়া যায়? না, তত্ত্বের গুরুভারে তাঁহাদের এই বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইয়াছে?

প্রধান-অপ্রধান সকল মহিলা-কবিদের লেখাতেই এই বৈশিষ্ট্যটি নিঃসন্দেহে প্রতিফলিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক মহিলা-কবি-রচিত তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতার স্বর্ণ যুগ। ইহার পূর্বে পাই একমাত্র মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়কে ('বনপ্রসূন' কাব্যে—১৮৮২)।

পুরুষ-কবির তুলনায় মহিলা-কবিদের প্রেরণা অধিকতর আন্তরিক, কারণ ইহা ব্যক্তিগত শোকপ্রসূত। নারীসুলভ কোমলতার স্পর্শ এসকল তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতায় রহিয়াছে।

জীবনের সুকুমার বৃত্তি ও কোমল মনোভাবের মধ্য দিয়াই মহিলাকবিরা তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, প্রাকৃতিক সত্য ও তত্ত্ব আলোচনায় তাঁহারা আগ্রহ দেখান নাই। কোনো বিজ্ঞান-সত্য বা অধ্যাত্ম-সত্য আবিষ্কারে তাঁহারা উদ্যোগী ছিলেন না। তাই বলিয়া যে তাঁহাদের কোনো প্রবল আবেগ ছিল না তাহা নহে। সেই আবেগ মহিলা-কবিদের বহির্মুখী না করিয়া অন্তর্মুখী করিয়াছিল।

নারীহৃদয়ের ব্যাকুল ধর্মজিজ্ঞাসা, মৃত্যু উত্তীর্ণ জীবনের সন্ধান, সুকুমার বৃত্তিগুলির শুশ্রূষা—ইহাতেই মহিলা-কবিরা সকল আন্তরিকতা ও মনোযোগ ঢালিয়া দিয়াছেন। সমাজ-সংসার-দর্শনের কোন দুরূহ জটিল প্রশ্ন পুরুষ-কবিদের

মতো তাঁহাদের চিত্তকে ব্যাকুল ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে নাই। পুরুষ-কবিদের তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতায় আধুনিক যুগের মনোভাবটি সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে—উদ্‌ভ্রান্তি, আত্মজিজ্ঞাসা, অস্থির-মতিত্ব, তর্ক-প্রবণতা, মননশীলতা, বুদ্ধিপ্রাধান্য : এ সবই তাঁহাদের কবিতায় প্রকট।

মহিলা-কবিরা বোধ হয় আধুনিক তথা পাশ্চাত্ত্য জগতের এই সর্বগ্রাসী প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন। এই প্রভাবমুক্তি যে ইংরাজি শিক্ষা হইতে দূরে থাকার জন্য ঘটিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। কারণ অনেক মহিলা-কবিই ইংরেজিতে পারদর্শিনী ছিলেন ও ইংরেজি সাহিত্যরস আস্বাদন করিয়াছিলেন। মহিলা-কবিরা তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের খেদ ও অনীহা এবং কোমল করুণ প্রবৃত্তির দ্বারা যুগের রূঢ় সংঘাত ও উদ্‌ভ্রান্তি এড়াইয়া গিয়া নিজস্ব জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানেই মহিলা-কবিদের বিশিষ্টতা। এই বৈশিষ্ট্যের আলোকেই তাঁহাদের বিচার সম্ভব।

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় ('বনপ্রসূন' কাব্য : ১৮৮২) আশা ও নিরাশা সম্পর্কে এক গুরুভার তাত্ত্বিক আলোচনা করিয়াছেন। মহিলা কবিদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এখানে ধরা পড়ে নাই। এখানে যুক্তিজাল বিস্তার ও স্বীয় অভিমত স্থাপনের একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। 'আশা' ও নিরাশা' কবিতা দুইটি তাই কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের নীতি-কবিতার কথা মনে পড়াইয়া দেয়। কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতার মত এ দুইটিই রসোত্তীর্ণ হয় নাই, প্রাথমিক স্তরের তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা হইয়া রহিয়াছে।

'আশা' কবিতায় কবি বলিতেছেন :

ওরে আশা, আছে তোর অপূর্ব ক্ষমতা !
তোমারে স্মরণ করে, ভবে লোক প্রাণ ধরে,
দুঃখেতেও হরষিত, ঘুচে বিকলতা ;
মনের মাঝারে আশা, না হলে তোমার বাসা,
বাঁচিত মানব, লয়ে কার সহায়তা ?

তারপর 'ওরে আশা, কত তব ক্ষমতার বল' তাহারই সুদীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়াছেন ও সমাজজীবন হইতে ইহার উদাহরণ দিয়াছেন। পরিশেষে কবির বক্তব্য :

তাই বলি ওরে আশা জাতে তুমি ভরসা
বাঁচাও অখিল বিশ্বের কহি মধুবাণী।

'নিরাশা' কবিতায় কবির বক্তব্য :

আশার বিষম শত্রু তুই রে নিরাশা।
মানবের হৃদে আসি পশিলে সহসা
বিপরীত গুণ ধর সকল(ই) বিনাশ কর
মন ব্যাকুলিত কর, ভাঙ্গিয়া ভরসা
আশার বিষম শত্রু তুই রে নিরাশা।

নির্দয় নিরাশার কীর্তি সম্পর্কে গদ্যধর্মী আলোচনা করিয়া কবি ছেদ টানিয়াছেন।

এই দুই কবিতা কোনো আন্তরিক আবেগ হইতে উদ্ভূত হয় নাই। মানব-হিতার্থে কৃষ্ণচন্দ্রের মত মোক্ষদায়িনী নীতি-কবিতা লিখিয়াছেন।

মহিলা-কবি রচিত তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতার প্রাথমিক অপরিণত উদাহরণ রূপে এই দুই কবিতার যাহা কিছু মূল্য, তদতিরিক্ত কিছু নাই।

ঠিক এই বিষয়েই পরে কবিতা লিখিয়াছিলেন প্রভাবতী রায়। তাঁহার 'আশা অতি মায়াবিনী' কবিতা ('চিত্রা' কাব্য : ১৮৯৭) আশার ছলনা সম্পর্কে আলোচনা। কিন্তু এ আলোচনা পূর্বোক্ত কবিতার মত সম্পূর্ণ নীরস ও শুষ্ক হয় নাই। কবি বলিয়াছেন :

মনের বিকারে ছিলাম আঁধারে
বিষাদ অন্তরে দুঃখের কপাল জানি।
সহসা কেমন ঘুচায়ে বেদন
দিল দরশন আশা অতি মায়াবিনী।
আশা আসি কানে কহে সঙ্গোপনে
কেন দুঃখী মনে, দিব লো তাহারে আনি
বাক্য শুনে তার সুখের সঞ্চার,
ভাবিনু আবার আশা অতি মায়াবিনী।
আশার আশ্বাস করিয়া বিশ্বাস
সুখ পরকাশ, মুছিনু নয়ন পানি,
প্রাণ কিন্তু কয় ক'র না প্রত্যয়
সদা মোহময় আশা অতি মায়াবিনী।

শেষ দুই ছত্রে নীতি স্থাপন,

যথা সে মানুষ স্নেহ পরকাশে,
উঠায় আকাশে, কহিয়ে মধুর বাণী,
তেমতি আশার কপট আচার,
খল ব্যবহার, আশা অতি মায়াবিনী।

প্রভাবতী রায়ের আন্তরিকতা ও গভীরতা প্রমাণ হইয়াছে অপর একটি কবিতায়—'অশ্রু'তে। কবি বলিয়াছেন :

বল, অশ্রু বল তোর জনম কোথায় ?
সকলে স্বার্থের শিশু বিস্তীর্ণ ধরায়।
এক বিন্দু কৃপা তরে,
ভ্রমে লোকে এ সংসারে,
কৃপা কোথা ? নাহি পায়, মরে হতাশায় ;
একমাত্র স্বার্থহীন দেখিরে তোমায়।

কবি এই কবিতায় অশ্রুর আত্মত্যাগী সমব্যথী চরিত্রের আলোচনা করিয়াছেন, একথা সত্য। কিন্তু শেষে অশ্রুর প্রতি মিনতি জানাইয়া কবি গভীরতর প্রাণের পরিচয় দিয়াছেন:

অন্তরূপে অশ্রু মোরে দিও দরশন
যখন পূজিব আমি রাম নারায়ণ।
বহুদিন দিনান্তরে।
যখন যাইব ঘরে,
যখন দেখিব পিতামহী পিতামহ ;
তখন প্রেমাশ্রু এসে মিল চক্ষুসহ।

এই কবিতায় যে ব্যাকুল স্বর শুনিতে পাই, তাহার গভীরতর পরিচয় আছে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'অনন্ত পিয়াসা' কবিতায় ('কবিতা ও গান' : ১৮৯৫)। এই কবিতাটি আশাভঙ্গের করুণ খেদ ও ঈশ্বরকৃপা লাভের জন্য ব্যাকুল বেদনার রসোত্তীর্ণ প্রকাশ :

হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা—
নিবার কেমনে প্রভু, সংসারের বিন্দু ভালবাসা!
চাহি মান চাহি ধন, চাহি প্রিয় পরিজন,
যত পাই আরো চাই, কেবল দুরাশা!
কিছুতে মেলেনা শান্তি, বাসনার বাড়ে ভ্রান্তি,
অতৃপ্তির মরীচিকা, মোহ সর্বনাশা!
বুঝিগো প্রেমের সিন্ধু, হৃদি তোমারেই চাহে,
বুঝিয়া বুঝিতে নারি ডুবিয়া অজ্ঞান মোহে।
এস, নাথ, এস প্রাণে, আত্মার মিলন দানে
পূর্ণ কর এ অভাব এ অনন্ত তৃষা!

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফীর 'মরণ' কবিতাটি ('মর্মগাথা' : ১৮৯৬) মৃত্যু-আবাহন ও সংসারানুরাগের টানা-পোড়েনে রচিত। কবি বলিতেছেন,

'মরণ' 'মরণ' শুধু
শ্রবণে শুনেছি ভাই,
মরমে উদিলে ব্যাথা
মরণ শরণ চাই।
মরণের কোল বুঝি
দুখহরা শান্তিময়,
তার কোলে শুয়ে বুঝি
সব জ্বালা দূর হয়।
কিন্তু তারে ভয় হয়
পাছে লয়ে গিয়ে মোরে,

এ আলোক হতে ফেলে
বিকট আঁধারে ঘোরে।
তাই,—চাহিনা মরণে আমি
কি হবে লইয়া তায়,
এ জীবন তবু ভাল
হেসে কেঁদে যায়।

ব্যাকুল ধর্মজিজ্ঞাসা ও আবেগকম্পিত কণ্ঠে ঈশ্বরকে প্রিয়সম্বোধন ইংরাজ দার্শনিক কবি হার্বার্ট, ক্র্যাশ, এবং অতুলপ্রসাদ রজনীকান্তের ধর্মকবিতার বৈশিষ্ট্য। এই ব্যাকুলতা ও প্রিয়সম্বোধনের আবেগ কুসুমকুমারী দাশের ধর্মকবিতায় পাওয়া যায়। 'কবিতা-মুকুলে'র (১৮৯৬) অন্তর্গত 'অরূপের রূপ' ও 'সাধন পথে' কবিতা দুইটি ইহার পরিচয়স্থল। এখানে দ্বিতীয় কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করিলাম—ইহাতেই কবির ধর্মজিজ্ঞাসা যে শুষ্ক তত্ত্বজিজ্ঞাসা নহে, বরং ব্যাকুল প্রেমাবেগ, তাহার পরিচয় মিলিবে :

এক বিন্দু অমৃতের লাগি
কি আকুল, পিপাসিত হিয়া;
এক বিন্দু শান্তির লাগিয়া
কর্মক্লান্ত দু'টি বাহু দিয়া—
কাজ শুধু করে যায়
অন্তরে (তে) দুরন্ত সাধনা।
তুমি তার দীর্ঘ পথে
হবে সাথী, একান্ত ভাবনা।
সে জানে এ আরাধনা
কবে তার হইবে সফল,
তব বাণী যেই দিন তারি
ভাষা হয়ে ঘুচাবে সকল॥

হিরণ্ময়ী দেবীর 'নূতন জীবন' কবিতাটি (১৮৯৭) নবজীবনের বন্দনা গান। টেনিসনের বিখ্যাত ছত্র The old order changeth yielding place to new গভীর ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রতি আস্থা হইতে উদ্ভূত। হিরণ্ময়ী দেবীর এই কবিতাটিও বিশ্ববিধানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ধর্মবিশ্বাস হইতে উদ্ভূত :

দেখ চেয়ে একবার অসীম রহস্যময়
অনন্ত এ বিশ্ব;
দেখ সেথা কিবা গায় কোন্ কথা বলে তোর
প্রতি নব দৃশ্য।......
প্রতিদিন ফুল ফুটে প্রতিদিন ঝরে তারা
ফোটে নব ফুল,

রবি অস্তাচলে যায় নূতন তপন আনে
আলোক অতুল।
একটি বিহঙ্গগীত চিরতরে থেকে যায়
শত পাখী গায়,
একটি বসন্ত যায়, আবার দক্ষিণে ছুটে
বসন্তে বায়।
একটি তারকা খসে আকাশেতে শত তারা
ঢালে জ্যোতি-হাসি,
একটি জাহ্নবী ঢেউ সাগরে মিশায়ে যায়
আপনা বিনাশি।
হিমগিরি হতে পুন তটিনী বহিয়া আনে
নূতন জীবন,
বিরহের গীতিখানি না হইতে অবসান
গাহেরে মিলন ॥

মানকুমারী বসুর কবিতায় একটি নীতিপ্রবণ ভগবদ্ভক্ত কবিমনের সন্ধান পাওয়া যায়। 'কনকাঞ্জলি' (১৮৯৬) কাব্যের অনেক কবিতাই মানকুমারীর ব্যাকুল ধর্মপ্রাণ হৃদয়ের বেদনা বহন করিতেছে। একটি উদাহরণ লইলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হইবে। 'অসময়ে' কবিতায় কবির ব্যাকুল ঈশ্বর-সম্বোধন :

অসময়ে দীনবন্ধো!
সকলে ঠেলিছে পা'য়,
ঠেলিও না তুমি প্রভো!
দীন হীন অভাগায়!
নীরবে নিভিছে আশা
ভাঙ্গিছে খেলার ঘর,
এ সময়ে, দয়াময়!
তুমি হইও না 'পর'।

'কবিতারাণী' কবিতায় মানকুমারী কাব্যধারার স্বর্গীয় প্রভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই কবিতাটি আত্মজীবনীমূলক। পতিহীনা মানকুমারী জীবনের সকল সুখ হারাইয়া শেষে কবিতাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন ও কবিতার মাধ্যমে ঈশ্বর-সেবা দ্বারা সান্ত্বনা খুঁজিয়াছিলেন। সেই আন্তরিকতার সুরে এই কবিতা পরিপূর্ণ। কবি জীবনের দুর্যোগ ও শান্তির আগমন বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন :

শীতের কুহেলি-ভরা
তমোময়ী বসুন্ধরা,
জলে না একটী আলো গগন-প্রাঙ্গণে ;

নীল নভস্তলে থাকি
গাহে না একটা পাখি,
ফোটে না একটি ফুল কুসুম-কাননে।
নদীর আকুল বুকে
বিধবা আনত মুখে
জীবনের পুর্বস্মৃতি করিছে স্মরণ;
স্বপনে যে সুখরাশি
দেখা দিয়েছিল আসি।
এবে তা জ্বলিছে বুকে দীপ্ত হুতাশন।......
ধরাতল ফাঁকা ফাঁকা
কি এক অশান্তি-মাখা
সব যেন কায়া-ছায়া—প্রাণ যেন নাই;
দশ দিক শূন্য শূন্য,
মানব নৈরাশ্যপূর্ণ।
ধরে যদি সোনা-মুঠা হয়ে যায় ছাই।
সহসা নাশিয়া কালো
জাগিল ত্রিদিব-আলো
হাসিল সুমুখী ঊষা কনক-অচলে;
সরায়ে আঁধারখানি
উয়িল কবিতা-রাণী;
নব পারিজাতমালা শোভে বর গলে।
যে দিকে ফিরিয়া চায়,
বসন্ত ছড়ায়ে যায়
ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় মাটির ধরণী;
দিগাঙ্গনা খোলে আঁখি,
কলকণ্ঠে গাহে পাখী
নীরস জগতে ছোটে প্রেম-মন্দাকিনী।

তাই একথা দ্বিধাহীন ভাবে বলা যায়, মহিলা-কবিদের কাব্যে অধ্যাত্ম-সত্য ও আবিষ্কৃত-তত্ত্বের মধ্যে সংযোগ সাধিত হইয়াছে।

তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা আলোচনান্তে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, তত্ত্বের বেড়াজাল অতিক্রম করিয়া কাব্যসত্যের একটি নিগূঢ়তর ব্যঞ্জনা গত শতাব্দের কবিদৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছিল এবং কবিরা ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও একটি নবতর সৌন্দর্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

নবম অধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ

য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ যখন এ দেশে আসিল তখন বাঙালি-মানসের নবজন্ম হইল। বিপরীত সংস্কৃতির সংঘাতে সমাজে ও সাহিত্যে যে প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দিয়াছিল তাহার সুফল দেখা দিয়াছিল বাংলা কাব্যে। এ সম্পর্কে প্রথম দুই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এখানে বক্তব্য এই: ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যের এই উজ্জ্বল ও গৌরবময় পটভূমিকায় আমরা যদি রবীন্দ্রনাথকে স্থাপনা করি তাহা হইলে ঐ যুগের এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারা সম্পর্কে নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারিব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ আধুনিক বাংলাকাব্যের প্রথম পর্বের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন করিলে আমরা বাংলা কাব্য সম্পর্কেও নূতন জ্ঞান লাভ করিব। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষা নিরীক্ষার যুগ, ইহা অনস্বীকার্য। রেনেসাঁসের সোনার কাঠির স্পর্শে নবজাগ্রত বাঙালি মনীষা সেদিন সাহিত্যের বিপুল ও বিচিত্র শাখা-প্রশাখায় অভিযান চাল ইয়াছিল। সেদিনের বাঙালি মনীষা নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়া কেবল সাহিত্যের আদর্শই নহে, সাহিত্যের আধার ও বাহনও খুঁজিয়া লইয়াছে।

এই যুগে দুইজন শক্তিশালী যুগপ্রবর্তক কবি কাব্যের দুইটি বিশিষ্ট রীতিতে দুই পথে অগ্রসর হইয়াছেন। একদিকে মধুসূদন, তাঁহার বাহন ক্লাসিক মহাকাব্য। আর একদিকে বিহারীলাল, তাঁহার বাহন রোমান্টিক গীতিকাব্য। বাংলাকাব্য সেদিন এই দুইপথের মোড়ে দাঁড়াইয়াছিল—কোন পথে সে যাইবে তাহা কে বলিবে? এই প্রশ্নের সার্থক উত্তর পাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে।

সেদিন এই প্রশ্নের উত্তরদান সহজসাধ্য ছিল না। কারণ পথ নানা জটিল জালে আকীর্ণ ছিল। বিশুদ্ধ ক্লাসিকপর্ব বাংলা কাব্যেতিহাসে কখনই দেখা যায় নাই। ইংরাজী কাব্যের পথানুসরণে বাংলা কাব্যে একটানা ক্লাসিক পর্বের অন্তে রোমান্টিক পর্ব আসে নাই। এই যুগে মহাকাব্য, দীর্ঘ কাহিনী-কাব্য এবং গীতিকাব্য একই সময়ে লিখিত হইয়াছিল। কেবল তাহাই নয়।

মহাকাব্য বা মহাকাব্যোচিত দীর্ঘ কাহিনী-কাব্য যিনি লিখিয়াছেন, তিনিও রোমান্টিক কবি-কল্পনাকে একেবারে উপেক্ষা করেন নাই, এবং এই গীতি-প্রবণতা ইঁহাদের ক্লাসিক কাব্য-রচনার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই যুগের কবিরা সজ্ঞানে সচেতনভাবে ক্লাসিক-কাব্যের মধ্যে গীতিকবিতার দখিন-হাওয়া আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র একাধারে ক্লাসিক ও রোমান্টিক কবি। সুতরাং বাংলা কাব্যের কোনো নির্দিষ্ট বিশুদ্ধ ক্লাসিক পর্ব ছিলনা।

বাংলা কাব্য জগতের এই মিশ্রিত অবিশুদ্ধ প্রবাহের মধ্যে ভবিষ্যতের পথটি খুঁজিয়া বাহির করা সহজ ছিল না। এই জটিল আবর্তের মধ্যে পড়িয়া রবীন্দ্রনাথকেও বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে। 'বনফুল' (রচনা : ১৮৭৬।প্রকাশ : ১৮৮০) হইতে 'প্রভাতসংগীত' (১৮৮৩)—এই আট বৎসর কিশোর রবীন্দ্রনাথ পথ সন্ধান করিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত বুঝিয়াছেন গীতিকবিতার পথই তাঁহার পথ।

এই পর্বে রচিত রবীন্দ্র-রচনার তালিকা :

১৮৭৮ :	কবিকাহিনী	(কাহিনী-কাব্য)
১৮৮০ :	বনফুল	(ঐ)
১৮৮১ :	ভগ্নহৃদয়	(ঐ)
	বাল্মীকি-প্রতিভা	(গীতিনাট্য)
	রুদ্রচণ্ড	(নটিকা)
	য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র	(ভ্রমণ)
১৮৮২ :	সন্ধ্যাসংগীত	(গীতিকাব্য)
	কালমৃগয়া	(গীতিনাট্য)
১৮৮৩ :	বৌ-ঠাকুরাণীর হাট	(উপন্যাস)
	বিবিধ প্রসঙ্গ	(প্রবন্ধ)
	প্রভাত সংগীত	(গীতিকাব্য)

এই তালিকা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে গোড়া হইতেই রবীন্দ্রনাথ তিনটি বাহন লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন : কাহিনী-কাব্য, নাটক ও গীতি-কবিতা। বনফুল ও কবিকাহিনীর পরে কাহিনী-কাব্য রচনা ছাড়িয়া দেন : বাকি থাকিল নাটক ও গীতিকবিতা। বাল্মীকি-প্রতিভা ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, রুদ্রচণ্ড নামক ট্রাজেডি দিয়া তিনি নাট্যরচনা শুরু করেন ; প্রচলিত ট্রাজেডি রচনা হইতে শুরু করিয়া নানাবিধ রীতির পরীক্ষার মধ্য দিয়া পরিণত বয়সে তিনি স্বকীয় নাট্যরীতিতে পৌছিয়াছেন।

গীতিকবিতাই রবীন্দ্র-প্রতিভার বাহন একথা অনস্বীকার্য। কাহিনী-কাব্য ও ট্রাজেডি রবীন্দ্র-প্রতিভার যথার্থ বাহন নয়, একথাও অস্বীকার করা যায়

না। তবে তিনি কেন ঐ দুই জাতীয় রচনা দিয়াই সাহিত্যজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন?

রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশের লগ্নে বাংলাকাব্যজগতে রাজত্ব করিতেছিলেন মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল। "মাইকেল-হেমচন্দ্রের ঘটনাপ্রধান বহির্মুখী মহাকাব্য; বিহারীলালের ঘটনাবিরল, গীতিপ্রধান, অন্তর্মুখী দীর্ঘ কাব্য; এই দুইয়ের আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে কাহিনী-কাব্যের পথে পরিচালিত করিয়াছিল। অবশ্য মাইকেল-হেমচন্দ্র অপেক্ষা বিহারীলালের কাব্যের প্রভাবই তাঁহার কাহিনী-কাব্যে অনেক বেশি।" (শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর', পৃ, ৪৪)। বনফুল ও কবিকাহিনী—রবীন্দ্রনাথের এই দুই প্রথম কাহিনী-কাব্যের রচনা তাই সেদিনের প্রচলিত সাহিত্যিক-প্রথার অনুসৃতি মাত্র।

ইহার পর পাই ভগ্নহৃদয়। "নাটক ও গীতিকবিতার সীমান্তপ্রদেশের রচনা ভগ্নহৃদয়; তাহার খানিকটা নাটকীয়, খানিকটা কাব্যীয়; বহির্লক্ষণ নাটকের, অন্তর্লক্ষণ কাব্যের। ভগ্নহৃদয়ের কবি-লিখিত-ভূমিকায় এই দ্বিধার সাক্ষ্য আছে। বেশ বোঝা যায়, দুই শ্রেণীর রচনাই কবির মনকে টানিতেছে আবার কবি-কাহিনী বনফুল-রচয়িতার কলমও একেবারে বিরতি লাভ করে নাই। সে-ও মাঝে মাঝে কাহিনীকাব্য রূপে দেখা দিয়াছে। কাহিনী-কাব্য, নাটক ও গীতিকাব্যের মিশ্রপ্রভাবে ভগ্নহৃদয়ের সৃষ্টি। ইহা রবীন্দ্রকাব্যের তেমাথার মোড়; এখানে আসিয়া কবিকে স্থির করিতে হইয়াছে কোন্ পথ তিনি অবলম্বন করিবেন। এইজন্যই এই কাব্যের মূল্য এত অধিক।" (তদেব, পৃ ৮৫)। রবীন্দ্রনাথও জীবনস্মৃতিতে ইহার আলোচনা করিয়াছেন।

"বনফুল ও কবিকাহিনীতে গল্পের ক্ষীণ সূত্রে লিরিকের মালা গাঁথা হইয়াছে, গল্প জমিয়া উঠে নাই। গল্প গৌণ বলিয়াই গীতিউচ্ছ্বাস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পরবর্তীকালে এই লিরিক প্রেরণাই গল্পের কাঠামো-মুক্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার রূপ ধারণ করিয়াছে। এই দুই কাহিনীকাব্য পড়িলেই বোঝা যায় কবির হাত লিরিক রচনার, কাহিনী-কাব্য রচনার নয়।" (তদেব, পৃ. ৮৬)।

এই তিন কাহিনী-কাব্য কবির প্রচলিত প্রথানুবর্তন ও আপন স্বভাবের পথাবিষ্কার প্রয়াসের প্রামাণ্য দলিল।

এখন কাহিনী-কাব্য বিদায় লইয়াছে, কিন্তু নাটক গীতিকবিতার সহজ স্ফূর্তিতে বাধা দিতেছে। কবির লিরিক ও নাটকের প্রকাশ-তালিকা এখানে দিলাম:

সন্ধ্যাসংগীত—১৮৮২	প্রকৃতির প্রতিশোধ—১৮৮৪
প্রভাতসংগীত—১৮৮৩	নলিনী—১৮৮৪
শৈশবসংগীত—১৮৮৪	রাজা ও রাণী—১৮৮৯

ছবি ও গান—১৮৮৪ বিসর্জন—১৮৯০
কড়ি ও কোমল—১৮৮৬
মানসী—১৮৯০

এই তালিকা লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে রবীন্দ্রনাথের নাটক ও গীতিকবিতা সমান্তরালভাবে চলিয়াছে, কিন্তু গীতিকবিতা অপেক্ষা নাটকে পরিণতি ও পূর্ণতা আগেই ঘটিয়াছে। ইহার কারণ কি? 'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জন'—এই দুই ট্রাজেডি রবীন্দ্রনাথের ট্রাজেডি রচনার পরীক্ষোত্তীর্ণ ফল, নিখুঁত পরিপূর্ণ ফল। ইহার পর "রবীন্দ্রনাথ আর তেমন করিয়া ট্রাজেডি রচনায় মন দেন নাই, কিংবা যখন ট্রাজেডি রচনা করিয়াছেন তখন তাহার মধ্যে অন্য রসের, অন্য গুণের প্রাধান্য ঘটাইয়াছেন। কবি-নাট্যকার যেন অবচেতনভাবে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, যে এপথে, নিছক ট্রাজেডি রচনার পথে, তাঁহার আর অধিক দূর যাইবার সম্ভাবনা নাই।" (তদেব, পৃ ১০৩)

তাই তখন তিনি ট্রাজেডি ছাড়িয়া গীতিকবিতার দিকে ঝুঁকিলেন। এই ক্ষেত্রে তিনি অত শীঘ্র ও অত সহজে পরিণতি লাভ করেন নাই।

ভগ্নহৃদয়ের ত্রিধা-বিভক্ত পথের মোড়ে রবীন্দ্রনাথ থমকাইয়া দাঁড়াইয়াছেন কোন পথে যাইবেন?

ইহার পর পাই শৈশবসংগীত (রচনা: ১৮৭৭—১৮৮০, প্রকাশ: ১৮৮৪)। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে এই বিলম্বিত পরিণতির কারণ কি—এই প্রশ্নের উত্তর শৈশবসংগীতে পাওয়া যাইবে। শৈশবসংগীতের কবিতাসমূহের বিষয়বস্তু হইতেছে—'ফুলবালা', 'দিকবালা,' 'অপ্সরা-প্রেম,' 'কামিনী ফুল,' 'গোলাপবালা,' 'ফুলের ধ্যান,' 'প্রভাতী' ইত্যাদি।

অর্থাৎ জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই যখন নাই, জীবনপরিচয় যখন অপূর্ণ, তখনই এই সব বিষয় কবিরা গ্রহণ করেন। পরবর্তী কাব্যে—সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতে জীবন-পরিচয় বাড়তির মুখে, মানসীতে অভিজ্ঞতা আরো বাড়িয়াছে। তাই মানসীতে আসিয়া কবি নিজস্ব পথ সাধনা ও জীবন উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিলেন।

নাটকের ক্ষেত্রে গল্প ছিল সহায়। অভিজ্ঞতার বড়ো বড়ো ফাঁক এই গল্প দিয়া ভরাট করা সম্ভব হইয়াছিল। সেখানে পরোক্ষ জীবন অভিজ্ঞতা কবিকে দুস্তর শিল্পসমুদ্র পাড়ি দিতে সহায়তা করিয়াছিল।

শৈশবসংগীতে কিন্তু একটা উপকার কবির হইয়াছিল। এই কাব্যের অপূর্ব গীতিসম্পদ কবির গীতি-প্রত্যয় বাড়াইয়া দিয়াছিল। 'সোনার পিঞ্জরে ভাঙ্গিয়ে আমার', কিংবা 'শুন, নলিনী খোল গো আঁখি,' কিংবা 'বলি ও আমার গোলাপবালা' প্রভৃতি কবিতা গীতিসম্পদে সমৃদ্ধ। এই

লিরিক শক্তি বা গীতিসম্পদই কবিকে গীতিকবিতার পথে—রবীন্দ্রপ্রতিভা বিকাশের যথার্থ পথে চালিত করিয়াছিল।

সুখের বিষয় এই যে, গীতিকবিতার পরীক্ষা তাঁহাকে দীর্ঘকাল করিতে হয় নাই। শৈশবসংগীত রচনার পরেই সন্ধ্যাসংগীতের অধিকাংশ কবিতা রচিত। সন্ধ্যাসংগীত রচনার পরে কবির আর সন্দেহ ছিল না যে, গীতিকবিতাই তাঁহার প্রতিভার যোগ্য ও সত্য বাহন। সেইজন্যই সন্ধ্যা-সংগীতের মূল্য এত অধিক। "কবি নিজেও সন্ধ্যাসংগীত হইতেই তাঁহার কাব্য প্রচারযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন ও প্রাক-সন্ধ্যাসংগীত কাব্যগুলি বাদ দিতে চাহিয়াছেন। এই কাব্যেই স্থানে স্থানে একটা সত্য অনুভূতির আভাস আছে। তবে যেটুকু আছে তাহা সন্ধ্যার রঙেই পরিপূর্ণ। গোধূলি সময়ের মত একটা অস্পষ্টভাব, আলো আঁধারি নৈরাশ্য, প্রকাশের দৈন্য ও দুর্বলতা—এ সবই এই সময়ের কাব্যের লক্ষণ। কাঁচা রোমান্টিকতা সন্ধ্যা-সংগীতের প্রায় সর্বত্রই পরিস্ফুট।" (শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, 'কবিগুরু', পৃ. ৪৬)।

ইহার পর প্রভাতসংগীত। কবিতা মক্স করার দিন শেষ হইল, কিশোর কবিযশঃপ্রার্থী এইবার পরিণত কবি হইলেন। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হইল। নবজীবনের আবেগ কবিকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল—গীতিধারায় কবি ছাড়া পাইলেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় রবীন্দ্রকাব্যের তিনটি মূল তত্ত্ব প্রকাশ পাইল—(১) আত্মসচেতনতা—'জাগিয়া উঠেছে প্রাণ'; (২) সেই প্রাণের সহিত পারিপার্শ্বিকের দ্বন্দ্ব—'ওরে চারিদিকে মোর—এ কী কারাগার ঘোর' ইহাই তাহার নালিশ; এই জড় বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ—'আমি ভাঙ্গিব পাষাণকারা'; (৩) এই প্রতিষ্ঠার অর্থ হইতে জীবনে সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ বিকাশ—'কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া, রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া, রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া' জীবনকে বিকশিত করাই ইহার উদ্দেশ্য। মানসীতে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ একটা স্পষ্ট আধ্যাত্মিক আকুলতার এবং সাধনার প্রথম পরিচয় দিলেন। প্রাক্-সন্ধ্যাসংগীত পর্বে হেমচন্দ্র-বিহারীলালের কিছু প্রভাব ছিল, মানসী-তে আসিয়া তিনি সকল বহিঃপ্রভাব কাটাইয়া উঠিলেন—আপন চিত্তের প্রদীপ জ্বালাইয়া অগ্রসর হইলেন।

কিশোর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় হেমচন্দ্র ও বিহারীলালের প্রভাবই বেশি। মধুসূদন ও নবীনচন্দ্রের প্রভাব বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি ও কবিধর্ম এমনই বিপরীত যে কিশোর রবীন্দ্রনাথ ভুলেও মাইকেলের দিকে আকৃষ্ট হন নাই। একটিমাত্র ক্ষেত্রে—'বনফুল' কাহিনী-কাব্যের তৃতীয় সর্গে কমলা-নীরজার কথোপকথন মেঘনাদবধকাব্যের চতুর্থ সর্গের সীতা-সরমা-সংবাদের অনুরূপ। এছাড়া আর কোনো প্রভাব

নাই। আর মাইকেলী অমিত্রাক্ষরে ও রাবীন্দ্রিক অমিত্রাক্ষরে প্রভেদটাই বড়, মিল অল্প। নবীনচন্দ্রের ভাবও নাই। কারণ নবীনচন্দ্রের বহুপ্রখ্যাত রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের শৈশবরচনার পরে।

হেমচন্দ্রের প্রভাব শৈশবসংগীত পর্যন্ত; বিহারীলালের প্রভাব প্রাক্-সন্ধ্যাসংগীত পর্বেই শেষ। সন্ধ্যাসংগীতে কবি এই বহিঃপ্রভাব কাটাইয়া উঠিয়াছেন এবং নিজস্ব পথ আবিষ্কার করিয়াছেন।

হেমচন্দ্রের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনাতেই ধরা পড়ে। তেরো বৎসরের বালক রবীন্দ্রনাথ দুইটি দীর্ঘ বর্ণনাপ্রধান কবিতা লিখিয়াছিলেন 'অভিলাষ' (তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত, ১৮৭৪) ও 'হিন্দুমেলায় উপহার' (হিন্দুমেলার নবম বার্ষিক অধিবেশনে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫, পঠিত)। প্রথমটি নীতিমূলক, দ্বিতীয়টি দেশপ্রীতিমূলক কবিতা। এই দুইটি কবিতা হইতে কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া দেওয়া গেল, ইহা হইতে বর্ণনাভঙ্গি ও ক্রিয়াপদিক সমিল ছন্দ ব্যবহারে হেমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

'অভিলাষ'—

জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ !
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
এত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়। (১)
তোমার বাঁশরি স্বরে বিমোহিত মন—
মানবেরা, ঐ স্বর লক্ষ্য করি হায়,
যত অগ্রসর হয় ততই যেমন
কোথায় বাজিছে তাহা বুঝিতে না পারে। (২)
ঐ দেখ ছুটিয়াছে আর এক দল,
লোকারণ্য পথ মাঝে সুখ্যাতি কিনিতে
রণক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্তি মাঝে,
শমনের দ্বার সম কামানের মুখে: (৫)
কিন্তু হায় সুখ লেশ পাবে কি কখন?
সুখ কি তাহারে করিবেক আলিঙ্গন?
সুখ কি তাহার হৃদে পাতিবে আসন?
সুখ কভু তারে কি গো কটাক্ষ করিবে? (২৭)

হেমচন্দ্রীয় রূপকচিত্রণ ও নীতি-আরোপ-প্রবণতা এখানে লক্ষ্য করা যায়।

'হিন্দুমেলায় উপহার'—

হিমাদ্রিশিখরে শিলাসন পরি,
গান ব্যাস ঋষি বীণা হাতে করি

কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়! (১)
স্তব্ধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়ে নাক' পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল ;
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়! (২)
ঝঙ্কারিয়া বীণা কহিলা আর,
'কেমনে আবার শোন্ তুই, হায়,
আবার হাসিস্! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।' (৩)

ইহার সহিত হেমচন্দ্রের 'ভারত-বিলাপ', 'কালচক্র', 'ভারতসংগীত' (কবিতাবলী), 'কি হবে কাঁদিয়া?' (চিত্তবিকাশ), 'মন্ত্রসাধন' (বিবিধ কবিতা) প্রভৃতি কবিতা তুলনীয়—ভাবে ও ভাষায় সাদৃশ্য আছে।

শৈশবসংগীতের কবিতায় হেমচন্দ্রের প্রভাব আরো স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণিমা-নিশি-বর্ণনা :

আজি পূর্ণিমা নিশি
তারকা কাননে বসি
অলস নয়নে শশী
মৃদু হাসি হাসিছে।
পাগল পরানে ওর
লেগেছে ভাবের ঘোর,
যামিনীর পানে চেয়ে
কি যেন কি ভাবিছে।—শৈশবসংগীত

ইহার সহিত তুলনীয় হেমচন্দ্রের—

কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল!
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
কলকল করে ধীরে তরঙ্গিণী-জল!
—'যমুনাতটে' (কবিতাবলী)

শৈশবসংগীতের আর একটি কবিতা 'হরহৃদে কালিকা'—

কে তুই লো হরহৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে
ভিখারীর সর্বত্যাগী বুকখানি মাড়ায়ে?…
তখনো রবি কি তুই এই বুকে দাঁড়াবে,
ভাবনাবাসনাহীন এই বুক মাড়াবে?

ইহার সহিত তুলনীয় 'দশমহাবিদ্যা'র কালিকা-বর্ণনা।

প্রকৃতিবর্ণনায় হেমচন্দ্রের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—মানবের চিন্তার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ কবি অনুভব করিয়াছিলেন।
প্রকৃতির স্পর্শের মধ্যে হেমচন্দ্র ব্যথিত মনের সান্ত্বনা খুঁজিয়াছেন :

কে আছে এ ভূমণ্ডলে, যখন পরাণ
জীবনপিঞ্জরে কাঁদে মনের তাড়নে,
যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্মশান
যায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ আবেদনে,
তখন বিজন বন শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথজ্যোতি বিমল আকাশে,
প্রশস্ত নদীর তট পর্বত উপরি
কার না তাপিত প্রাণ জুড়ায় বাতাসে।
—'যমুনাতটে' (কবিতাবলী)

কিশোর রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন :

কে আছে এমন যার এ হেন নিশীথে,
পুরানো দুখের স্মৃতি উঠেনি উথলি।
কে আছে এমন যার জীবনের পথে
এমন একটি সুখ যায়নি হারায়ে,
যে হারা-সুখের তরে দিবানিশি তার,
হৃদয়ের এক দিক শূন্য হয়ে আছে।
এমন নীরব-রাত্রে দেখি গো কখনো
ফেলে নাই মর্মভেদী একটি নিশ্বাস ?
—কবিকাহিনী, তৃতীয় সর্গ

প্রকৃতি বর্ণনায় কিশোর কবি আর একজনের সাহায্য লইয়াছিলেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বনফুল কাব্যের শ্মশান-বর্ণনা :

গভীর আঁধার রাত্রি শ্মশান ভীষণ।
ভয় যেন পাতিয়াছে আপনার আঁধার আসন।
সরসর মরমরে সুধীরে তটিনী বহে যায়।
প্রাণ আকুলিয়া বহে হুমহু শ্মশানের বায়।
—বনফুল, নবম সর্গ

ইহার সহিত তুলনীয় স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের পাতাল-বর্ণনা :

গভীর পাতাল ! যথা কালরাত্রি করালবদনা
বিস্তারে একাধিপত্য ! শ্বসরে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি জ্বালি রোষে ; ঘোরনীল বিবর্ণ অনল
শিখাসঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়।
—স্বপ্নপ্রয়াণ, পঞ্চম সর্গ

কিন্তু এহ বাহ্য। এ সকল প্রভাব অত্যল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। কবির নিজ স্বীকৃতি ও রচনার সাক্ষ্য অনুসারে একথা বলা যায় বিহারীলালের প্রভাব স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু সন্ধ্যাসংগীতে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ এই প্রভাবও ঝাড়িয়া ফেলিয়াছেন। বিহারীলালের প্রভাব রবীন্দ্র-প্রতিভাকে গোড়ায় চালনা করিয়াছে—এই ধারণার কোনো ভিত্তি নাই। যে সময়ে মাইকেলের প্রভাবে বাংলা কাব্য প্রধানত বহির্মুখী ছিল, তখন বিহারীলাল অন্তর্মুখী কাব্য লিখিয়াছেন। এই অন্তর্মুখীনতার ইশারা রবীন্দ্রনাথকে পথের সন্ধান দিয়াছিল। ইহার বেশি কিছু নহে। 'আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে কবির নিজের কথা' প্রথম বিহারীলালই শুনাইলেন, একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন ('বিহারীলাল'—আধুনিক সাহিত্য) ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সারদামঙ্গল' কাব্যের নিকট রবীন্দ্রনাথ বারবার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। বিহারীলালের প্রকৃতি-প্রীতি, অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যসন্ধান, আনন্দময় প্রসন্নতা ও ধ্যানমগ্নতা রবীন্দ্র-কবিমানসের যথার্থ অনুকূল হইয়াছিল।

বিহারীলালের প্রভাব আছে 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' ও 'শৈশবসংগীত' কাব্যে। এখানেই শেষ। তারপরই 'সন্ধ্যাসংগীতে' প্রভাব-মুক্তি।

বিহারীলাল যে হেমচন্দ্রের মতো ক্রিয়াপদিক মিল ব্যবহার করেন নাই, এজন্য রবীন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

ইহার 'মিষ্ট লালিত্য' রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাই তিনি 'শৈশব-সংগীত' কাব্যে ইহার অনুসরণে লিখিয়াছেন :

তরল জলদে বিমল চাঁদিমা
সুধার ঝরণা দিতেছে ঢালি।
মলয় ঢলিয়া কুসুমের কোলে
নীরবে লইছে সুরভি ঢালি।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন : "একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম।...এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাসংগীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে, কিন্তু স্বভাবতই ওই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম।" (জীবনস্মৃতি, 'সন্ধ্যাসংগীত' পরিচ্ছেদ)।

'বঙ্গসুন্দরী'র পরে 'সারদামঙ্গল'। প্রথমটিতে যুক্তাক্ষরবর্জিত মিষ্ট লালিত্য—শীঘ্রই শ্রান্তি ও তন্দ্রা আনে ; দ্বিতীয়টিতে যুক্তাক্ষরসম্পন্ন প্রচলিত ত্রিপদী, "কিন্তু কবি তাহা সংগীতে সৌন্দর্যে সিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছেন।

বঙ্গসুন্দরীর ছন্দোলালিত্য অনুকরণ করা সহজ, সেই মিষ্টতা একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহার বন্ধন ছেদ করা কঠিন, কিন্তু সারদামঙ্গলের গীতসৌন্দর্য অনুকরণসাধ্য নহে।" (আধুনিক সাহিত্য, "বিহারীলাল")।

কেবল ছন্দ ও ভাষায় নহে, ভাবের ক্ষেত্রেও বিহারীলাল বড় মহাজন। প্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গতার মধ্যে একটি রোমান্টিক বিষাদের সুর রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের নিকট পাইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ 'শৈশবসংগীত' কাব্যে বর্তমান প্রকৃতি-উপভোগে অতৃপ্তি প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন :

কি যেন হারানো ধন কোথাও না পাই খুঁজে,
কি কথা গিয়েছি যেন ভুলে,
বিস্মৃত, স্বপনবেশে পরানের কাছে এসে
আধস্মৃতি জাগাইয়া তুলে।
—'অতীত ও ভবিষ্যৎ', শৈশবসংগীত

এই অতৃপ্তির সুর শুনি বিহারীলালের কাব্যে—

চাহিতে আকাশ পানে
কি যেন বাজিছে প্রাণে,
কাঁদিয়া উঠিছে যেন তারা সমুদয়।
—'সন্ধ্যাসংগীত,' শরৎকাল

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাহিনীকাব্য বনফুলের প্রকৃতি-বর্ণনা ও বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য সারদামঙ্গলের প্রকৃতিবর্ণনায় সাদৃশ্য আবিষ্কার করা কঠিন নহে।

'বনফুল' কাব্যে নির্ঝর-বর্ণনা :

আজিও পড়িছে ঐ সেই সে নির্ঝর,
হিমাদ্রির বুকে বুকে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ছুটে মুখে
সরসীর বুকে পড়ে ঝর ঝর ঝর।
কুটীর তটিনী তীরে
লতারে ধরিয়া শিরে
মুখছায়া দেখিতেছে সলিল দর্পণে
হরিণেরা তরুছায়ে
খেলিতেছে গায়ে গায়ে
চমকি হেরিছে দিক পাদপঙ্কজলে।

আর 'সারদামঙ্গল' কাব্যে নির্ঝর-বর্ণনা :

ফেনিল সলিল রাশি

বেগভরে পড়ে আসি
চন্দ্রালোক ভেঙ্গে যেন পড়ে পৃথিবীতে।
সুধাংশু-প্রবাহ পারা
শত শত ধারা ধারা
ঠিক্‌রে অসংখ্য তারা ছোটে চারিভিতে।
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঠেকে ঠেকে
লম্ফে লম্ফে ঝেঁকে ঝেঁকে
জেলের জালের মত হয়ে ছত্রাকার
ঘুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে
ফেনার আরশি উড়ে
উড়িছে মরাল যেন হাজার হাজার। (চতুর্থ সর্গ)

আর একটি ক্ষেত্রে কবির ঋণ আছে। "বাল্যকালে বাল্মীকিপ্রতিভা নামক একটি গীতিনাট্য রচনা করিয়া বিদ্বজ্জনসমাগম নামক সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম।...সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের সারদামঙ্গলের আরম্ভভাগ হইতে গৃহীত।" ['আধুনিক সাহিত্য']

'বাল্মীকি প্রতিভা'র সরস্বতীর সহিত দেবী সারদার অনেক মিল আছে। বিশ্বপ্রকৃতির কেন্দ্রে বিরাজমান অনন্ত সত্তাই কবিজীবনের সকল প্রেরণার মূল উৎস, তিনিই সকল সৌন্দর্যের মূল: এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথ 'সারদামঙ্গল' হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

'সারদামঙ্গলে' আছে:

কি বিচিত্র স্বরতান
ভরপুর করি প্রাণ
কে তুমি গাহিছ গান আকাশ মণ্ডলে!
জ্যোতির প্রবাহ-মাঝে
বিশ্ববিমোহিনী রাজে
কে তুমি লাবণ্যলতা মূর্তি মধুরিমা!
—তৃতীয় সর্গ

ইহার সহিত তুলনীয় বাল্মীকির সরস্বতী-স্তব:

ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদিছে,
ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে,
জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে,
এ-কবিতার মাঝে তুমি কেগো দেবি,
আলোকে আলো আঁধারি?
—বাল্মীকিপ্রতিভা, ষষ্ঠ দৃশ্য

লক্ষ্মীর প্রতি বিহারীলালের উক্তি :

যাও লক্ষ্মী অলকায়
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি-জন তপোবনে আর!
—সারদামঙ্গল, প্রথম সর্গ

আর লক্ষ্মীর প্রতি বাল্মীকির উক্তি :

যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসো না, এসো না,
এসো না এ দীনজন-কুটিরে!
যে বীণা শুনেছি কানে, মন প্রাণ আছে ভোর,
আর কিছু চাহি না চাহি না।
—বাল্মীকিপ্রতিভা, ষষ্ঠ দৃশ্য

সারদার প্রতি বিহারীলালের আবাহন :

এস মা করুণারাণী,
ও বিধু-বদন-খানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরি গো আবার ;
শুনে সে উদার কথা
জুড়াক্ মনের ব্যথা,
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার!
—সারদামঙ্গল, প্রথম সর্গ

আর সরস্বতীর প্রতি বনদেবীগণের নিবেদন :

বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী ;
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে, অন্ধকারে ফেলিলে,
দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবী অয়ি।
স্বপন-সম মিলাবে যদি, কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে, চির মরম-বেদনা,
তোমারে চাহি ফিরিছে, হের, কাননে কাননে ওই।
—বাল্মীকিপ্রতিভা, ষষ্ঠ দৃশ্য

সারদামঙ্গলের (১৮৭৯) প্রভাব বাল্মীকিপ্রতিভার (১৮৮৯) উপর পড়িয়াছে, এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলে বিহারীলালের প্রতি অবিচার করা হয়। 'সংগীতশতক' 'শরৎকাল' 'বন্ধুবিয়োগ' 'প্রেমপ্রবাহিনী' প্রভৃতি প্রাক্-সারদামঙ্গল কাব্যগুলিতে বিহারীলাল আদর্শান্বিত প্রেমের বন্দনা করিয়াছেন এবং সারদামঙ্গলের প্লেটোনিক প্রেমের পূর্বাভাস দিয়াছেন। 'প্রেমপ্রবাহিনী' কাব্যে কবি এই সিদ্ধান্তেই পৌছিয়াছেন যে বাস্তবজগতে প্রেমের কোনো লৌকিক প্রতিষ্ঠাভূমি নাই ; প্রেমের লৌকিক ও বিশেষ আধারগত সত্তার উর্ধ্বে

যে একটি সার্বভৌম অধ্যাত্ম-সত্তা আছে, তাহার অনুভূতি কবিমনে অস্পষ্টভাবে জাগিয়াছে। 'প্রেমপ্রবাহিনী'র শেষে কবি প্রেমের এই উচ্চাদর্শ ও আনন্দময় সত্তার অবস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চয় হইয়া বলিয়াছেন :

ক্রমে ক্রমে নিবিতেছে লোক-কোলাহল
ললিত বাঁশরীতান উঠিছে কেবল।
মন যেন কাড়িতেছে সমাবেশ ভরে।
প্রাণ যেন উঁকিতেছে সেই দিক পানে,
যথার্থ তৃপ্তির স্থান আছে যেই স্থানে!
অহো অহো, আহা আহা একি ভাগ্যোদয়,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আজি প্রেমানন্দময়।

সারদামঙ্গলের প্লেটোনিক প্রেমের ইহাই পূর্বাভাস। দেবী সারদা একাধারে সৌন্দর্য ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
দেবী সারদা—

ব্রহ্মার মানসসরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীল জলে মনোহর সুবর্ণনলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তার
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমাযামিনী।

কবির অভিলাষ,—

তোমারে হৃদয়ে রাখি,
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু'ই ভালো লাগে—
গিরিমালা, কুঞ্জবন,
গৃহ, নাটনিকেতন,
যখন যেখানে যাই যাও আগে আগে!.... .
যত মনে অভিলাষ,
তত তুমি ভালবাস,
তত মনপ্রাণ ভরে আমি ভালবাসি।
ভক্তিভাবে একতানে
মজেছি তোমার ধ্যানে,
কমলার ধনমানে নাহি অভিলাষী।

সারদা-প্রেমে মত্ত কবির মনে হয়,—

এ ভুল প্রাণের ভুল
মর্মে বিজড়িত মূল,

জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী,
এ এক নেশার ভুল,
অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল,
স্বপনে বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী।

এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বন্দনাগানে তিনি কাব্য সমাপন করিয়াছেন—

দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী
ত্রিভুবন আলো করি,
দু'নয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়।…
পুন কেন অশ্রুজল
বহ তুমি অবিরল,
চরণকমল আহা ধুয়াও দেবীর!
মানসসরসী-কোলে
সোনার নলিনী-দোলে,
আনিয়ে পরাও গলে সমীর সুধীর।

সাধের আসন কাব্যে এই দেবীর মিস্টিক রূপ কবি ধ্যান করিয়াছেন,—

আকাশ পাতাল তুমি
সকলি কেবল—তুমি।
এক করে বরাভয়,—
বিশ্বের নিয়তোদয়;
নিয়ত প্রলয় হয় অন্য করতলে।
দশ দিকে পায় স্ফূর্তি,
তোমার মহান মূর্তি,
অনাদি অনন্ত কাল লোটে পদতলে!
প্রত্যক্ষে বিরাজমান,
সর্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা
কবির যোগীর ধ্যান,
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
মানব মনের তুমি উদার সুষমা।

রোমান্টিক কবিভাবনা হইতে বিহারীলাল যে মিস্টিক কবিভাবনায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, 'সংগীতশতক' (১৮৬২) হইতে 'সাধের আসন' (১৮৮৮)—এই দীর্ঘ কাব্যসাধনাই তাহার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও অনুরূপ উত্তরণ লক্ষ্য করা যায়।

রোমান্টিক কবি জগৎ ও জীবনের মধ্যে এক অজানা রহস্যের সন্ধান পান এবং বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর অস্পষ্ট রহস্যপূর্ণ পরিচয় পান। মিষ্টিক কবি এক প্রত্যক্ষ-নিবিড় অনুভূতির সাহায্যে সে রূপের সন্ধান পান, বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যপ্রকাশের মধ্যেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর স্পর্শ পান। বিহারীলালের মতো রবীন্দ্রনাথও এই পথেই বিশ্বের সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রেমে পড়িয়াছেন।

'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) হইতে 'চিত্রা' (১৮৯৬): এই পর্বে রোমান্টিক প্রেমের তীব্র অশান্ত ক্ষুধা হইতে মিষ্টিক প্রেমের বিপুল শান্তিতে উত্তরণের স্তরটি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'কড়ি ও কোমলে' একান্ত পার্থিব প্রেম—রূপজ দেহজ প্রেম—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'। কিন্তু এই ভোগাকাঙ্ক্ষার সহিত একটা অতৃপ্তিও গোপনে লুকাইয়া আছে—'ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ'। 'মানসী' কাব্যে বাস্তবের সহিত দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত মানবাত্মার আর্ত ক্রন্দন, প্রবল নৈরাশ্য, আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায়—'বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা'। 'নিষ্ফল কামনা' ও 'সুরদাসের প্রার্থনা'—এ দুই কবিতায় পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে।

কবি বলেন,

আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের,
শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই।
('নিষ্ফল কামনা')

আজ তাই কবির প্রার্থনা :

তবে তাই হ'ক, হয়ো না বিমুখ,
দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি!
হৃদয়-আকাশে থাক না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি!
বাসনা-মলিন আঁখি কলঙ্ক
ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল
চিরদিন রবে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা
হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব,
অনন্ত বিভাবরী।
('সুরদাসের প্রার্থনা')

এই দেবী মানসী 'সোনার তরী' কাব্যে আসিয়া 'মানসসুন্দরী'তে পরিণত হইয়াছেন। এক অদৃশ্য মহৎ সত্তা কবিকে চালনা করিতেছে। প্রেমের আকর্ষণ যে মূলতঃ অতিবাস্তবের আকর্ষণ, তাহা কবি উপলব্ধি করিয়াছেন। রোমান্টিক প্রেম হইতে মিষ্টিক প্রেমের স্তরে আজ তাই কবির উত্তরণ। তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

ইহা ত গেল প্লেটোনিক তথা মিষ্টিক প্রেম ও সৌন্দর্য-ভাবনার কথা। বিহারীলালের কবিভাবনা এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিভাবনাকে পথ নির্দেশে সাহায্য করিয়াছে। ইহার বেশি কিছু নহে, পথ রবীন্দ্র-প্রতিভা আপনিই খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। বিহারীলালে যাহার ইশারা, রবীন্দ্রনাথে তাহার পূর্ণ বিকাশ।

ইন্দ্রিয়াশ্রিত ও আদর্শান্বিত প্রেমের ক্ষেত্রেও সমসাময়িক কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের কাব্য হইতেছে কড়ি ও কোমল (১৮৮৬)। উনবিংশ শতাব্দে ইন্দ্রিয়াশ্রিত কবিতা রচনায় খ্যাতিলাভল করিয়াছিলেন—বলদেব পালিত (কাব্যমালা: ১৮৭০), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (শ্রাবণী: ১৮৯৭), মুন্সী কায়কোবাদ (অশ্রুমালা), হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী (বিনোদমালা: ১৮৭৮ ও মালতীমালা: ১৮৯৯) গোবিন্দচন্দ্র দাস (প্রেম ও ফুল: ১৮৮৮, কুঙ্কুম: ১৮৯২, কস্তুরী: ১৮৯৫, চন্দন: ১৮৯৬), দেবেন্দ্রনাথ সেন (অশোকগুচ্ছ: ১৯০০)। ইহাদের সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি।

'কড়ি ও কোমলে'র রচয়িতা স্থূল মানবতার কবি। এ কাব্যের প্রেম—একান্ত পার্থিব প্রেম। ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের জয়গানে এ কাব্য মুখরিত। এখানে কবির মনে হয়—"আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ। ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।" প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যের মধ্যে থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে নারীর প্রেমসাহচর্যের মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় আছে এই কাব্যে। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার---শুধু কামনা-গন্ধী বাহু মিলনে পরিসমাপ্ত প্রেম কোনোদিনই রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে নাই, ইন্দ্রিয়লালসা কখনও প্রেমের স্বর্গীয় সুষমাকে খণ্ডিত করে নাই।

বলদেব পালিতের 'কাব্যমালা'র (১৮৭০) প্রেমকবিতাগুলি ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার প্রথম ফসল। ইহার পূর্বে ছিল ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালাদের ইন্দ্রিয়াসক্ত প্রেমগীতি। বলদেবের কবিতায় কিন্তু কোথাও ইন্দ্রিয়-অসংযম ও লালসা লক্ষ্য করা যায় না। বলদেবের 'নারীর প্রেম' শীর্ষক কবিতাটিতে

(তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের যে চিত্র পাই, কড়ি ও কোমলে তাহার উন্নততর রূপ দেখি।

বলদেবে যাহা নারীপ্রেমের শ্লেষাত্মক বিশ্লেষণ, কড়ি ও কোমলে তাহা কামনার ঊর্ধ্বে নারীসৌন্দর্যের মুগ্ধ আরতি। বলদেবের এই কবিতার সহিত যদি চিত্রা কাব্যের 'বিজয়িনী' কবিতার তুলনা করি, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই প্রমাণিত হয়। 'বিজয়িনী' কবিতায় অনুপম বর্ণনা, পরিবেশচিত্রণে দক্ষতা, সর্বোপরি একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্যচিত্র পাই, তাহা বাংলা কাব্যে তুলনারহিত। বলদেব পালিতের অভিসারিকাকে রবীন্দ্রনাথের বিজয়িনী বহু পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে।

কড়ি ও কোমলের সর্বত্রই লাগিয়াছে কবির যৌবনস্বপ্নের স্পর্শ। এই যৌবনস্বপ্নই কবিকে সৌন্দর্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে—সে সৌন্দর্য নারীদেহে, সে সৌন্দর্য প্রকৃতিতে, সে সৌন্দর্য ভোগে ও মিলনে, প্রেমে ও বিরহে। যৌবনের এই প্রথম স্বপ্ন, প্রথম আকাঙ্ক্ষাই ত ভোগের স্বপ্ন, ভোগের আকাঙ্ক্ষা। 'স্তন' 'চুম্বন' 'বিবসনা' 'বাহু' 'দেহের মিলন' 'তনু' 'পূর্ণ মিলন' 'বন্দী' প্রভৃতি সনেটে এই ভোগবাসনা সৌন্দর্যধারায় সিক্ত হইয়া অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। এই সকল সনেটে ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এ আকর্ষণও রোমান্টিক আকর্ষণ; যৌনাকর্ষণ অপেক্ষা ভাবগত আকর্ষণই প্রবল।

বলদেব পালিত ও রবীন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার কয়েকটি চরণ পাশাপাশি ধরিলেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে।

বলদেব স্তনের বর্ণনায় বলিয়াছেন :

> পল্লবস্বরূপ ধনি এ কর-পল্লবে
> রাখিব ঘটের মুখে কাম-মহোৎসবে।
> সিন্দুরের বিনিময়ে নখক্ষত-ছটা
> অপূর্ব শোভিবে, যেন প্রবালের ঘটা।

সেখানে একই বিষয়ের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

> প্রেমের সংগীত যেন বিকশিয়া রয়,
> উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।
> হেরো গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর—
> হেরো নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেহজ রূপের বর্ণনার অভাব নাই, কিন্তু তাহা সংযত শোভন; তাহা নারীপ্রেমের পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই, পরন্তু তিনি ভাবের সমুন্নতি ঘটাইয়াছেন।

মুন্সী কায়কোবাদ, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার সহিত কড়ি ও কোমলের সনেটগুলির

সাদৃশ্য বর্তমান। গোপালকৃষ্ণ ঘোষের 'হাসি' কবিতাটির (কুসুমমালা, ১৮৭২) সহিত রবীন্দ্রনাথের 'হাসি' সনেট (কড়ি ও কোমল, ১৮৮৬) এবং তাহার অনুসরণে রচিত বলেন্দ্রনাথের 'হাসি' সনেটের (শ্রাবণী, ১৮৯৭) তুলনা করিলে দেখা যায় যে, প্রেমের স্থূল দিকটি নহে, সূক্ষ্মতর দিকটি চিত্রণে রবীন্দ্রনাথের নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

কোথায় ধরার ধারে বিরহ-বিজন
একটি মাধবীলতা আপন ছায়াতে
দুটি অধরের রাঙা কিশলয়-পাতে
হাসিটি রেখেছে ঢেকে কুঁড়ির মতন।

['হাসি', কড়ি ও কোমল]

প্রিয়ার হাসি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব।

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'বিদায়' (মালতীমালা, ১৮৯৯), মুন্সী কায়কোবাদের 'প্রণয়ের প্রথম চুম্বন' ও 'বিদায়ের শেষ চুম্বন' (অশ্রুমালা) এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'দাও দাও একটি চুম্বন' (অশোকগুচ্ছ, ১৯০০): চুম্বন-বিষয়ক এই চারিটি কবিতার আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে করিয়াছি। ইহাদের সহিত 'কড়ি ও কোমলে'র 'চুম্বন' সনেটের তুলনা করিলেই রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে। মনে রাখা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের এই সনেট উপরোক্ত কবিতা-চতুষ্টয়ের পূর্বেই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। চুম্বনের হর্ষ ও আবেগ রবীন্দ্রনাথের এই সনেটে প্রকাশ পাইয়াছে:

অধরের কানে যেন অধরের ভাষা
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর-সংগমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙ্গিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।
ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি দু-জনের দেখা।
প্রেমে লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরের থরে থরে চুম্বনের লেখা।
দু'খানি অধর হতে কুসুম-চয়ন,
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর-শয়ন ॥

উপরোক্ত কবিতা-চতুষ্টয়ের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের এই সনেটের শ্রেষ্ঠত্ব

অনস্বীকার্য—এই শ্রেষ্ঠত্ব ভাবের সমুন্নতিতে, রোমান্টিক কল্পনার সমারোহে, চিত্রণে ও শালীনতায়। প্রেমের স্বর্গীয় সুষমা ইন্দ্রিয়লালসার দ্বারা খণ্ডিত হয় নাই—'কড়ি ও কোমল' সম্পর্কে ইহাই শেষ কথা।

আদর্শায়িত প্রেমকবিতার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রীর অভাব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম তিনটি পরিণত কাব্যগ্রন্থে আদর্শায়িত প্রেমের শোভন প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সে তিনটি হইল: মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬)। সমসাময়িক আদর্শায়িত প্রেমের কাব্য হইতেছে—সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দোলা' (১৮৯৬), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্রাবণী' (১৮৯৭), প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'পদ্মা' (১৮৯৮) ও 'গীতিকা', প্রিয়ম্বদা দেবীর 'রেণু' (১৯০০) ও সরোজকুমারী দেবীর 'হাসি ও অশ্রু' (১৮৯৪)।

বাস্তবজগতে প্রেমের বৃথা সন্ধান, প্রেমের ব্যাখ্যাতীত রহস্য, সংশয়ের তীব্রতা, প্রেমাস্পদের সহিত আত্মিক মিলনের জন্য বৃথা ক্রন্দন মানসীতে আছে। প্রেমাকর্ষণ মূলতঃ অতি বাস্তবের আকর্ষণ, প্রেমের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় রূপ, প্রেমিকহৃদয় যে অন্তহীন রহস্যনিলয়—ইহার পরিচয় 'সোনার তরী'তে আছে। বলেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের কাব্যে প্রেমের অতি-বাস্তব আকর্ষণ ও রহস্যময় রূপ—দুইটিই প্রকাশ পাইয়াছে। 'মানসী'র 'মেঘদূত', 'আকাঙ্ক্ষা', 'বর্ষার দিনে', 'একাল ও সেকাল' ও 'সোনার তরী'র 'হৃদয়যমুনা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে বর্ষা তত্ত্বটি উপস্থিত করিয়াছেন, বলেন্দ্রনাথের 'অন্তর-বাসিনী' ও প্রিয়ম্বদা দেবীর 'বিরহ' কবিতায় ('রেণু' কাব্য) তাহারই নির্ভুল প্রতিধ্বনি শুনি। তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই পথ-প্রদর্শক; বর্ষা ও বিরহ-তত্ত্বের প্রবর্তক রূপে তাঁহার দাবি অবশ্যস্বীকার্য।

সোনার তরী-চিত্রা-পর্বে প্রেমের যে বাস্তবাতীত আকর্ষণ, দুর্জ্ঞেয় রহস্য, প্রেমিকাকে জীবন-নিয়ন্ত্রিণীরূপে স্বীকৃতিদান, ও পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা আছে, তাহা প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'পদ্মা' ও 'গীতিকা' কাব্যে অনুসৃত হইয়াছে।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সরোজকুমারী দেবীর আদর্শায়িত প্রেমকবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রেমকবিতার মিল আরো গভীরে।

সুধীন্দ্রনাথের 'দোলা' কাব্যে (১৮৯৬) 'মানসী' (১৮৯০) ও 'সোনার তরী' কাব্যের (১৮৯৪) প্রেমচিত্রের প্রতিরূপ আছে। 'নিষ্ফল প্রয়াস', 'পরিত্যাগ' প্রভৃতি কবিতার নাম-পরিচয়ে বুঝা যায় সেগুলি 'মানসী' কাব্যের প্রেমচিন্তার অংশভাগী। বাস্তব সংসারের প্রেমের বৃথা সন্ধান ও তাহার জন্য নিষ্ফল ক্রন্দন এই সকল কবিতায় বর্তমান। তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয়-যমুনা' ও সুধীন্দ্রনাথের 'হৃদয়-যমুনা'

কবিতায় বক্তব্য একই—প্রেমের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় রূপের সন্ধানেই উভয়ের যাত্রা। 'চিত্রা' কাব্যের 'সাধনা' কবিতার সহিত তুলনীয় সুধীন্দ্রনাথের 'ভিখারী' কবিতাটি। উভয়েই প্রেমভিখারী কবির প্রেয়সী-সমীপে উপস্থিতি ও ব্যর্থকাম হইলে মৃত্যু-বরণের অভিলাষ ব্যক্ত হইয়াছে। 'চিত্রা' কাব্যের 'সাধনা' ও সুধীন্দ্রনাথের 'অদৃষ্টদেবী' কবিতায় কাব্যসাধনার অঞ্জলি জীবনাধিষ্ঠাত্রীর চরণে সমর্পণের ব্যাকুলতা ধ্বনিত হইয়াছে। তবে কাব্যোৎকর্ষ ও ভাবসঙ্গতির দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' সুধীন্দ্রনাথের 'সাধনা' অপেক্ষা মহত্তর। তৃতীয় অধ্যায়ে এ দুই কবিতার উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

সরোজকুমারী দেবীর হাসি ও অশ্রু' এবং রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' একই বৎসরে (১৮৯৪) প্রকাশিত হয়। সোনার তরীতে প্রেমের যে আদর্শায়িত রূপ ও অতিবাস্তব পরিণতি, প্রেমিকাকে জীবনাধিষ্ঠাত্রীরূপে অর্চনা, প্রেমের রহস্যময়তা ও বাস্তব সংসারে প্রেমলাভের ব্যর্থতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা 'হাসি ও অশ্রু' কাব্যেও আছে। এখানে কাহার প্রভাব কাহার উপর পড়িয়াছে তাহা বলা সুকঠিন। তবে রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে একথা বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি নিশ্চিত পূর্ববর্তী সূচনা আছে 'মানসী' কাব্যে এবং মানসী-পরবর্তী কাব্যনিচয়ে তাহারই ক্রমবিকাশ ও পরিণতি। চিত্রা' কাব্যের 'সাধনা' কবিতার সহিত সরোজকুমারীর 'সাধনা' কবিতার আশ্চর্য মিল বর্তমান। তৃতীয় অধ্যায়ে আদর্শায়িত প্রেমের আলোচনায় দুইটি কবিতাই উদ্ধার করিয়াছি, তাহা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। সরোজকুমারীর কবিতাটিতে বাণীর প্রতি ভক্তি-নিবেদন। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট আত্মনিবেদন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কাব্যভাবনা মহত্তর উচ্চতর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তাই এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই শ্রেষ্ঠতর।

এইবার বিষাদ-কবিতার কথা আলোচনা করিতেছি। বিষাদ-কবিতা শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে বিষাদ ও শোকের বহুল ব্যবহার হইয়াছিল। বিষাদমূলক কবিতা রচনা তখনকার দিনে প্রচলিত সাহিত্য প্রথা বা ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এগুলির অধিকাংশই বিশুদ্ধ গীতিকবিতার স্তরে উত্তীর্ণ হয় নাই। সাংসারিক জীবনের ক্ষতিজনিত বিষাদ, শোকজাত বিষাদ ও আশাভঙ্গের বেদনাই এ সকল কবিতার মূল প্রেরণা ছিল। জীবনের অনিত্যতা ও চঞ্চলতায় খেদ বহু কবিকে—মধুসূদনকেও—আত্মবিলাপ রচনায় প্রেরণা দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই ফ্যাশনের অনুবর্তী হন নাই।

বিশুদ্ধ রোমান্টিক বিষাদ আমরা প্রথম লক্ষ্য করি বিহারীলালে, তারপর রবীন্দ্রনাথে।

প্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গতার মধ্য দিয়াই একটা রোমান্টিক বিষাদের সুর রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কাব্যে ধ্বনিত হইয়াছে। ইহাতে বিহারীলালের ক্ষণস্থায়ী প্রাথমিক প্রভাব আছে। অতি শৈশবে প্রকৃতির মধ্যে কবি যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন তাহার স্মৃতি আজিকার যৌবনের উপভোগের অতৃপ্তিতে এক অনির্দেশ্য বেদনা জাগাইয়া তুলিয়াছে। এ সম্পর্কে সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

কাব্যজীবনের প্রথম পর্বে কবি 'হৃদয়-অরণ্যে'র মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছিলেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কবিকে হৃদয়-অরণ্য হইতে মুক্তির নিশানা দিল, যথার্থ মুক্তি ঘটিল প্রভাতসঙ্গীতে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় কবি যে মুক্তি পাইলেন, তাহা এই বিষাদ হইতে মুক্তি, এ কবিতায় প্রসন্ন আনন্দসঙ্গীতে পূর্ণ প্রভাতের সহিত কবির সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিল।

এই মুক্তি কবির নিজের মধ্য হইতেই ঘটিয়াছে, বাহিরের কোনো শক্তি কবির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আর সমকালীন বাঙালি কবিকুল রোমান্টিক বিষাদ অপেক্ষা শোক ও আত্মবিলাপের হাহাকারেই নিজেদের নিঃশেষিত করিয়া দিয়াছিলেন।

এইবার সমসাময়িক পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-কবিতা আলোচনা করিতেছি।

বিহারীলালের 'প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি-রমণী সনে' (সংগীতশতক : ১৮৬২) এবং

> 'সুধাময় প্রণয় তোমার
> জুড়াবার স্থান হে আমার ;
> তব স্নিগ্ধ কলেবরে,
> আলিঙ্গন দিলে পরে,
> উলে যায় হৃদয়ের ভার'
>
> (বঙ্গসুন্দরী, ১৮৭০)

আর হেমচন্দ্রের

> হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
> বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি।
>
> ('যমুনাতটে'—কবিতাবলী, ১৮৭০)

প্রকৃতি-কবিতার উপযুক্ত পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন আসিলেন তখনও হৃদয়-অরণ্য হইতে তিনি নিষ্ক্রান্ত হন নাই। এই সময়ে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রকৃতিতে নীতি ও গুরুতর চিন্তা আরোপ

করিতেন। রবীন্দ্রনাথ এই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। 'প্রভাত সংগীতে' তিনি পরিবর্তন আনিলেন প্রকৃতি কবিতার ক্ষেত্রে—হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উৎসারিত আনন্দ ধারায় তিনি স্নাত হইয়া প্রকৃতিকে দেখিলেন—সমগ্র প্রকৃতি সেই বৃহৎ আনন্দের অঙ্গীভূত হইয়া গেল। প্রকৃতিতে চিন্তা আরোপিত না করিয়া, তাহাকে জীবনের সহিত একসূত্রে গাঁথিয়া লইয়া রবীন্দ্রনাথ নূতন ধারা প্রবর্তন করিলেন। মহিলা কবিদের লেখায় খানিকটা অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। সরোজকুমারী দেবীর 'মধ্যাহ্ন', বিনয়কুমারী ধরের 'রাত্রির প্রতি রজনীগন্ধা', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'শারদ জ্যোৎস্নায়' অনুভূতিশীল নিসর্গের দেখা পাওয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় বড়ালে আরো উন্নতি হইল।

মানসী কাব্যে স্থূল ভোগের জগৎ ছাড়াইয়া অনির্দেশ্য অনায়ত্তের সন্ধান ও পারিপার্শ্বিকের সহিত কবি-আত্মার অসামঞ্জস্যের ফলে একটা প্রবল নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। এই নিরাশার ছায়া 'মানসী' কাব্যের প্রকৃতি কবিতার উপর পড়িয়াছে।

প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে ঃ

হৃদয় কোথায় তোর খুঁজিয়া বেড়াই
নিষ্ঠুরা প্রকৃতি।
এত ফুল, এত আলো, এত গন্ধ গান,
কোথায় পিরিতি! ('প্রকৃতির প্রতি')

প্রকৃতির রুদ্ররূপ কবি দেখিয়াছেন ঃ

দোলেরে প্রলয় দোলে অকূল সমুদ্র কোলে
উৎসব ভীষণ,
শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া
দুর্দম পবন।
আকাশ সমুদ্র সাথে প্রচণ্ড মিলনে মাতে,
অখিলের আঁখিপাতে আবরি তিমির।
বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি, হা হা করে ফেনরাশি
তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড়-প্রকৃতির।
('সিন্ধুতরঙ্গ')

'মানসী' কাব্যে আর একটি দিক লক্ষ্য করা যায়—তাহা নারীসৌন্দর্যকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশাইয়া দেখার প্রবণতা। 'বিদায়', 'মানসিক অভিসার' কবিতা ইহার প্রমাণ।

যেমন,

তারি ভালোবাসা তারি বাহু সুকোমল
উৎকণ্ঠ চকোর সম বিরহ-তিয়াষ,

বহিয়া আনিছে এই পুষ্প-পরিমল,
কাঁদায়ে তুলিছে এই বসন্ত বাতাস।
('মানসিক অভিসার')

এখন আর প্রকৃতির রুদ্র রূপ নয়, শান্ত ও গভীর রূপটি কবির চোখে ধরা পড়িয়াছে :

নিশীথ-আকাশ মাঝে নয়ন তুলিয়া
দেখিতেছি কোটি গ্রহতারা,
সুগভীর তামসীর ছিদ্র পথে যেন
জ্যোতির্ময় তোমার আভাস,
ওহে মহাঅন্ধকার ওহে মহাজ্যোতি
অপ্রকাশ, চির স্বপ্রকাশ। ('জীবন মধ্যাহ্ন')

'মানসী' কাব্যের 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কেন, বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি-কবিতার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিয়াছে। প্রকৃতির সহিত সুনিবিড় অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কবি স্থাপন করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ এই কবিতায়—কবি প্রকৃতির মাতৃরূপ দর্শন করিয়াছেন।

'মানসী'র বর্ষার কবিতাগুলি প্রকৃতিতে বিরহবেদনা ও রোমান্টিক ব্যাকুলতা জাগাইয়া তুলিয়াছে। এ সকল কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অনন্য ও বিশিষ্ট। বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনায় ও উহার সহিত মানব হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপনে রবীন্দ্রনাথ বোধহয় ওঅর্ডসওঅর্থ ছাড়া অন্য সমস্ত কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় প্রকৃতির প্রতি যে সুগভীর মাতৃপ্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে, 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা'য় তাহার আশ্চর্য পরিণতি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও এই শতাব্দীর সমাপ্তির পূর্বেই তাঁহার নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। এখন সমসাময়িক কাব্যধারার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্ণয় করা যাক্।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার প্রথম পর্বে বিহারীলালের প্রভাব সর্বাপেক্ষা প্রবল, ইহা দেখিয়াছি। 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যেই কবি নিজস্ব পথটি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু তৎকালীন সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন নাই। অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ সেই সময় (গত শতাব্দীর নবম দশকে) বিহারীলাল প্রবর্তিত কাব্যতটিনীকে খরস্রোতা করিয়াছিলেন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের সহযাত্রী ছিলেন। প্রাক্ সোনারতরী-পর্বে একদিকে প্রকৃতি-পিপাসা, অপরদিকে সূক্ষ্ম ভাবনিষ্ঠা রবীন্দ্র-কাব্যে পূর্ববর্তী ধারাকে নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের রূপতন্ময়তা ও অক্ষয়কুমারের ভাবতান্ত্রিকতা এই পর্বের রবীন্দ্র-কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। প্রখর আত্মসচেতন আত্মকেন্দ্রিক অক্ষয়কুমারের বেদনা, 'তৃপ্তির নরকে জলি অতৃপ্তির খেদে'—এই দীর্ঘশ্বাসে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহারই

প্রতিধ্বনি শুনি রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলে'র আর্তনাদে—'ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ' ও 'মানসী'র নৈরাশ্যমিশ্রিত বিলাপে—'বৃথা এ অনলভরা দুরন্ত বাসনা'। আবার প্রকৃতিরূপমুগ্ধ যৌবনতপ্ত রূপতান্ত্রিক দেবেন্দ্রনাথের অসহ্য হর্ষাবেগ—

দাও, দাও, একটি চুম্বন—
মিলনের উপকূলে সাগর-সঙ্গমে,
দুর্জয় বানের মুখে, দিব ভাসাইয়া সুখে,
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন,
দাও, দাও, একটি চুম্বন। (অশোকগুচ্ছ)

ইহার দুরন্ত কলরোল শুনি 'কড়ি ও কোমলে'—

দুটি বাহু বহি আনে হৃদয়ের ডালা
রেখে দিয়ে যায় যেন চরণের তলে।
লতায়ে থাকুক বুকে চির-আলিঙ্গন,
ছিঁড়ো না ছিঁড়ো না দুটি বাহুর বন্ধন ॥ ('বাহু')

তখন কবির মনে হইয়াছে,

আমার-যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ,
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর মতো।

তাই বলিতেছি, রূপতান্ত্রিকতা ও ভাবতন্ময়তা, তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, যৌবনের হর্ষ ও বেদনা রবীন্দ্রনাথকে এই পর্বে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে এবং তাঁহাকে সমসাময়িক কাব্যধারার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ এই পর্বের সহযাত্রীদের পন্থানুসরণেই ক্ষান্ত হন নাই, নিজস্ব পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। সেখানেই রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত আছে। প্রকৃতি বর্ণনায়, ইন্দ্রিয়াশ্রিত, আদর্শায়িত ও প্লেটোনিক প্রেমের উপস্থাপনে এবং বিষাদ-কবিতায় সমসাময়িক কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য আমরা এই অধ্যায়ে বিস্তৃত উদাহরণের মাধ্যমে বিচার করিয়াছি। এই তুলনামূলক আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যসাধনার প্রথম পর্বে সঙ্গীহীন একক কবি ছিলেন না, তাঁহার বহু সহযাত্রী ছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? রবীন্দ্র-কাব্যে সকল ধারার সমন্বয় ঘটিয়াছিল এবং এই সমন্বয় হইতে এক উন্নততর কবিকর্মের উদ্ভব হইয়াছিল। তাই এই কথা বলিয়া আলোচ্যমান প্রসঙ্গের ছেদ টানি, গত শতাব্দীর গীতিকাব্যসংসারে রবীন্দ্রনাথ একক নহেন, কিন্তু তিনি শ্রেষ্ঠ, শতাব্দীর সাধনার ফল তাঁহাতেই প্রকাশ পাইয়াছিল ॥

পরিশিষ্ট

(ক) গ্রন্থঋণ

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় :	কবিগুরু
শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায় :	রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী :	রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :	সাহিত্যসাধক চরিতমালা
শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী :	কাব্যে রবীন্দ্রনাথ
মোহিতলাল মজুমদার :	আধুনিক বাংলা সাহিত্য
রবীন্দ্রনাথ :	আধুনিক সাহিত্য লোকসাহিত্য মানুষের ধর্ম বাংলা কাব্য পরিচয় Nationalism
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত :	বাংলা সাহিত্যে নবযুগ
ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় :	বাংলা সাহিত্যের কথা সমালোচনা-সাহিত্য
ডঃ সুশীলকুমার দে :	History of Bengali Literature in the Nineteenth Century নানা নিবন্ধ
হরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত :	Western Influence on Nineteenth Century Bengali Poetry

(খ) কাব্যতালিকা (১৮৫৮-১৯১০)

১৮৫৮ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় : পদ্মিনী উপাখ্যান

১৮৫৯ রামদাস সেন : তত্ত্বসংগীত লহরী

১৮৬০ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : মেঘদূত
মধুসূদন দত্ত : তিলোত্তমাসম্ভব

১৮৬১ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার : সদ্ভাবশতক
রামদাস সেন : কুসুমমালা
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : চিন্তাতরঙ্গিণী
মধুসূদন : মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা

১৮৬২ রঙ্গলাল : কর্মদেবী
বিহারীলাল : সংগীতশতক
মধুসূদন : বীরাঙ্গনা

১৮৬৩ গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : চিত্তসন্তোষিণী

১৮৬৪ রামদাস সেন : বিলাপতরঙ্গ
গণেশচন্দ্র : ঋতুদর্পণ, কৃষ্ণবিলাস
হেমচন্দ্র : বীরবাহু

১৮৬৫ বনোয়ারীলাল রায় : জয়াবতী

১৮৬৬ জগদ্বন্ধু ভদ্র : ভারতের হীনাবস্থা

১৮৬৭ রামদাস সেন : কবিতালহরী, চতুর্দশপদী কবিতামালা

১৮৬৮ বলদেব পালিত : কাব্যমঞ্জরী
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : যৌবনোদ্যান
শিবনাথ শাস্ত্রী : নির্বাসিতের বিলাপ
রঙ্গলাল : শূরসুন্দরী

১৮৬৯ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : মিত্রবিলাপ ও অন্যান্য কবিতাবলী
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় : পদ্যমালা
কৈলাসবাসিনী দেবী : বিশ্বশোভা

১৮৭০ বলদেব পালিত : কাব্যমালা, ললিত কবিতাবলী
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : কাব্যকলাপ

গোবিন্দচন্দ্র দাস : প্রসূন
বিহারীলাল : বন্ধুবিয়োগ, প্রেমপ্রবাহিনী, বঙ্গসুন্দরী (১ম খণ্ড), নিসর্গসন্দর্শন
হেমচন্দ্র : কবিতাবলী (১ম খণ্ড)

১৮৭১ রাজকৃষ্ণ রায় : আগমনী
সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : রাধিকাবিলাপ
শ্রীকণ্ঠ সরকার : ব্রজেশ্বরী কাব্য
নরনারায়ণ রায় : গোপাঙ্গনা কাব্য
নবীনচন্দ্র সেন : অবকাশরঞ্জিনী (১ম খণ্ড)

১৮৭২ রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় : রাধাবিলাপ
অন্নদাসুন্দরী দেবী : অবলাবিলাপ
গোপালকৃষ্ণ ঘোষ : কুসুমমালা

১৮৭৩ দীনেশচরণ বসু : মানসবিকাশ
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী : কবিতাহার

১৮৭৪ রাজকৃষ্ণ রায় : বঙ্গভূষণ
আনন্দচন্দ্র মিত্র : মিত্রকাব্য (১ম খণ্ড)
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী : উদাসিনী
ইন্দুমতী দাসী : দুঃখমালা
বিজয়কৃষ্ণ বসু : বিলাপ সিন্ধু
অধরলাল সেন : মেনকা, ললিতাসুন্দরী ও কবিতাবলী

১৮৭৫ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : ভুবনমোহিনী প্রতিভা (১ম খণ্ড)
হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী : দুঃখসঙ্গিনী
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্বপ্নপ্রয়াণ
শিবনাথ শাস্ত্রী : পুষ্পমালা
হেমচন্দ্র : বৃত্রসংহার (১—১১ সর্গ)

১৮৭৬ রাজকৃষ্ণ রায় : অবসর-সরোজিনী
আনন্দচন্দ্র মিত্র : হেলেনা কাব্য (১ম খণ্ড)
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় : জাতীয় সংগীত
রজনীনাথ চট্টোপাধায় : বঙ্গাঙ্গনা
বিরাজমোহিনী দাসী : কবিতাহার

বিজয়কৃষ্ণ বসু : অবকাশ গাথা
হেমচন্দ্র : আশাকানন
নবীনচন্দ্র সেন : পলাশীর যুদ্ধ

১৮৭৭ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : কবিতামালা
রাজকৃষ্ণ রায় : ভারতভাগ্য, নিশীথচিন্তা
আনন্দচন্দ্র মিত্র : মিত্রকাব্য (২য় খণ্ড)
হেমচন্দ্র : বৃত্রসংহার (১২—২৪ সর্গ)
নবীনচন্দ্র সেন : অবকাশরঞ্জিনী (২য় খণ্ড), ক্লিওপেট্রা

১৮৭৮ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : চিত্তমুকুর
রাজকৃষ্ণ রায় : ভারত-গান
হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী : বিনোদমালা
আনন্দচন্দ্র মিত্র : হেলেনা-কাব্য (২য় খণ্ড)
রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় : প্রবাসীবিলাপ
ভুবনমোহিনী দেবী : স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান
রবীন্দ্রনাথ : কবিকাহিনী
বঙ্কিমচন্দ্র : কবিতা-পুস্তক

১৮৭৯ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : আর্যসংগীত (পূর্বভাগ)
রাজকৃষ্ণ রায় : দেবসংগীত
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যবিশারদ : দেশাচার, লুক্রেশিয়া
রঙ্গলাল : কাঞ্চীকাবেরী
বিহারীলাল : সারদামঙ্গল
নবীনকালী দেবী : শ্মশানভ্রমণ

১৮৮০ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার : মহিলা-কাব্য (১ম খণ্ড)
ঈশানচন্দ্র : বাসন্তী
দেবেন্দ্রনাথ সেন : ফুলবালা
কালীপ্রসন্ন : বঙ্গীয় সমালোচক
হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ : জীবনসংগীত
হেমচন্দ্র : কবিতাবলী (২য় খণ্ড), ছায়াময়ী
বিহারীলাল : বঙ্গসুন্দরী (২য় খণ্ড)
নবীনচন্দ্র সেন : রঙ্গমতী
রবীন্দ্রনাথ : বনফুল

১৮৮১ দেবেন্দ্রনাথ : উর্মিলা, নির্ঝরিণী
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী : সাগরসঙ্গমে
কামিনীসুন্দরী দাসী : কল্পনাকুসুম
ঈশানচন্দ্র : যোগেশ
রবীন্দ্রনাথ : ভগ্নহৃদয়, বাল্মীকি-প্রতিভা

১৮৮২ গোবিন্দচন্দ্র রায় : গীতিকবিতা (দুই খণ্ড)
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : মেঘদূত
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী : ভারতকুসুম
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ : চিন্তাকুসুম
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : আর্যগাথা (১ম খণ্ড)
হেমচন্দ্র : দশমহাবিদ্যা
রবীন্দ্রনাথ : সন্ধ্যাসংগীত
মোক্ষদায়িণী মুখোপাধ্যায় : বনপ্রসূন

১৮৮৩ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার : মহিলা কাব্য (২য় খণ্ড)
গুরুনাথ সেনগুপ্ত : বীরোত্তর
প্রসন্নময়ী দেবী : নীহারিকা
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : সিন্ধুদূত
নবীনচন্দ্র দাস-কবি গুণাকর : আকাশকুসুম
গোবিন্দচন্দ্র রায় : গীতিকবিতা (৩য়, ৪র্থ খণ্ড)
রবীন্দ্রনাথ : প্রভাতসংগীত

১৮৮৪ রাজকৃষ্ণ রায় : নিভৃতনিবাস, শারদোৎসব, গিরিসন্দর্শন
অক্ষয়কুমার বড়াল : প্রদীপ
রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় : ভারতে উষা
যাদবানন্দ রায় : বীরসুন্দরী
রবীন্দ্রনাথ : ছবি ও গান, শৈশবসংগীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী
সরোজকুমারী দেবী : হাসি ও অশ্রু

১৮৮৫ অক্ষয়কুমার : কনকাঞ্জলি
অম্বিকাচরণ গুপ্ত : পত্রাষ্টক
রবীন্দ্রনাথ : রবিচ্ছায়া (গান)

১৮৮৬ নিত্যকৃষ্ণ বসু : মায়াবিনী
নবীনচন্দ্র সেন : রৈবতক
রবীন্দ্রনাথ : কড়ি ও কোমল

১৮৮৭ দীনেশচরণ বসু : মহাপ্রস্থান
ঈশানচন্দ্র : চিন্তা
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী : অশ্রুকণা
অক্ষয়কুমার : ভুল
শিবনাথ শাস্ত্রী : হিমাদ্রিকুসুম
মনোমোহন বসু : গীতাবলী

১৮৮৮ রাজকৃষ্ণ রায় : গান
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ : মিঠেকড়া
গোবিন্দচন্দ্র দাস : প্রেম ও ফুল
শিবনাথ শাস্ত্রী : পুষ্পাঞ্জলি
বিহারীলাল : সাধের আসন

১৮৮৯ কামিনী রায় : আলো ও ছায়া
শিবনাথ শাস্ত্রী : ছায়াময়ী-পরিণয়
বিজয়চন্দ্র মজুমদার : কবিতা

১৮৯০ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী : আভাষ
নবীনচন্দ্র সেন : খৃষ্ট
স্বর্ণকুমারী দেবী : গাথা
রবীন্দ্রনাথ : মানসী

১৮৯১ কামিনী রায় : নির্মাল্য
বিনয়কুমারী ধর : নির্ঝর

১৮৯২ গোবিন্দচন্দ্র দাস : কুঙ্কুম
নিত্যকৃষ্ণ বসু : প্রেমের পরীক্ষা,
বিজয়চন্দ্র : যুগপূজা
রবীন্দ্রনাথ : চিত্রাঙ্গদা

১৮৯৩ ঈশানচন্দ্র : কবিতাবলী
মানকুমারী বসু : কাব্যকুসুমাঞ্জলি
গোবিন্দচন্দ্র দাস : মগের মুলুক
নবীনচন্দ্র সেন : কুরুক্ষেত্র
হেমচন্দ্র : বিবিধ কবিতা
বরদাচরণ মিত্র : মেঘদূত

১৮৯৪ আনন্দচন্দ্র মিত্র : ভারতমঙ্গল
স্থরেন্দ্রনাথ : স্থরমা
রবীন্দ্রনাথ : সোনার তরী

১৮৯৫ গোবিন্দচন্দ্র দাস : কস্তুরী
শশাঙ্কমোহন সেন : সিন্ধুসংগীত
নবীনচন্দ্র সেন : অমিতাভ
স্বর্ণকুমারী দেবী : কবিতা ও গান
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী : ভারতগাথা
বরদাচরণ মিত্র : অবসর

১৮৯৬ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী : শিখা
মানকুমারী বস্থ : কনকাঞ্জলি
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : মাধবিকা
স্থধীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দোলা
গোবিন্দচন্দ্র দাস : চন্দন, ফুলরেণু
নবীনচন্দ্র সেন : প্রভাস
রবীন্দ্রনাথ : চিত্রা, নদী, মালিনী, চৈতালি
নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী : মর্মগাথা

১৮৯৭ বলেন্দ্রনাথ : শ্রাবণী
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ : রুচিবিকার
কামিনী রায় : পৌরাণিকী
অম্বুজাস্থন্দরী দাসগুপ্তা : প্রীতি ও পূজা

১৮৯৮ হেমচন্দ্র : চিত্তবিকাশ
নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী : প্রেমগাথা
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী : পদ্মা

১৮৯৯ হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী : মালতীমালা
দ্বিজেন্দ্রলাল : আষাঢ়ে
রবীন্দ্রনাথ : কণিকা

১৯০০ নবীনচন্দ্র দাস-কবি গুণাকর : শোক-গীতি
দেবেন্দ্রনাথ সেন : অশোকগুচ্ছ
দ্বিজেন্দ্রলাল : হাসির গান
রবীন্দ্রনাথ : কথা, কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা

প্রিয়ম্বদা দেবী : রেণু
সরলাদেবী চৌধুরাণী : শতগান

১৯০১ রবীন্দ্রনাথ : নৈবেদ্য
নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী : অমিয়গাথা

১৯০২ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : আর্যসংগীত
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী : অর্ঘ্য
দ্বিজেন্দ্রলাল : মন্দ্র
সুরমাসুন্দরী ঘোষ : রঞ্জিনী

১৯০৩ রবীন্দ্রনাথ : কাব্যগ্রন্থ

১৯০৪ বিজয়চন্দ্র মজুমদার : যজ্ঞভস্ম, ফুলশর
নিস্তারিণী দেবী : মনোজবা
কুসুমকুমারী রায় : মর্মোচ্ছ্বাস
প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঊষা
সরলাবালা সরকার : প্রবাহ

১৯০৫ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ : স্বদেশ-সংগীত
গোবিন্দচন্দ্র দাস : বৈজয়ন্তী
রবীন্দ্রনাথ : বাউল, স্বদেশ

১৯০৬ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী : স্বদেশিনী
রবীন্দ্রনাথ : খেয়া
রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী : শোকগাথা

১৯০৭ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী : সিন্ধুগাথা
দ্বিজেন্দ্রলাল : আলেখ্য
শশাঙ্কমোহন সেন : শৈলসংগীত

১৯০৮ রবীন্দ্রনাথ : কথা ও কাহিনী (একত্রে পুনর্মুদ্রণ)

১৯০৯ গোবিন্দচন্দ্র দাস : শোক ও সান্ত্বনা
নবীনচন্দ্র সেন : অমৃতাভ
রবীন্দ্রনাথ : গান

১৯১০ অক্ষয়কুমার : শঙ্খ
গোবিন্দচন্দ্র দাস : শোকোচ্ছ্বাস
বিজয়চন্দ্র মজুমদার : পঞ্চকমালা
রবীন্দ্রনাথ : গীতাঞ্জলি
রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী : প্রীতি

নির্দেশিকা

ক্ষ

খ

গ

চ

ছ

জ

ঞ

ট

ড

ত

বর্তমান গ্রন্থে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্যের সামগ্রিক আলোচনা করা হইয়াছে। ১৮৬০ হইতে ১৯১০ : এই অর্ধ-শতাব্দীর পর্বে বাংলাদেশের নবজাগরণের সার্থক প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে গীতিকবিতার মুকুরে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের ডি-ফিল্ থীসিস্ অবলম্বনে রচিত এই গ্রন্থের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি ও বাংলা কাব্যরসিকদের উপকার হইবে। লেখকের নিষ্ঠা ও শ্রমস্বীকার, দৃষ্টিভঙ্গি ও তথ্যপরায়ণতা, এবং বিশ্লেষণ ও রচনাপদ্ধতির গুণে এই গ্রন্থ কাব্যরসিকের নিকট অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

মূল্য ॥ আট টাকা